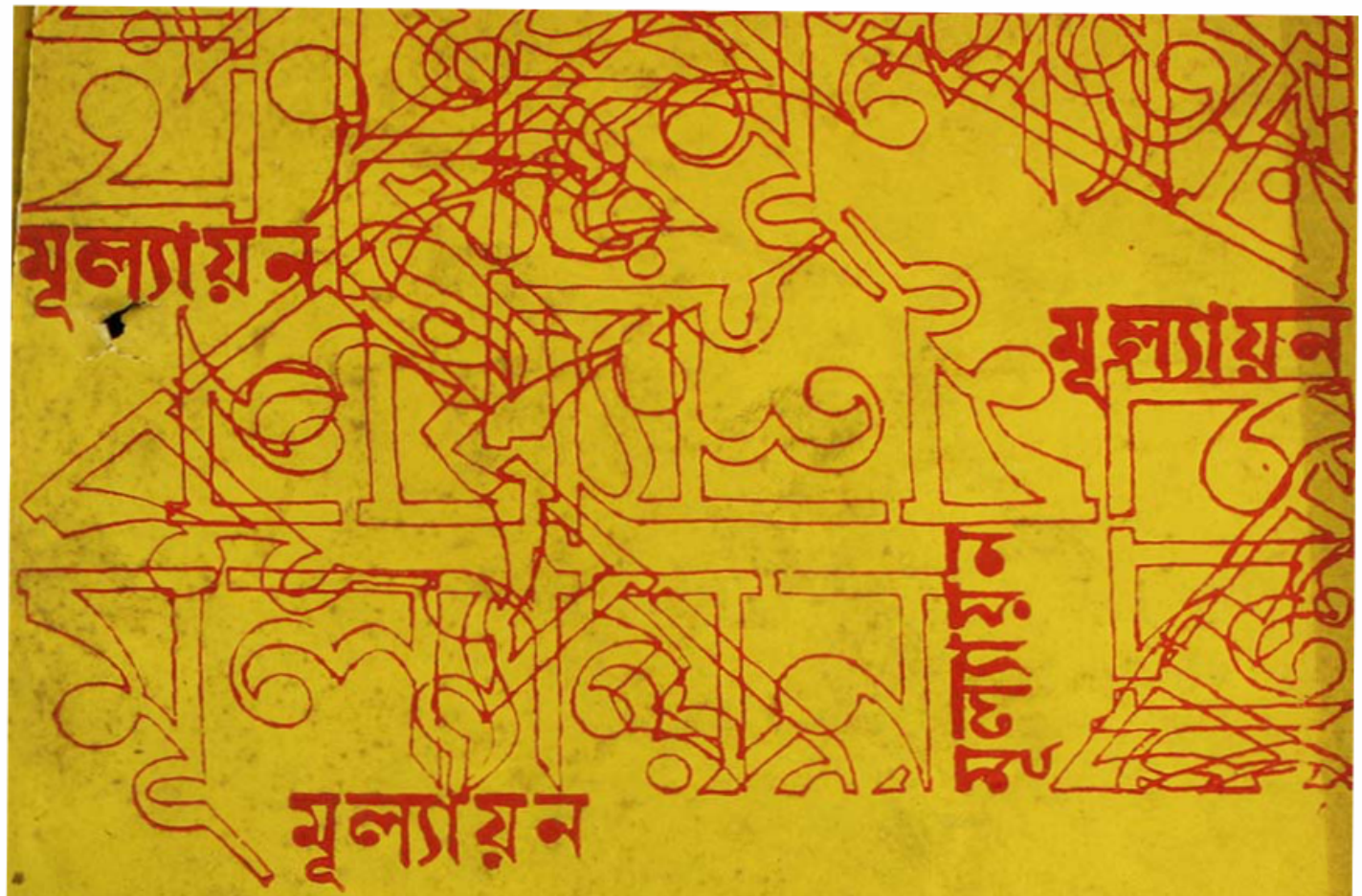

* ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দ্বিতীয় যুগ * পেরেসত্রোইকা কি ও কেন * অক্টোবর বিপ্লবের মূল্যায়নের আলোকে পেরেসত্রোইকা * সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্যা : চীনের রাজনীতি ও ত্রয়োদশ কংগ্রেস * মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দায় * ভারতে রাজনৈতিক সংকট (বিতর্কমূলক আলোচনা)

নভেম্বর
১৯৯৫

দাম : পাঁচ টাকা

গতবছর তোমার সৈকতে আমি ও আমার বন্ধু অনেক খেলেছি। এখনও আমাদের মনে পড়ে কিভাবে ছোট ছোট ঢেউগুলো আমাদের সঙ্গে খেলতো— কখনো পিছু পিছু আসতো, আবার পরক্ষণেই দূরে পালিয়ে যেত। শক্ত বালির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দুষ্টু ঢেউগুলো কখনো কখনো ঝাউবনের ফাঁকে হারিয়ে যেত। ঝিনুক কুড়োতে কি মজা, তাই না? এছাড়াও আমরা দেখেছি আরো কত মজার জিনিস—জেলেরা তাদের ডিঙিতে চড়ে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায়। ফিরে আসে। দড়ি টেনে তাদের জাল গুটিয়ে আনে। তখন নানান জাতের মাছে জাল বোঝাই।

আমরা তোমাকে ভুলিনি, তোমাকে আমরা ভালবাসি, দীঘা। তাই তো, ইচ্ছে করে বারবার তোমার কাছে ফিরে যাই।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।
ট্যুরিস্ট ব্যুরো ৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট) কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ২৮-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে
বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন প্রয়োজন

পরিবারের প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্যই রেজিষ্ট্রী করান দরকার। কারণ, অধুনা ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিবাহের প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

আপনাকে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন কিভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখুন :—

(১) বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে রেজিষ্ট্রী বিবাহে খরচ অতি সামান্য।

(২) ইহা জঘন্য পণ-প্রথা নিবারণে সাহায্য করে।

(৩) সম্পত্তি সংক্রান্ত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য, দাবী নিষ্পত্তিকরণে বিবাহ সার্টিফিকেট এক অতি মূল্যবান দলিল।

(৪) খোরপোষের দাবী, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি পূরণের টাকা, ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য টাকা তোলার ব্যাপারে বিবাহ সার্টিফিকেট আপনার বিশেষ প্রয়োজন।

(৫) পাশপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৬) বহু বিবাহ এবং শিশু-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কু-প্রথা দূরীকরণে রেজিষ্ট্রী বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৭) রেজিষ্ট্রী বিবাহ দাম্পত্য জীবনে অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে অথবা কলিকাতায় মহাকরণের ৫ নং ব্লকের নীচতলায়, রেজিষ্ট্রার জেনারেল অফ্ বার্থস ডেথস্ এ্যাণ্ড ম্যারেজেসের অফিসে যোগাযোগ করুন।

আই সি এ ১৩৯০।৮৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মূল্যায়ন পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

(৪ নং ফরম)

১। প্রকাশ স্থান—১০, বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

২। প্রকাশ সময়—ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রক—রণধীর দাশগুপ্ত
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—১০, বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৪। প্রকাশক—রণধীর দাশগুপ্ত
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—১০, বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৫। সম্পাদক—নরহরি কবিরাজ
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—১০, বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—সমীক্ষা প্রকাশনী
ঠিকানা—১০, বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

আমি, রণধীর দাশগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তাং ১০।৪।৮৮

রণধীর দাশগুপ্ত
প্রকাশক

নিয়মাবলী

গ্রাহক সংক্রান্ত

নববর্ষ সংখ্যা পাঁচ টাকা

শারদীয় সংখ্যা বারো টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা

বছরের যে-কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়

ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সী সংক্রান্ত

কমপক্ষে ৫ কপি নিতে হবে।

কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।

পত্রিকা ভি পি-তে পাঠানো হয়।

ডাক খরচ আমাদের।

যোগাযোগ করুন :

কর্মাধ্যক্ষ

মূল্যায়ন কার্যালয়

১০, বঙেল রোড,

কলিকাতা-১৯

মূল্যায়ন

বর্ষ ২৪

১৩৯৫

সূচী

	পৃষ্ঠা
ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দ্বিতীয় যুগ/রণেন সেন	১
মানুষের জয়যাত্রা : স্বপ্ন থেকে বাস্তবে/সুকুমার মিত্র	২৬
সুন্দর পৃথিবীতে নিউক্লিয়ারের করাল ছায়া এবং আমাদের কর্তব্য/ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস	৩৬
'পেরেসত্রোইকা' কি ও কেন ?	৪৩
অক্টোবর বিপ্লবের মূল্যায়নের আলোকে 'পেরেসত্রোইকা'/রণধীর দাশগুপ্ত	৪৯
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দায়/দাশু রায়	৬০
প্রাচীন ভারতে 'নিয়োগ' প্রথা/জীবন মুখোপাধ্যায়	৬৮
সমাজতান্ত্রিক জার্মানীতে ভারত চর্চা/শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও দীপিকা মজুমদার	৭৮
নারী সমাজের পরাধীনতার বীভৎস রূপের নাম সতী/রমজু ঘোষ	৮২
সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্যা :	
চীনের রাজনীতি ও ত্রয়োদশ কংগ্রেস/সত্যব্রত দত্ত	৮৫
ভারতে রাজনৈতিক সংকট—আলোচনা	৯৫
উপজাতি সমস্যা : আন্তর্জাতিক সম্মেলন/দীপিকা বসু	১০৫
গ্রন্থ পরিচয় :	১০৯
যে বন্ধুদের স্মরণ করি	১১১

উপদেষ্টামণ্ডলী :

রণেন সেন, সুশীল জানা, নির্মাল্য বাগচী,

রণধীর দাশগুপ্ত, সত্যব্রত দত্ত

সম্পাদক :

নরহরি কবিরাজ

সহ-সম্পাদনা

দীপিকা বসু

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ বাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত ও ১০ বঙেল রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

* এ রাজ্যে বর্তমানে ৬৮ লক্ষ পরিবার সমবায়ের আওতায় এসেছেন।
* সর্বজনীন সদস্যপদ কর্মসূচী বলে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীগুলির ৭ লক্ষ ৬২ হাজার পরিবারকে এ পর্যন্ত সমবায়ের সদস্য করা হয়েছে।
* ১৯৮৬-৮৭ সালে কৃষিজীবীদের ৫২ কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, আগের বছর দেওয়া হয়েছিল ৪৩ কোটি টাকা। সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করেছে ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।
* সমবায় বিপণন সমিতিগুলি মূল্য—পরিপোষণ কর্মসূচীতে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার গাঁট পাট কিনেছে এবং ২ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিক টন সার বিলি করেছে।
* ১৯৮৬-৮৭ সালে ক্রেতা সমবায়গুলি ২০০ কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্যপণ্য বিক্রি করেছে।
* মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাড়ির সমস্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সমবায় আবাসন সমিতিগুলি ১৯,২৮৩টি ফ্ল্যাট ও বাড়ি তৈরি করেছে।
* আলু রাখার জন্য আছে ৩৫টি সমবায় হিমঘর, সেগুলির মোট ক্ষমতা ১ লক্ষ ২৬ হাজার, মেট্রিক টন। আরও ৮টি ইউনিট শীঘ্রই খোলা হবে। বর্তমানে ১৫২৩টি সমবায় গুদাম আছে, সেগুলির মোট ক্ষমতা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (৩) কর্মসূচী অনুযায়ী মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৭০০ টির মত গুদাম তৈরি করা হচ্ছে।

আই সি এ ১৩৯০।৮৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মূল্যায়নের গ্রাহক হোন

নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়ান

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দ্বিতীয় যুগ ★

রণেন সেন

১৯৪৬-এর সি সি মিটিং-এর কিছু কথা পূর্বের লেখায় দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ের কিছু ঘটনাও নীচে দিলাম।

মুসলিম লীগের একটা সভায় পাকিস্তান আদায়ের জন্য "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ডাক দেওয়া হয়। সেই সভাতে লীগ নেতারা বৃটিশের দেওয়া খেতাব পরিত্যাগ করেন বেশ আড়ম্বর করে যেমন স্যার নাজিমুদ্দিন 'স্যার' খেতাব ত্যাগ করলেন সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে। এরকম অনেকেই করলেন। মনে হল খুব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপার। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক কার বিরুদ্ধে তা উহ্য থেকে গেল।

পার্টি নেতৃত্বের কেউ কেউ বললেন, ঐ 'ডাক' মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী; অন্যেরা বললেন ওটা সাম্প্রদায়িক, ওর মধ্যে কোন প্রগতির চিহ্ন নেই।

প্রাদেশিক পার্টি অফিসের কাছে ডেকার্স লেন ও এসপ্লানেড ইস্টের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আমরা লীগের কেন্দ্রীয় মিছিল দেখি। বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে ধর্মতলার মোড়—মেট্রো সিনেমা—ট্রামের গুমটিতে ঐ মিছিল জড় হয়। কয়েকটি ছোট মিছিলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পোষ্টার ছিল, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক স্লোগানও ছিল। সেগুলিতে আমাদের কিছু পার্টি-সভ্য, সমর্থক নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু বড় বড় মিছিলগুলি মারমুখী সাম্প্রদায়িক আওয়াজ নিয়ে জড় হয়। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে হিন্দুর খোলা ও বন্ধ দোকান লুট হতে থাকে এবং হিন্দু পথচারী আক্রান্ত হতে থাকে।

তার পরই শুরু হয় বীভৎস নিষ্ঠুর ভাতৃঘাতী দাঙ্গা—কলকাতায়। তারপর নোয়াখালি, বিহার। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত, গান্ধীজীর কলকাতা অনশন পর্যন্ত, প্রায় ২ বছর দাঙ্গা চলে।

★ প্রথম অংশ,—মূল্যায়ন, শারদীয় ১৩৯৪

এই দাঙ্গার ভিতর দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বস্তরে পরিষ্কার বুঝতে সক্ষম হল লীগের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ এবং কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশের মধ্যে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকে পড়েছে। এবং সবকিছু যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, জনগণের একতা নষ্ট করে, নিজেদের কবজা কায়েম রাখার জন্য, জাতীয় অগ্রগতি রোধের জন্য সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র। এই বক্তব্যর মানে কেউ যেন না ভাবেন যে পার্টির ঐ সামান্য কথাটা বুঝতে এত দেরী হল!

মুসলিম লীগের অভ্যুত্থান, পাকিস্তান প্রস্তাব, মুসলিম জনগণের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর প্রবেশ ও প্রভাব, যার ফলে পার্টির "পাকিস্তান ও ন্যাশনাল ইউনিয়ন" (পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য) প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাবলী ১৯৪০ থেকে ঘটতে থাকে। কিছু পার্টিসভ্যকে লীগের সভ্য করা হয় ভিতরে কাজ করার জন্য অর্থাৎ লীগকে প্রগতিশীলতার পথে টেনে নেওয়ার জন্য। লীগ নেতৃত্বের মধ্যে কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি থাকায় লীগ সম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে প্রবেশ করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলনে মুসলিম জনগণের বিপুল অংশগ্রহণ এমনকি মুসলিম লীগ নেতৃত্বের একটা অংশের অংশগ্রহণ ঐ ধারণার মূলে ছিল।

যাই হোক পার্টির এই ভুলের মাশুল দিতে হয়। একে জনযুদ্ধনীতি তার উপর লীগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পার্টিকে দেশপ্রেমিক জনগণ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে। কংগ্রেস নেতারা তার সুযোগ নেয় ও পার্টির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে।

কিন্তু হিন্দু মুসলমান শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্টির শিকড় মজবুত হয়। তারই জোরে সব বিপদ কাটিয়ে নতুন পথের দিকে অগ্রসর হয়।

১৯৪৬-এ বাংলায় তেভাগা আন্দোলন

বাংলার ভূমিব্যবস্থা লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একবারে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা পরিগ্রহণ করে। বাংলায় জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি বংশপরম্পরায় কৃষককে শোষণ করে। কৃষিজাত ফসল নিম্নস্তরে থাকে, কৃষকের অবস্থা হয় শোচনীয়। ঋণগ্রস্ত, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তার উপর বর্গা প্রথার ফলে লক্ষ লক্ষ বর্গা কৃষক তার

অনন্তর কায়িক পরিশ্রম করে যে ফসল হত তার অর্দ্ধেক অংশ জোতদারকে দিতে হত। ফলে গ্রামের দরিদ্র বর্গা চাষীর পেটে ভাত ছিল না। এই বর্গা প্রথা সারা বাংলায় থাকলেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এর প্রকোপ বেশী ছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে বর্গা চাষীর বরাবরই আপত্তি ছিল। যখন কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের কাছে পৌঁছয়নি, কৃষকসভা সংগঠিত হয়নি, তখনও স্থানে স্থানে এই বর্গা প্রথার বিরুদ্ধে চাষীর বিক্ষোভ ও সংগ্রাম হয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলন গ্রামে পৌঁছে গেলে, কৃষকসভা গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু করে ধ্বনি দেয়—লাঙ্গল যার জমি তার, কৃষকের হাতে জমি চাই, বর্গা প্রথার পরিবর্তন চাই, বর্গা চাষী ফসলের তিন ভাগ রাখবে জোতদারকে এক ভাগ দেবে প্রভৃতি। সেই থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং কৃষক আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান হয় এই বর্গা অঞ্চল।

১৯৪৬ এ এই বর্গা আন্দোলন শুরু হয় দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলায় এবং খুব ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। অন্যান্য জেলায়ও বিস্তারলাভ করে। পূর্বে উল্লিখিত জেলাগুলিতে বর্গা চাষীর সমর্থনে প্রায় সমস্ত চাষী দাঁড়ায়, হিন্দু ও মুসলমান কৃষক যোগ দেয়, মুসলিম লীগের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও। হিন্দু ও মুসলিম জোতদারের সমর্থনে বাংলার মুসলিম লীগ সরকার কৃষকের উপর অকথ্য অত্যাচার করে, শত শত মেয়ে-পুরুষ কৃষক পুলিস ও জোতদারের গুলিতে শহীদ হয়। আন্দোলন দমিত হলেও তার প্রভাব পড়ে উত্তর বাংলার কৃষকদের উপর।

ওয়াভেল প্ল্যান

ভারতে যখন বৃটিশ কেবিনেট মিশন আসে সেই সময় লর্ড ওয়াভেল ভারতের গভর্ণর জেনারেল (বড়লাট) ছিলেন। ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন এক প্ল্যান লীগ-কংগ্রেস নেতৃত্বের সামনে রাখেন। এই উপলক্ষে সিমলায় নেতাদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্ল্যানের মোদ্দা কথা ছিল কংগ্রেস ও লীগ মিলিতভাবে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করুক যার উপর কোন দলের আধিপত্য বা নেতৃত্ব থাকবে না। কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব ঐ প্ল্যান মেনে নেয়। বস্তুত একটা অদ্ভুত কেবিনেট গঠিত হয়। অর্থমন্ত্রী হল লিয়াকত আলি খাঁ (লীগ), নেহেরু ও কেবিনেটে ছিলেন, তাঁর দায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীর মতই কিন্তু তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত না, সর্দার প্যাটেলও মন্ত্রীসভায় ছিলেন। স্বভাবতই

এইরকম মন্ত্রীসভার বিশেষ মূল্য ছিল না। কারণ কংগ্রেস-লীগের ঐক্য ও মিটমাটের ভিতর দিয়ে এই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়নি (তার পূর্বে গান্ধী-জিন্নাহ যুক্ত আলোচনা ব্যর্থ হয়) এই মন্ত্রীসভায় রেষারেষিই প্রবল ছিল। তাই অবধারিত ভাবেই ঐ সরকার ভেঙ্গে পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার সামনে প্রচার করে যে তারা তো জাতীয় নেতাদের হাতে সরকার দিয়েছিলেন কিন্তু ভারতীয় নেতারা সে সরকারে বনিবনা করে মিলিতভাবে কিছুতেই অগ্রসর হলেন না। যদি হতেন তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তর কত সোজা ও সহজ হত। সাম্রাজ্যবাদের বক্তব্য ছিল এমন অবস্থায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে পৃথকভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কথা বলতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বৃটেনও আর ভারতে থাকতে চায় না, তার পবিত্র কর্তব্য সমাপন করে সে ভারত ত্যাগ করবে।

সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের ফলে ঠিক ঐ সময়ই কলকাতা, বোম্বাই, নোয়াখালি ও বিহারে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তাছাড়া ছোটখাট বহু সংঘর্ষ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়। বিবাদমান দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এই ভ্রাতৃঘাতী বিবাদের সময়ও হিন্দু মুসলমান শ্রমিক মিলিত ধর্মঘট অনুষ্ঠিত করেছে; মিলিত কৃষক সংগ্রাম হয়েছে যেমন বাংলায় হিন্দু-মুসলিম কৃষক মিলিতভাবে তেভাগা আন্দোলন করেছে। দেশের জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে সঠিক পথ নির্দ্ধারণে পার্টি নেতৃত্বের ত্রুটি, কোন কোন সময় ভুল পদক্ষেপ সত্ত্বেও দেশের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ও জনগণের সহিত পার্টির অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ থাকার জন্য পার্টি কখনই বেশী দিন পথভ্রষ্ট বা নিষ্ফল হয়ে থাকেনি।

১৯৪৭-এর জুনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ও প্রস্তাব

দরিয়াগঞ্জে অবস্থিত তদানীন্তন দিল্লীর পার্টি কমিউনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত তার আগেই সাম্রাজ্যবাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হবে।

কংগ্রেস নেতৃত্ব-গান্ধীজী, গফ্‌ফর খাঁ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া সকলেই বৃটিশ প্রস্তাবে রাজী হয়। লীগ নেতৃত্ব তো মোটামুটি তার [illegible]

জুলাই মাস থেকেই উভয় পাঞ্জাবে বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, লুটতরাজ, নারী ও শিশুহরণ শুরু হয়, সে কলঙ্কজনক ইতিহাস এখানে লিখছি না। বাংলাদেশে এই দাঙ্গা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বীভৎস রূপ ধারণ করে।

যাইহোক, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছিল ১৫ই আগস্ট। সুতরাং তারই মূল্যায়ণ করা, পার্টি ও দেশকে পথনির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সি সি সভা ডাকা হয়েছিল।

ঐ সি সি সভায় যে প্রস্তাব পাশ হয় তার সারাংশ নীচে দিলাম—

তখন দেশ ও পার্টির সামনে যে প্রশ্ন ছিল তা হল ঐ ক্ষমতা হস্তান্তর, ভারত ও পাকিস্তানের উদ্ভব—এর রূপ কি, চরিত্র কি?

সি সি জবাব দিল—এই ক্ষমতা হস্তান্তর দেশের অগ্রগতি সূচনা করছে, জাতি একে আরও এগিয়ে নেবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু এটা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়।

এই শেষোক্ত কথা থেকেই বোধ হয় স্লোগান উঠেছিল—এই আজাদী ঝুটা হ্যায় অর্থাৎ এই স্বাধীনতা ঝুটা অর্থাৎ মিথ্যা!

আগস্ট, ১৯৪৭ এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তাতে বলা হয় যে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে নিবেদিত করছে, পার্টির সামনে সেটাই প্রধান কাজ।

১৫ই আগস্ট যে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল সেটা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। এই মত বহু বৎসর পার্টির মধ্যে বর্তমান ছিল।

যতটা মনে পড়ে মাদুরা পার্টি কংগ্রেসে কমরেড অজয় ঘোষের নেতৃত্বে পার্টি এই ধারণা বা স্লোগান বাতিল করে। যাইহোক বারান্তরে এবিষয়ে আরও বলা যাবে। সি সি সভা চলাকালে একদিন শেখ আবদুল্লা, বকশী গোলাম মহম্মদ ও সাদিক আলি আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপের জন্য আসেন। সেই তাঁদের দেখি। তাঁরা আজাদ কাশ্মীরে আন্দোলনের বীর ত্রয়ী নেতা। যদিও আবদুল্লা আবার তাদের মধ্যে নেতা গণ্য হতেন।

সেই সময় পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ভবিষ্যৎ সূচনা হয়। দিল্লীতে ন্যাশনাল হোটেলে সভা করে জিন্না পাকিস্তান ঘোষণা করে ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭। সেই উপলক্ষে কমরেড লাল মহম্মদ খাঁ (পেশোয়ারের পাঠান পার্টি সভ্য) ও পাঞ্জাবের ইব্রাহিম আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও একটা এবং অবিভাজ্য ছিল।

নতুন ভারতের জন্ম

১০ই আগষ্ট, ১৯৪৭ এর এক মেঘমেদুর মধ্যরাত্রে ভাইয়ের রক্তস্নাত নতুন ভারত জন্মলাভ করল। দেশবিভাগজনিত দুঃখ, দাঙ্গা, দেশত্যাগ সত্বেও দেশবাসী বুঝল ১৯০ বছর পরে দেশ পরাধীনতার অভিশাপ, গ্লানি ও অপমান থেকে মুক্তিলাভ করল। সহস্র সহস্র শহীদের রক্তে রাঙা ইতিহাসের এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল, নতুন অধ্যায় শুরু হল। তাই সেদিন ১৪ই আগষ্ট রাত বারটার পর থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে কমবেশী ছোট বড় মিছিল ঐ নবলব্ধ স্বাধীনতাকে অভিনন্দন করে মুক্তির উল্লাসে জয়ধ্বনি করে সব দুঃখ বেদনা সত্বেও।

সি সি প্রস্তাবে "যদিও" বা "কিন্তু" থাকলেও জনগণের এই আনন্দ উল্লাসে পার্টিও উদ্দীপিত হয়।

দেশের জনগণ প্রদেশে ও কেন্দ্রে যে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হল তার কাছে অনেক আশা করেছিল, বিশেষত দুঃখদুর্দশা দূরীকরণের ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রত্যাশা। কিন্তু শুরুতে ভাল ভাল কথা ও কিছু সীমিত কাজ হলেও ক্রমেই "রাজকার্যে" কাঠিন্য দেখা দিতে লাগল। যে চোরাকারবারীদের নিকটস্থ ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসি দেবার কথা নেহেরু নির্বাচনের পূর্বে বলেছিলেন সেই চোরাকারবারী ও ধনিক গোষ্ঠী যেন মাথাচাড়া দিতে লাগল, গণতন্ত্র পুঁথিতেই আবদ্ধ থাকতে লাগল।

তবে কি স্বাধীন দেশে জনগণ স্বাধিকার পাবে না বা পেতে পারে না? অর্থনৈতিক সংকটের কি হবে? মানুষের অগ্রগতি কিভাবে, কি পথে হতে থাকবে? ইত্যাদি প্রশ্ন রাজনীতি চেতনাসম্পন্ন লোকদের মাথায় আসতে লাগল। কিন্তু তা ব্যাপকভাবে তখনও উঠল না।

পশ্চিম বাংলায় বিক্ষোভকারী মিছিলের উপর গুলি চলে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা চলাকালে, ১৯৪৭ এর শেষভাগে। একজন নিহতও হয়। কিছু রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ হলেও পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিবাদ হরতালের ডাক দেয় কিন্তু তাতে বিশেষ কোন সাড়া জনগণ দেয় না। নতুন সরকারের গতিপ্রকৃতির সমালোচনা পার্টির মধ্যে হতে থাকে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে গবর্ণমেন্টের উপর ধনিকবণিকের কবজা যেন বেশ মজবুত হচ্ছে। এবং শ্রমিকের অগ্রণী অংশ তার বিরুদ্ধে স্বর ও মুষ্টির হাত উঠাতে লাগল।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ এর ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহুত হল বোম্বাই কেন্দ্রীয় পার্টি দফ্‌তরে।

যতটা মনে পড়ে বাংলার সি সি সভারা তীব্রভাবে কংগ্রেস সরকারের ক্রিয়াকলাপ, মতিগতির নিন্দা করে এবং তাঁরাই প্রথম কামান দাগতে শুরু করেন। সি সির মধ্যে দারুণ মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদিকে পি সি যোশী, পি সুন্দরায়ার নেতৃত্বে কিছু কমরেড অন্যদিকে বাংলার চার কমরেড, বি টি রণদীভে, অজয় ঘোষ, ডাঙ্গে প্রমুখ কমরেডরা। অন্যান্য কমরেড যেমন ই এম এস, ঘাটে, ডাঃ অধিকারী প্রমুখ কতকটা নীরব ছিলেন। ঐ সি সি সভা শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-বামের লড়াই হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। যোশী, সুন্দরায়ার লাইন ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে জনগণের বিরাট জয় সূচিত হয়েছে, একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সরকারকে আক্রমণ করলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে দেশকে গড়তে হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে, তার জন্য জাতীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিতে হবে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণী এখনও প্রগতিশীল ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে "বামদের" মত ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে, এটা জনগণের আশু বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টা মাত্র। ক্ষমতা যতটুকু হস্তান্তরিত হয়েছে তাতে স্বাধীনতার ধার কাছ দিয়ে দেশ অগ্রসর হয়নি, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় আসায় জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে, দেশে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য, বেকারী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্দ্ধ সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ, জায়গিরদারী, জমিদারী প্রথা প্রভৃতি দেশকে এক বদ্ধ কূপের মধ্যে টেনে রাখবার চেষ্টা হচ্ছে, বুর্জোয়া শ্রেণী একদিকে জনমানসে বিভ্রান্তি প্রসারের চেষ্টায় ব্যাপৃত অন্যদিকে গণবিক্ষোভ ঠেকানর জন্য দমননীতির সাহায্য নিচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি যদি সাহসের সঙ্গে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল ভেদ করার চেষ্টা করে ও জনগণের বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিতে পারে, তবে বিপ্লবের পথ সুগম হবে। পার্টির ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এই সি সি মিটিংই দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাইন স্থাপন করে।

যোশীপন্থীরা রণদীভেপন্থীদের যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বামদিকেই যায়।

ঠিক সেইদিনেই ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলন দিল্লীতে হয় যেখানে ভারত সরকার তার শ্রমনীতি বিবৃত করে। বিস্তারিত সঠিক মনে নেই। সরকারের বক্তব্য ছিল দেশে শিল্পায়ন করার জন্য, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর হওয়া প্রয়োজন, শ্রমিককে ধর্মঘট ইত্যাদি পরিহার করতে হবে আর মালিক পক্ষেরও গান্ধীজীর ট্রাস্টিশিপ নীতি গ্রহণ করতে হবে। আর এ আই টি ইউ সির প্রতিনিধি হিসাবে পি রামমূর্তি সেই সম্মেলনে বলেন যে মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সংঘর্ষের পরিবর্তে মৌল ঐক্যই প্রধান।

সেই ডিসেম্বরের শেষ ভাগে বা ১৯৪৮এর জানুয়ারীর একেবারের গোড়ায় (তারিখ মনে নেই) পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের কলকাতা শহরে প্রথম সভা করতে আসেন। তাই সি সি মিটিং থেকে আমাকে ট্রেনে কলকাতা পাঠান হয় যাতে প্রাদেশিক কমিটির সভা ডেকে সি সির বক্তব্য সুস্পষ্ট করে দিতে পারি। ভয় ছিল যে বাংলার পার্টি হয়ত নেহেরুর সভায় যোগ দিয়ে ফেলতে পারে।

যাই হোক, আমি যখন কলকাতায় পৌঁছলাম সন্ধ্যার পর তখন নেহেরুর সভা শেষ এবং অত বড় সভা নাকি কখনও হয়নি (লক্ষাধিক)। যাই হোক বাংলার পার্টির যোগ দেওয়া না দেওয়া আর কোনও প্রশ্নই থাকল না। তবে প্রাদেশিক কমিটির কাছে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য ব্যাখ্যা করি।

কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে নূতন মোড় ফিরল

একপেশে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী রাজনীতি পার্টিতে প্রবেশ করল। আগেই লিখেছি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হল। ডিসেম্বর ১৯৪৭ সি সি মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।

তখনকার দিনে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের নাম ছিল "পিপল্‌স এজ"। এর ২১শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ এর সংখ্যায় প্রামাণ্য দলিলে লেখা হল "...স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে একথা বলা সম্পূর্ণ ভুলনা মিথ্যা·· জাতীয় নেতৃত্ব মেকী স্বাধীনতা গ্রহণ করেছে···"। পার্টি দ্রুতবেগে একপেশে রাজনীতির দিকে চলল। পার্টি কংগ্রেসের প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে কমরেড বি টি রণদিভে কংগ্রেসের মূল দলিল (যাকে পরে বলা হল থিসিস) লিখে ফেললেন এবং তা নিয়ে আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে (কলকাতায় ভবানী সেন, লাহিড়ী

ও আমার সঙ্গে) আলাপ করলেন ভবানী বাবুর বাসায়। আমরা মোটের উপর মত দিলাম।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস—কলকাতায়

তখন কলকাতায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলেছে। মহম্মদ আলী পার্ক জুড়ে বিরাট প্যাণ্ডাল। সম্মেলনের নিরাপত্তার দায়িত্ব কমরেড নারায়ণ রায়, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং এর উপর। তাঁদের অধীনে শক্ত অঙ্গী বাহিনী—কয়েকজনের নাম মনে আছে—গৌতম চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু বোস, মিহির বোস, নৃপেন সেন (যিনি পরবর্তী যুগে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যক্ষ হন), মহম্মদ হারীশ (বিড়ি শ্রমিক), আর কে কুণ্ড (যিনি এখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রেডিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান) প্রমুখ। মোটের উপর আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী নিরস্ত্র ছিল না। কারণ তার আগে কমরেড চারু ঘোষের বাড়ীতে আন্তর্জাতিক যুব প্রতিনিধিদের সভায় কংগ্রেসী গুণ্ডারা সশস্ত্র আক্রমণ করে একজনকে হত্যা করে। দ্বিতীয় কংগ্রেস বসল ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ, ১৯৪৮ পর্যন্ত। প্রথম কংগ্রেস বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ এর মে মাসে। তারপর এই দ্বিতীয় কংগ্রেস। এতে পাকিস্তানের কমরেডরা শেষ বারের মত যুক্ত পার্টি কংগ্রেসে অংশ নেন ও পার্টি ভাগ করা হয়। পাকিস্তানে সাজ্জাদ জহীরকে সম্পাদক করে এক নতুন কেন্দ্রীয় ও দুটি প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয় যাতে কমরেড মণি সিং, খোকা রায়, কৃষ্ণ-বিনোদ রায়, নেপাল নাগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ও কমরেড সাজ্জাদ জহীর, জামালুদ্দীন বুখারি, সিপ্রিয়ান, ইব্রাহিম, ফজলে ইলাহী কোরবান, আতা মহম্মদ খাঁ প্রমুখ কমরেডরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকেন। সেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেলাম! মনে বেদনাও অনুভব করলাম। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানতে হল। দুই দেশ দুই পার্টি গঠিত হল। তবে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকলাম।

৬৩২ জন প্রতিনিধি এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। এই কংগ্রেসের পূর্বে পি সি যোশী নামে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেসে রাজনৈতিক ও সংগঠনিক প্রস্তুতিতে তাঁর কোনও অংশ ছিল না। কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বিষয়সূচী ছিল—

১) রাজনৈতিক খসড়া দলিল (থিসিস)-উপস্থাপক কমরেড রণদীভে।

২) পার্টিতে দক্ষিণ বিচ্যুতির দলিল—উপস্থাপক কমরেড রণদীভে।

৩) বিবিধ প্রস্তাবাবলী বিভিন্ন বিষয়ে।

৪) পাকিস্তানে নূতন পার্টি গঠন।

৫) নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন—নূতন সাধারণ সম্পাদক ও রাজনৈতিক বুরো গঠন (পিবি)।

৬) নূতন কন্ট্রোল কমিশন নির্বাচন।

প্রকাণ্ড রাজনৈতিক খসড়া দলিলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করা হল। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে ১৯৪৮-১৯৫০ এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক প্রস্তাব ও বিবৃতি অজস্র পুনরাবৃত্তি ও পুনর্কথন দোষে দুষ্ট। খসড়া প্রস্তাব ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি শীর্ষক দলিল ছাড়াও নূতন নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বি টি রণদীভের অন্য প্রত্যেকটি দলিলও ঐদোষে দুষ্ট। ঐ সময়ের পরবর্তী সি সি, পি বি বা অন্যান্য দলিলেও পুনরাবৃত্তি প্রভূতভাবে বর্তমান ছিল।

কংগ্রেসে উপস্থাপিত দলিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খসড়া রাজনৈতিক দলিল (থিসিস) মূলত দুটি অংশে বিভক্ত এবং তারই মধ্যে আবার উপবিভাগ রয়েছে—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য।

প্রথম আন্তর্জাতিক অংশ—

ক) দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর অবস্থা—জনগণের শক্তিবৃদ্ধি, ফ্যাসিজম ও জাপ সাম্রাজ্যবাদের পতন, সোভিয়েত দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক উৎকর্ষ প্রমাণিত, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান, বৃটেন-ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্য বিনষ্ট।

খ) পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে জনগণের প্রাধান্য, অভ্যুত্থান ও সরকার গঠন।

গ) চীনে নূতন ধরনের জনগণতন্ত্র কায়েম—যার প্রভাব এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এমনকি সমগ্র বিশ্বে অনুভূত হয় বিশেষভাবে। সে যুগে নব্য-চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অভ্যুত্থান বিশেষ বৈপ্লবিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। পৃথিবীতে শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী ভারসাম্য জনগণের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

ঘ) পরাধীন উপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ।

যার ফলে পৃথিবীতে ভারসাম্য শান্তি, স্বাধীনতা, প্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক দিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

এই উপরোক্ত চারটি কারণে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জনগণের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাসী বিশেষত তার নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা আরও পরিস্ফুট হয়—নেতৃত্বের ধনতন্ত্র—সাম্রাজ্যবাদমুখী ক্রিয়া-কলাপ আরও পরিস্ফুট হতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদের সংকট

যুদ্ধের পরবর্তী যুগে সাম্রাজ্যবাদের সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার ফলে উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হতে থাকে এবং যার ফলে সাম্রাজ্যবাদের সংকট আরও তীব্রতর হতে থাকে। তাই নূতন ধরনের শোষণ ও শাসন ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তা করতে থাকে এবং সেই পথে অগ্রসর হয়—যার নাম নয়া উপনিবেশবাদ। যার মোদ্দা কথা পুরাতন শোষণ ও শাসনের পরিবর্তে পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার, অর্থনীতির সঙ্গে ব্যবসায় সূত্রে আবদ্ধ রাখা এবং দেশের মধ্যে একদল দালাল (কোথায়ও নবসৃষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণী, কোথায়ও উপজাতি সর্দার/মোড়ল প্রভৃতি) মারফৎ পর্দার আড়ালে যথাসম্ভব নিজেকে পিছনে রেখে দেশ পরিচালনা করা।

অন্যদিকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যার উপর যুদ্ধের ধকল একেবারেই পড়েনি, যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ক্ষয়িষ্ণু, সংকটাকীর্ণ ধনতন্ত্রকে রক্ষার জন্য "মার্শাল প্ল্যান" প্রবর্তন করে। এই প্ল্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসীর নেতৃত্বের মারফৎ শ্রমিকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এই প্ল্যানের মারফৎ ইউরোপের পুনর্জীবন আসবে এই আশ্বাস দেওয়া। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই প্রচার প্রবল ছিল।

সাম্রাজ্যবাদ নব নব বন্ধু, সমর্থক ও দালাল খোঁজার ও সৃষ্টি করার কাজে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার নবজাগরণ পৃথিবীর উপর প্রচণ্ড ধাক্কা ফেলে। শুধু চীন নয় এশিয়ায় ইন্দোচীন, বিশেষত ভিয়েৎনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম সমস্ত পরাধীন দেশেই প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র আরব দুনিয়া ও কালা আফ্রিকা গাঝাড়া দিয়ে ওঠে। এমনকি ইউরোপের বুকে ফ্রান্স ও ইতালীতে

শ্রমিকশ্রেণী জোর কদমে এগুতে থাকে। ঐ দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি-গুলি জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে নিজেদের স্থাপিত করতে সক্ষম হয়। ফ্রান্স ও ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির ফ্যাসীবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামে আত্মবলিদান ঐ দুটি পার্টিকে সেখানকার জনগণের চক্ষে "শহীদের পার্টি" হিসাবে চিহ্নিত করে।

স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে মূল উৎস ছিল সোভিয়েত দেশ তাই সাম্রাজ্যবাদ আবার নূতন করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতা সোভিয়েত দেশকে আক্রমণ করতে চায়। চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা তারই সূচনা।

ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

যুদ্ধোত্তর যুগে এই পরিস্থিতির বিস্তৃত আলোচনা ও ব্যাখ্যা এই দলিলে করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অবস্থার বিশ্লেষণ যেমন ১৯৪৭-এ ঝ্দানভের দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির ছায়া অবলম্বনে করা হয়, জাতীয় অবস্থার বিশ্লেষণ ও সেইরকম ঝ্দানভের দলিলের ছায়ায় করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তাতে অনেক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রাখা হয়েছে যা ঝ্দানভের দলিল থেকে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয় না। অনেক কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টা চলেছে ঝ্দানভের দলিলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্য। দলিলে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশ্লেষণ (সংক্ষেপে দিলাম)—

(ক) যুদ্ধের মধ্যদিয়েই ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ও সমাজবিন্যাসে এক নূতন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দেশীয় ধনিকবণিকের সহযোগিতার পথ সুগম হয়।

পুরাতন ঔপনিবেশিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত মূল কথা ছিল সামন্ততন্ত্রের সমর্থনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করা। কারণ সামন্ততন্ত্রের রক্ষক ছিল সাম্রাজ্যবাদ। এবং এই দুই শক্তি ভারতে নব উদীয়মান বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ঐ শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল বৃটিশ সৃষ্ট আমলাতন্ত্র প্রধানত ইংরাজ আমলাগণ যাদের বলা হত "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইস্পাতের কাঠামো" (Steel frame of British Imperialism) এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খুব মজবুত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তর যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে জনগণের ক্রোধাগ্নি থেকে বাঁচবার জন্য নতুন সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করে। তারা জাতীয় মুক্তি-

সংগ্রামের নেতা কংগ্রেস নেতৃত্বের যুদ্ধোত্তর যুগে জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনে অনীহা, আপত্তি ও ভীতি লক্ষ্য করে এবং তাদের দলে টানবার প্রয়াস করে। বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদ তার সামাজিক ভিত্তিভূমি প্রসারিত করতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কারণ—

(ক) অর্থনৈতিক সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এসেছিল। বৃটিশ ধনিকের মূলধন রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতের যে পাউণ্ড স্টার্লিং যুদ্ধের মধ্যে ইংলণ্ডে সঞ্চিত হয়েছিল তারও একটা বিলিব্যবস্থার জন্য ভারতের বুর্জোয়ার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতার দরকার ছিল।

(খ) এই ব্যাপারে বৃটেন যদি অপারগ হত তাহলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ঢুকে পড়ত।

(গ) যুদ্ধের যুগে ভারতের মূলধন শক্তি সঞ্চয় করেছিল ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের সমর্থন ও সহযোগিতায়। সুবিধাজনক শর্ত না পেলে তারা সহযোগিতায় আসতো না।

(ঘ) পুরানো ধরনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্ভব ছিল না। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বুর্জোয়াশ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় কংগ্রেস প্রস্তাবে লেখা হয়েছে "তথাকথিত ক্ষমতা হস্তান্তর ভারতীয় বুর্জোয়ার সন্তুষ্টির জন্য এক অন্যতম প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান।...যার অর্থ ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীই উপনিবেশবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবে।" "...শিল্প, ব্যবসায়, বণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে শোষণের জন্য ভারতীয় বুর্জোয়াকে ক্ষুদ্র সাথী বা অংশীদার করে নেওয়া যাতে যুক্তভাবে দেশে শোষণ-কার্য চালান যায়।"

"...পণ্য রপ্তানী, রপ্তানী শিল্পোন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রাদির আমদানি তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ার ক্ষুদ্র স্বার্থ-পরতা তাকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার পথে নিয়ে চলল, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করল।"

যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও নব শ্রেণীবিন্যাস

"শ্রমিক ও কর্মচারীগণের অঙ্গী সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ, তার বিস্তৃতি... দেশীয় রাজ্যে কৃষক ও অন্ত' গোলামের জাগরণ", দেশের অন্তত্র সশস্ত্র সংগ্রাম

(নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি) বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নব উন্মেষ আনল··· গণতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করল···আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন সমগ্র দেশে জনমানসে আগুন জ্বালিয়ে দিল···"

ভারতে যুদ্ধোত্তর যুগের মূল শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা কংগ্রেসের দলিলে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা হয়েছে—

(ক) দেশজোড়া আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন—১৯৪৬-এর শেষে (নভেম্বর)

(খ) রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ—১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারী (পরে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হবে)

(গ) ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় ফৌজ অপসারণের আন্দোলন ।

(ঘ) জব্বলপুরে ৩০০ সিপাহীর কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা উড্ডীন করে শহরের রাজপথ পরিক্রমণ ও কাজ বন্ধ রাখা—৪ঠা মার্চ, ১৯৪৬

(ঙ) দেরাদুনে গোর্খা সৈন্যের বিক্ষোভ প্রদর্শন—১৮ই মার্চ, ১৯৪৬

(চ) এলাহাবাদ পুলিশের অনশন সত্যাগ্রহ—১৯শে মার্চ, ১৯৪৬

(ছ) দিল্লি পুলিশের অনশন সত্যাগ্রহ ।

(জ) ১০,০০০ বিহার পুলিশের ধর্মঘট—৩রা এপ্রিল, ১৯৪৬

(ঝ) কাশ্মীরের জনগণের রাজার বিরুদ্ধে তীব্র ও ব্যাপক সংগ্রাম—মে, ১৯৪৬

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশে সর্বপ্রকার বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, সমাবেশ প্রভৃতি বন্ধ করার উপদেশ দেয়, গণ জাগরণের পিছনে ছুরিকাঘাত করতে থাকে ।

মুসলিম লীগ নেতৃত্ব হিন্দু ও মুসলমানের ভিন্ন স্বার্থের কথা তোলে এবং পাকিস্তানের পরিপন্থী হিসাবে সব আন্দোলনই বন্ধ রাখতে চায় । লীগের নেতৃত্ব ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম জায়গীরদার, জমিদার ও মূলধনী স্বার্থান্বেষী ছিল । লীগ দেশের স্বাধীনতার জন্য কখন কোন আন্দোলন করেনি । এমনকি কংগ্রেস নেতৃত্ব যতটুকু সীমিত, সংস্কারবাদী আন্দোলন করেছে লীগ নেতৃত্ব তারও বিরোধী ছিল। মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের পরিচালনা থেকে কখনও ভিন্ন-মত-

মানের যুক্ত আন্দোলন সমর্থন করেনি, মুসলিম জনগণের পশ্চাৎপদতার সুযোগে তাদের ধর্মান্ধতা জাগাবার প্রচেষ্টা করেছে। ভেদবুদ্ধির উদ্গাতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্ররোচক ছিল লীগ নেতৃত্ব যদিও লীগের মধ্যে কিছু কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তিও ছিলেন।

সোস্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্ব বড় বড় বুলির আড়ালে প্রধানত ও মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বের অনেক কার্যের মৌখিক বিরোধিতা করে ও কংগ্রেসকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করে। কিন্তু এখানে বোঝা প্রয়োজন যে ঐ পার্টির বহু কর্মী ও নেতৃত্বের একাংশ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরলস বিরামহীন সংগ্রামের কথা ভাবত। (এদের থেকে অনেক নেতা ও কর্মী যেমন অরুণা আসফ আলী প্রমুখ নেতা ও কর্মীরা ১৯৫২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন—মন্তব্য রণেন সেনের)

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের (এ্যাওয়ার্ড) প্রকৃত স্বরূপ—

দ্বিতীয় কংগ্রেসের দলিলের উদ্ধৃতি: "জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার শেষ পরিণতি হল মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ গ্রহণ ·· গণতন্ত্রের প্রতিটি ধ্বনির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। বুভুক্ষু জনগণের পিঠে ছুরিকাঘাত করে জাতীয় নেতৃত্ব এই দেশদ্রোহী বিশ্বাসহন্তা চুক্তি করল—দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি অঘন্য প্রতারণা করল।"

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদই ভারত বিভাগ করল। "জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বরাবরই দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারের বৈপ্লবিক নীতির ভিত্তিতে সমাধান করতে চায়নি, তারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের সাম্রাজ্যবাদী সমাধান গ্রহণ করল।" সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তই ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করল—শ্রেণীসংগ্রাম ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম পিছনে পড়ে রইল। প্রস্তাবের ভাষায় "ঝুটা আজাদী", "শাসনের চেহারার পরিবর্তন হল মাত্র।"

সৈন্য বিভাগ পুরাতন নেতৃত্বে এবং দৃষ্টিতে পরিচালিত হতে থাকল। "রোয়েদাদ"-সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদপসারণ নয়, এটা ছিল ভারতীয় জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে এক প্রতি আক্রমণ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাইরের কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে এবং পরিবর্তিত অবস্থাকে "জাতীয় অগ্রগতি", "স্বাধীনতা" বলা হল। উদ্দেশ্য হল

জাতীয় নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা ও সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত আড়াল করা, ঢেকে রাখা।"

জাতীয় নেতৃত্ব, গভর্ণমেণ্ট ও জনগণ

"ভারত সরকার বৃটিশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ব্লক যোগাযোগ করেছে"—উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা। কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী (গণপরিষদ) উচ্চ শ্রেণীর জন্য সংবিধান রচনা করছে। বিনা বিচারে কয়েদ রাখা, প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিতীয় (উচ্চ) পরিষৎ গঠন (রাজ্যসভা), রাজ্যপাল কর্তৃক লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রতিনিধি মনোনয়ন (উদ্দেশ্য উচ্চ শ্রেণীর কর্তৃত্ব কায়েম রাখা), সরকারী অর্ডিনেন্স ও ঘোষনার মারফৎ রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইন ও ক্রিয়াকলাপ সন্নিবিষ্ট হচ্ছে সংবিধানে। সংবিধানে ভাষাভিত্তিক রাজ্য বা প্রদেশ গঠনের বিধান নেই যার ফলে ক্ষুদ্র জাতিগুলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অবদমিত হবে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইন্ধন সৃষ্টি হবে। সর্দার প্যাটেলের এই নীতি।"

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতি—বৃটিশ ও আমেরিকান ব্লকের কাছ থেকে উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রাদি পাবার জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে ঐ ব্লকের সাথে সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা করা, তার কাছে আত্মসমর্পন করা, সুযোগসুবিধার জন্য দরবার করা, বিদেশী পুঁজির জাতীয়করণ বা অসুবিধা সৃষ্টি করা হবে না তার অঙ্গীকার দেওয়া—এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশের অর্থনীতি মর্টগেজ বা বন্ধক দেওয়াই অর্থনৈতিক নীতির মূলকথা।

বৈদেশিক নীতি শ্রেণীস্বার্থ অনুসরণ করে

নেহেরু গণতান্ত্রিক শিবির এড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতির জন্য তৃতীয় শিবিরের কথা চিন্তা করেন। উদাহরণ, কোরিয়া ও ইউক্রেন সম্পর্ক ভারতের নীতি, আমেরিকার সাথে জাপানের স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির সমর্থন, আমেরিকাপুষ্ট ইন্দোনেশিয়া বিরোধী ডাচ ষড়যন্ত্র প্রভৃতি সমর্থন। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কামনা ছিল ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, সিংহল প্রভৃতি এশীয় শক্তিসমূহ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কমিউনিজমের অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিতে সমর্থ হবে।

ভারতীয় বুর্জোয়ার নূতন ভূমিকা

জনগণ ও তার সংগ্রাম সম্পর্কে ক্ষমতা হস্তান্তর এক পরিবর্তন সাধিত করেছে। ধনিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ক্ষমতার অংশ ভোগ করছে, যদিও সাম্রাজ্যবাদ প্রধান অংশীদার। ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির এই হল গোপন কথা। "এখন থেকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি/অভিযান বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি চালাতে হবে—তার রাজনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।"

দাঙ্গার পিছনে রহস্য

সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির চক্রান্তে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ঐ দাঙ্গার বিরুদ্ধে জাতীয় সরকার কর্তৃক নিন্দা অনেক সৎ ব্যক্তিকে সরকারের প্রতি আকৃষ্ট করে। জাতীয় নেতৃত্বের একাংশ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে কারণ দাঙ্গার ফলে শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। যতক্ষণ না সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ দাঙ্গা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হবে। জাতপাতের লড়াই বা জাতীয় সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না। কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃত্বের নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং নিরলস সংগ্রামই একমাত্র সমস্ত দাঙ্গার সম্ভাবনা নিরসন করতে পারে। তাই আপোসকামী এবং সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের মুখোস খুলে দাও। জাতীয় নেতৃত্বের মুখোস খুলে দাও। জাতীয় নেতৃত্বের হাত দাঙ্গার রক্তে কলুষিত; এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাঙ্গা বিরোধী নেহেরুর উক্তি সমর্থন করতে হবে, কারণ তার ফলে নেহেরু ও প্যাটেলের মধ্যের বিরোধকে উস্কে দেওয়া সম্ভব।

নেহেরু ও প্যাটেল

নেহেরু সম্পর্কে অনেক মোহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তিনি এবং সর্দার প্যাটেল উভয়ই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাদের এই ব্যাপারে মতানৈক্য বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার মূল কাঠামোর মধ্যেই সমাধান হবে। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই নেতাদের মতানৈক্যের ভিত্তিতে রণনীতি নির্ধারণ করা অমার্কসীয়। "যখন ধনতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু, সাধারণ সংকটে মুহ্যমান তখন বুর্জোয়া শ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়ের পথে নিতে পারে না, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করে।"

জনগণ ও নেতৃত্ব

জনসাধারণ এখনও জানে না যে সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশ বিক্রীত হয়ে গেছে, কারণ যদিও বারবার আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তবুও নেতৃত্বের প্রতি জনসাধারণের একটা আকর্ষণ আছে। সুতরাং নেতৃত্বের সমালোচনা সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে এবং অর্থনীতির দ্রুত অবনতির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে হবে।

গভীরতর অর্থনৈতিক সংকট—লক্ষণাবলী

(ক) কৃষিজাত ফসলের উৎপাদনের ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি
(খ) শিল্প উৎপাদনের অবনতি
(গ) যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতি
(ঘ) ঋণের বৈষম্য
(ঙ) জমি থেকে উচ্ছেদ ও ভূমিহীনতা বৃদ্ধি

শিল্প এবং যুদ্ধ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রকৃত শিল্পোন্নতি হয়নি, যুদ্ধের মধ্যে বিরাট সরকারী বাধনা সত্ত্বেও। কালোবাজার ও অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে একশ্রেণীর নয়া ধনী ও উচ্চশ্রেণীর হাতে পয়সা জমা হয়েছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত থাকার কারণে—কৃষকের দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা এবং কারখানাজাত দ্রব্যের উচ্চমূল্য। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানা বন্ধ, বেকারী বৃদ্ধি এবং আভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকের মজুরী ও অন্যান্য অধিকারের উপর আক্রমণ করে। "জাতীয় সরকার আর পরিকল্পনার কথা বলে না।"

জনগণ প্রত্যাঘাত করছে

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে কংগ্রেস নেতৃত্ব জনগণের মনে নতুন আশা জাগ্রত করেছিল কিন্তু সে আশা ক্ষণস্থায়ী হয়। শীঘ্রই জনগণের মোহ মুক্তি হতে থাকে, জনগণ প্রত্যাঘাত করতে শুরু করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে থাকে। জনমানসে জমিদারী প্রথার অবসান, যারা চাষ করে তাদের হাতে জমি বিতরণ, সামন্ততন্ত্র, রাজন্যতন্ত্রের অবসান, মূল শিল্পের জাতীয়করণ প্রভৃতি দাবী উচ্চারিত হতে থাকছে। "শ্রমিক

শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষককুল ও অত্যাচারিত নিম্ন মধ্যবিত্তের সম্মিলিত জোটবন্দী প্রয়োজন। এই জোটবন্দীর ফলে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণীসমূহের জোটবন্দীর ভিত্তিতে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবে, যে রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী এবং শোষকশ্রেণীগুলি বর্জিত হবে।...এই সরকারই প্রকৃত শোষিত শ্রেণীর রাষ্ট্র হবে..." "...শুধু যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই জনগণের সংগ্রামকে পরিচালিত করতে হবে তাই নয় বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেও একে সংগঠিত করতে হবে। অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে বোঝার প্রয়োজন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরাতন স্তর শেষ হয়ে গেছে, যে স্তরে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল...আজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠন করতে হবে" শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত মেহনতি জনগণের জোটের (ফ্রন্ট) ভিত্তিতে।

চার শ্রেণীর জোটবন্দী

"...গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূর্তিতে যে যে শ্রেণীর স্বার্থ নিহিত সেই শ্রেণীর জোটবন্দী ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে না।" শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন এই নতুন জোটবন্দীর কাঠামো ও ভিত্তিভূমি তৈরী করবে। শ্রমিকশ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান অভ্যুত্থানকে এই নতুন গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে জমায়েত করবে। কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক সংগঠন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অন্যান্য সংগঠনগুলি এই জোট-বন্দীর অন্তঃস্থল অথবা সারবস্তু হবে। বামপন্থী দলগুলির অনুসরণকারী অন্ধ জনগণ এই জোটবন্দীর (ফ্রন্ট) অংশীদার হবে। এই জোটবন্দী (ফ্রন্ট) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে আকর্ষণ করবে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সাধারণ মানুষের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলবে।" "...কিন্তু এই জোটবন্দী কেবলমাত্র কয়েকটি সংগঠনের জোটবন্দী নয়...এটা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়ার বিরোধী প্রকৃত গণসমাবেশ জোট বা ফ্রন্ট হবে।" বামপন্থী দলগুলির সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজনীয় কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে মূলকথা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

"...মিলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে নিরলস সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেবে।" গণতান্ত্রিক জোটবন্দীর ভিত্তিভূমি হল জনগণ, কোন উপরতলার মৈত্রী নয়। সংকটের ধাক্কায় ক্রমশই অধিক থেকে অধিকতর জনসাধারণ মোহমুক্ত হতে থাকবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্র-বাদের কর্তৃত্বের অবসানের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

সম্মিলিত জোটবন্দী (ফ্রন্ট) এবং বাম পার্টি সমূহ

"বাম পার্টিগুলির সংযুক্ত জোট (ফ্রন্ট) বর্তমান অবস্থায় নতুন ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে প্রচণ্ড হাতিয়ার হবে..." "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও একক শক্তি, জনসাধারণের বামমুখী চিন্তাধারা, বামদলগুলির শক্তি প্রভৃতি এই নব একতার ভিত্তিভূমি ও আক্রমণের বর্ষাফলকের মত হবে।" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাম, যুক্ত আলোচনা ও যুক্ত সিদ্ধান্তে অবিলম্বে আসতে চায়, কিন্তু সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। "ক্রমবর্দ্ধমান গণসংগ্রাম ও তার ব্যাপ্তি গণতান্ত্রিক জোট (ফ্রন্ট) গঠন করবে। অবিরাম সংযুক্ত অভিযান, আংশিক সংগ্রামগুলি কংগ্রেস ও লীগের অঙ্গী জনগণের সঙ্গে পার্টির স্থানীয় যুক্তফ্রন্ট (জোট) প্রভৃতি এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে। প্রলিতারিয়েতের পার্টির ক্রিয়াকলাপ এবং তার পরিচালিত সংগ্রামই এই ফ্রন্টের মূল ভিত্তি। এই নূতন জোটের (ফ্রন্ট) অন্তঃস্থল (মর্মস্থল) হবে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার পরিচালিত গণসংগঠনগুলি যথা, ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা, ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনগুলি ইত্যাদি।" এরই চার পাশে বাম পার্টিগুলি এবং কংগ্রেস ও লীগের অঙ্গী মানুষ ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলবে, যার মধ্য দিয়েই এই নূতন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির অগ্রগতি সম্ভব। যেখানে সংগঠিত বামপার্টি নেই সেখানে বাম মনোভাবাপন্ন জনগণকে টানতে হবে।

কংগ্রেস লীগ ও যুক্তফ্রন্ট (জোট)

এই দুই সংগঠন কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছে। এই সংগঠন দুটির নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের থেকে দূরে থাকতে চায়, তার বিরোধিতা করতে চায়। এগুলির অনুগামী জনগণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক বিপ্লব দুর্বল হবে সুতরাং অক্লান্ত প্রচেষ্টা করতে হবে তাদের ফ্রন্টের পক্ষে জয় করতে। সুতরাং

এই সংগঠন দুটির সঙ্গে জড়িত বামপন্থী শক্তিগুলির অপরিহার্য কাজ হল কংগ্রেস ও লীগের ভিতরে এবং বাইরে অবিরাম সংগ্রাম করা, নেতৃত্বের মুখোস খোলা, ওদের অনুগামী জনগণকে মোহমুক্ত করে জোটে (ফ্রন্টে) টেনে আনা। জাতীয় কংগ্রেসের ৬০ বছরের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্মৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে নাড়া দেয়। "...এই কংগ্রেস-অনুগামী জনগণকে অবহেলা করা গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অবহেলা ও তুচ্ছ করা, তাদের সঙ্গে টানার সংগ্রাম পরিহার করা..." এর অর্থ হল এই জনগণকে কংগ্রেস নেতৃত্বের হাতে ফেলে রাখা, উপঢৌকন দেওয়া।

সোশ্যালিস্ট পার্টি

এই পার্টির মধ্যে অনেক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ ও কর্মী আছেন যারা আসলে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী যদিও তারা বলেন তারা সমাজতন্ত্রবাদী। তাদের সমাজতন্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত। অনেক গণসংগঠন তাদের সঙ্গে যুক্ত. সুতরাং বামপন্থী জোটের (ফ্রন্ট) মানেই হচ্ছে এই জনগণকে সম্মিলিত বামপন্থী কর্মকাণ্ডে টেনে আনা। তাদের নেতৃত্বের সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব, কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী ভূমিকা, তাদের তত্ত্বগত ধারণার ভ্রান্তি তুলে ধরা এক কথায় তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের মতানৈক্য সৃষ্টি করাই বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের সংগ্রামের অঙ্গীভূত কাজ।

জয় প্রকাশ, অচ্যুত পটবর্ধন, লোহিয়া প্রমুখ নেতাদের বাক্যাবলী পরিষ্কার প্রমাণ করে যে তারা তাদের পার্টির কর্মীদের বাম বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করে আসলে বুর্জোয়া সাংবিধানিক পার্টি সৃষ্টি করতে চায়। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে সাংবিধানিক পথেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। "তারা জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের (যেমন অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি) বিরুদ্ধে প্রচার করে।" তারা কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী নিজেদের বিপ্লবী-পনার ভ্রান্তি ও মোহ সৃষ্টি করে এবং তারা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটী। এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কার্যক্রম

(ক) বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রবক্তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহযোগী হবে।

(গ) প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্ট ও আইনসভায় আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব, পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এবং মৌল অধি[illegible] নৈতিক অধিকার ইত্যাদির ভিত্তিতে সংবিধান প্রস্তুতি।

(ঘ) জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—অপসরণের অধিকার সমেত। অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার।

(ঙ) সংখ্যালঘুদের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমানাধিকার, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি রক্ষা, জাত-পাত ধর্ম-জাতি মতবাদ ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি না করা।

(চ) দেশীয় রাজন্যতন্ত্রের অবসান ও তাদের রাজ্যগুলির ভারত ভুক্তি।

(ছ) উপজাতি ও তদনুরূপ পশ্চাদপদ জাতিগুলির জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার, উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি ও অর্থ সাহায্য ভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশ গঠন, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিযুক্ত হওয়ার অধিকার।

(জ) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মৈত্রী।

(ঝ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার অবসান, উৎপাদকের হাতে জমি বিতরণ, ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধি (বাঁচবার মত মজুরী), ভাগচাষী ও অন্য কৃষকদের দাবীদাওয়া পূরণ করা ইত্যাদি।

(ঞ) বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করণ।

(ট) বৃহৎ পুঁজির, বীমা কোম্পানীর, বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ ব্যবসায় জাতীয়করণ, উৎপাদনের উপর শ্রমিকের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ, বাঁচার মত মজুরী ইত্যাদি।

(ঠ) শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, মুনাফা নিয়ন্ত্রণ।

(ড) দমনমূলক আইন প্রত্যাহার।

(ঢ) আমলাতন্ত্রের অবসান।

(ণ) বাধ্যতামূলক বিনা বেতনে সার্বজনীন শিক্ষা প্রসার।

(ত) নারীগণের পূর্ণ ও সমান অধিকার প্রদান।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দেশের জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক,

পূর্বে বর্ণিত কার্যক্রমের বিকাশের মাধ্যমে ও কার্যক্রম পূর্ণতার পথে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা ও তার শিকড় প্রোথিত করা।

ট্রেড ইউনিয়নের কাজ

শিল্পোৎপাদন ক্রমেই অধোমুখী হবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকের উপর দমন ও আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে। শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে সরকারি আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে।

জাতীয় নেতারা জাতির পুনর্গঠনের কথা বলেন—এটা স্রেফ ধাপ্পাবাজী। ধনতান্ত্রিক সংকটের জন্যই উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তাদের পুনর্গঠনের মানে কেবল তাদের মুনাফা বৃদ্ধির চিন্তা, শোষণ তীব্রতর করা। উৎপাদন বৃদ্ধির আওয়াজের গূঢ় অর্থ ধনিকের হাতে শ্রমিককে সমর্পণ।

প্রত্যেক সংগ্রামের পূর্বে, মধ্যে ও শেষে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের মুখোস খুলে দিতে হবে, সংগ্রামগুলিকে বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া চলবে না। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রয়োজন।

আই এন টি ইউ সি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মালিকের দালাল। এরা শ্রমিক বিরোধী ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। শ্রমিক সংগ্রাম কালে বাঁচার মত মজুরী নীতি প্রচার করতে হবে, ধনবাদী সঙ্কটের অর্থ, শিল্প জাতীয়করণের অর্থ বোঝাতে হবে, ধর্মঘটের সমর্থনে ও সহানুভূতিতে অন্যকে টানতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীকে অন্য শোষিত শ্রেণীর নেতা ও প্রবক্তা হতে হবে।

কৃষক ফ্রান্টের কাজ

সামন্ততান্ত্রিক ও অর্দ্ধসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পরিবেশের বিরুদ্ধে ও তার অবসান, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকের হাতে ভূমি বন্টন, কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ রাখা, জমির খাজনা কমানো প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে কৃষক সমাবেশ ও আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে হবে।

ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের কাজ

শ্রমজীবী শ্রেণীর যুবছাত্রদের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে—এদের বিপ্লবে ভূমিকা আছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত ছাত্র-যুব সমাজের উপরও উপযুক্ত ও প্রভূত জোর দিতে হবে। এরা অতীতে গণ-আন্দোলনে, গণসংগ্রামে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে।

সমস্ত ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতেও এদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষা দিতে হবে।

মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে

শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের গণ আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল অবদান আছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এদের বেশী বেশী আকৃষ্ট করতে হবে। এই আন্দোলনে শুধু কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের মেয়েরা আসে তা নয়, মধ্য ও নিম্নবিত্ত সমাজ থেকে শিক্ষিকা, নার্স, কর্মচারী প্রভৃতি মেয়েরা অবস্থার চাপে উপরোক্ত বৃত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করে। মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ মেয়েরাই জনগণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে ও পরিচালনায় তাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হবে।

দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে ফ্রন্টের কাজ

সামন্ততন্ত্র ও রাজন্য প্রথার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চাই। এই প্রথার উচ্ছেদ দেশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন—তাই কোন বিরাম বা আপোষ নাই। প্রজা সম্মেলন প্রভৃতির নেতৃত্ব শুধু সংস্কারবাদী নয়, অনেকে প্রতিক্রিয়াশীলও বটে।

অস্পৃশ্য-অচ্ছুৎ ও দলিত সমাজ সম্পর্কে

সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, সামাজিক বাধা ও মর্যাদাহানির অন্যান্য-বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে, উচ্চবর্ণের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। উচ্চবর্ণজাত দরিদ্র মেহনতী মানুষের সংগ্রামে এদের অঙ্গীভূত করতে হবে, একজোটে আবদ্ধ করতে হবে, সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবিক, সামাজিক, আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন। দলিত সমাজের স্বার্থ এক, জাত-পাতের প্রশ্ন শ্রেণীসংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করে।

যুদ্ধের বিপদ প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও যুদ্ধের প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদ (মার্কিনও বিশেষত) ব্যস্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সদ্যজাত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ, বিবাদ চিরস্থায়ী করার কাজে লিপ্ত। উদ্দেশ্য এই উপমহাদেশে ক্রমবর্দ্ধমান বৈপ্লবিক চেতনা ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করা, বিপ্লবী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ও পাকিস্তানের শোষিত নির্যাতিত জনগণের সমশ্রেণী স্বার্থবোধ, গণতান্ত্রিক ও শোষক বিরোধী চেতনা ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে চায়। এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে সফল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চলেছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে

ভারত বিভিন্ন জাতি, উপজাতির দেশ। দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বার্থে প্রত্যেক জাতির সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। কমিউনিস্টদের এই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

বৈদেশিক নীতির প্রসঙ্গে

"কংগ্রেস নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই বিবাদমান বিরোধী শিবিরের মাঝে নিরপেক্ষতার মুখোস পরে বস্তুত বৃটিশ-মার্কিন জোটের তাঁবেদারী করছে বিশ্বরাজনীতিক ক্ষেত্রে···উদ্দেশ্য ভারতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থ পূরণ করা।" "নিরপেক্ষতার কোন প্রশ্নই নেই বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিতে। বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম চলছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের···"

"আংশিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিরামহীন সংগ্রাম চলেছে বিশ্বব্যাপী দুই বিরোধী জোটের মধ্যে। জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের মুখোস খুলে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সহস্র সহস্র মানুষের মোহমুক্তি ত্বরান্বিত করবে।" শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। পার্টির অভ্যন্তরে জঙ্গী শ্রমিকের স্থান করে দিতে হবে। পার্টির গণভিত্তি আরও বিস্তৃত করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে শিক্ষিত ও পূর্ণ সচেতন পার্টি গঠনের দিকে যেতে হবে।

উপরে অতি সংক্ষেপে পার্টি কংগ্রেসে উপস্থাপিত রাজনৈতিক দলিল (সারমর্ম) দেওয়া হল।

মানুষের জয়যাত্রা

স্বপ্ন থেকে বাস্তবে

সুকুমার মিত্র

যেদিন মানুষের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হল, মানুষ শোষক ও শোষিত, বিত্তশালী ও বিত্তহীন এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল সেদিন থেকেই বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও নিঃস্ব মানুষেরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করল এক নতুন সমাজের যে সমাজে অত্যাচারী নেই, যে সমাজে কেউ নিঃস্ব নয়, যে সমাজে সবাই সমান। প্রকৃত পক্ষে এটা তাদের আদিম সম-সমাজে ফিরে যাওয়ার একান্ত কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তা তো আর হবার নয়।

তবু লোককথায় ও লোকগাথায়, ছোটদের গল্প ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে শোষিত ও নির্যাতিত মানুষেরা তাদের স্বপ্নকে রূপ দিয়েছে যুগ-যুগান্ত ধরে।

আর পাছে বঞ্চিত মানুষ তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে যায় সেই ভয়ে শোষকশ্রেণীর তাবেদার পণ্ডিতরা তাঁদের বুঝিয়েছে যে, সবই কর্মফল। দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট সবই পূর্বজন্মের পাপের ফল আর ঐশ্বর্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য যারা ভোগ করছে তারা তাদের পূর্বজন্মের পুণ্যকাজের পুরস্কার পাচ্ছে। অতএব নিঃস্ব মানুষদের উচিত নীরবে তাদের কর্তব্য পালন করা, সব কিছু মেনে নেওয়া এবং সৎপথে থেকে রাজা জমিদারদের পাওনাগণ্ডা যথারীতি চুকিয়ে দেওয়া। কি ভাবে সৎপথে থাকা যাবে বা কিভাবে শোষকশ্রেণীর পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দেওয়া যাবে সে সম্বন্ধে তাঁরা ঘুণাক্ষরেও কিছু বলবেন না। তাই বঞ্চিত মানুষের দল স্বপ্ন দেখেছে, কখনও কখনও স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টাও করেছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সূচনাকালেই কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা তাঁদের আমলের সমাজের অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে সমাজকে বদলানোর কথা ভাবলেন। এঁরা নিঃস্ব মানুষের স্বপ্নকে কিছুটা বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। যা করলে সমাজ বদলাতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা কিছুটা স্পষ্ট ছিল অথবা বলা যায় যে, তাঁরা বুঝেছিলেন যে, সমাজ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার মূলে কি আছে।

এঁদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি টমাস মোরের নাম সর্বজনবিদিত। এই মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী ১৫১৬ খ্রীঃ অব্দে "ইউটোপিয়া" নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি এক কাল্পনিক সমাজের ছবি আঁকেন। 'ইউটোপিয়া' মানে 'কাল্পনিক স্থান'। একটি কল্পিত দ্বীপের সমাজব্যবস্থার যে ছবি তিনি তুলে ধরেছিলেন তা পরিস্কারভাবেই একটা শোষণ মুক্ত সমাজের ছবি। অনেক অবাস্তব ধারণা সত্বেও টমাস মোর সামাজিক সমানাধিকার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন তা নতুন চিন্তাধারার স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। নিজের স্বাধীন চিন্তাধারার জন্য টমাস মোরকে মাশুল দিতে হয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে। রাজা অষ্টম হেনরির আদেশে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয় ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এরপর যাঁরা নতুন সমাজ গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইতালীর এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোক তোমাসো কামপানেল্লা। ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁর 'সূর্যনগরী'-তে এক নতুন সমাজের কাল্পনিক ছবি আঁকা হয় যাতে সব কিছুর উপরেই সর্বসাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত।

ইংল্যাণ্ডের উইনস্ট্যান্‌লি (১৬০৯-১৬৭২) জমির ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর প্রশাসনিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত এক গ্রন্থে। আরও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় ফরাসী লেখক ডিরাদ দালায়ার (১৬৩০-১৭০০) এক উপন্যাসে। ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁর এই উপন্যাস ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়।

সামন্ততন্ত্রে যখন ভাঙ্গন ধরতে শুরু করেছে তখন নতুন সমাজ সংক্রান্ত যে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্পষ্টতর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানতঃ ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের রচিত রচনাবলীতে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জাঁ মেসলিয়ে (১৬৬৪-), সেঁবেমলি, গাব্রিয়েল বোনো দ্য মাবলি (১৭০৯-৮৪) এবং ফ্রাসোয়াঁ নোয়েল বাবুফ (১৭৬০-১৭৯৭)। জাঁ মেসলিয়ের-এর রচিত "দ্য টেস্টামেন্ট"-এ (তাঁর মৃত্যুর ৩৫ বছর পরে ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত) পরিস্কারভাবে বলা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী বৈষম্যই হল বিশ্বের দুটি অশুভ জিনিস।

সামাজিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ও ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির বিলোপ সাধনের জন্য এই গ্রন্থে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানানো হয়।

ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্য উগ্র বামপন্থী একটি অংশ ছিল। "ডিগার" বলে পরিচিত এই উগ্র বামপন্থীদের তাত্ত্বিক ছিলেন জেরার্ড উইনস্ট্যানলি (১৬০৯-৫২)। প্রতিভাবান এই মানুষটি পরিস্কার-ভাবে দেখিয়ে দেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি শুধু মানুষকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয় নি, ধনীদের অমানুষও করে তুলেছে। সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং ধর্মকে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা হয়েছে ঈশ্বরের বিধানে সৃষ্ট সমাজে দরিদ্ররা বিত্তশালীদের কাছে যাতে নতিস্বীকার করে তার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। ইতিহাস ও সমাজকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উইনস্ট্যান্‌লি সঠিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একমাত্র জমি সমস্ত মানুষের সম্পত্তিতে পরিণত হলে সত্যিকারের উন্নত সমাজ গড়ে উঠতে পারে যে সমাজে কোন ভেদাভেদ থাকবে না এবং সব মানুষই সফল মর্যাদা লাভ করবে। আর এই নতুন সমাজ গড়তে হবে দরিদ্র জনগণকে কারণ ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (চার্চ) এ ব্যাপারে কোন সমর্থন বা সহানুভূতি জানাতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে স্পষ্টতরভাবে তুলে ধরে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েও উইনস্ট্যান্‌লি নতুন সমাজ গড়ে তোলার পন্থা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়ে আবেদন জানালেন ক্রমওয়েলের কাছে—"আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি কারণ সকলের স্বাধীনতার জন্য কাজ করার ক্ষমতা যদি আপনি করতে চান তো আপনারই আছে। আমার কোন ক্ষমতা নেই।"

এ আবেদনের জবাব যে তিনি পাবেন না তা, হয়তো উইনস্ট্যান্‌লি বুঝতে পেরেছিলেন। তবু এই আবেদন জানানোর আগে তিনি গরীবদের কাছে অ-কর্ষিত সর্বসাধারণের জমি চাষ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন যে, সারা দেশ জুড়ে জমি চাষের আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তা' হয় না। তাই তিনি শেষ চেষ্টা করেন ক্রমওয়েলের কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁর শেষ গ্রন্থ "স্বাধীনতা আওনে" (১৬৫২)।

পুরাতন সমাজ যখন ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং নতুন সমাজের আগমনী ঘোষিত হচ্ছে ঠিক এমনি সময়েই ভূমিহীন সর্বহারাদের প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত

রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮)

"তারপর আবির্ভূত হলেন ২৭ বছর বয়স্ক একজন পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্কারক রূপে সৌম্য সরলতা সম্পন্ন চরিত্রের একজন মানুষ এবং যিনি সঙ্গে সঙ্গে জন্মকাল থেকেই মানুষের এমন নেতা যেমনটি ক্বচিৎ দেখা যায়।"

—এঙ্গেলস : এ্যানটি-ডুরিং

পুঁজিবাদের তখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয়নি। কলকারখানা কেবল গড়ে উঠছে, কারখানার শ্রমিক বলতে যাদের বোঝায় তারা কেবল রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতে শুরু করছে। তখনও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য। যদিও তার অবলুপ্তি আসন্ন হয়ে উঠছে।

১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সনের মধ্যে ল্যাংকাশায়ারে শক্তিচালিত তাঁতের সংখ্যা ২,৪০০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় এক লক্ষে। ল্যাংকশায়ারের হস্তচালিত তাঁতের ৮০ হাজার তাঁতী শক্তিচালিত তাঁতের তাঁতীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে যেতে থাকে, তাদের আয় সপ্তাহে ১৩ শিলিং ৬ পেনীর জায়গায় কমতে কমতে ঠেকে ৪ শিলিং ৬ পেনীতে।

বেকার ও নিঃস্ব মানুষ হাজারে হাজারে ভিড় করছে শহরে রুজি-রোজগারের আশায়। মালিকদের পোয়া বারো। তাঁরা কম মজুরীতে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটার লোক পেতে লাগলেন। চার-পাঁচ বছরের শিশু থেকে বয়স্ক লোকদের দিনে ১২ থেকে ১৫ ঘন্টা খাটিয়ে তাঁরা মুনাফা লুটতে লাগলেন দুই হাতে। সামান্য গাফিলতির জন্যে নির্মমভাবে শিশু-শ্রমিকদের চাবকে শায়েস্তা করে, বহু শিশুকে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে বাধ্য করে পুঁজিবাদের জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

এই নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিলেন রবার্ট ওয়েন। ১৭৭১ সনের ১৪ই মে নিউ টাউনে ওয়েন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চোখের সামনেই শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়।

১৭৮৫ সনে ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। সুতাকলগুলি জলশক্তির সাহায্যে চালানোর উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় এ সময় বহু লোক নিয়োগ করে সুতাকল চালানো এবং উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এডোয়ার্ড কার্ট রাইট আবিষ্কার করেন নতুন ধরনের তাঁত, যা জলশক্তির সাহায্যে চালানো যায়।

ম্যানচেস্টার তখন ইংল্যাণ্ডে উদীয়মান শিল্প-সভ্যতার পীঠস্থান। সেখানে নতুন নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি চালু করে বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছেন উদ্যোগী পুরুষেরা। একমাত্র লক্ষ্য: বিপুল মুনাফা অর্জন। প্রবল উদ্যম, কর্মকুশলতা, নির্মম শোষণ ও অর্থার্জন—এ ছাড়া ম্যানচেস্টারে আর কিছুই তখন ভাবতে পারা যেত না।

নতুন ভাবনা নিয়ে ম্যানচেস্টারে উপনীত হলেন রবার্ট ওয়েন। খুব অল্প বয়সে বার্তাবহরূপে একটি কারখানায় কাজ করতে শুরু করে ওয়েন ক্রমে ক্রমে কাপড়ের কলের একজন দক্ষ কর্মী হয়ে ওঠেন। নিজের কর্মক্ষমতার উপর ওয়েনের আস্থা ছিল গভীর। বয়স তাঁর যখন বিশ বছরও নয় তখন তিনি ম্যানচেস্টারের একটি মিলে ম্যানেজারের পদ লাভ করার চেষ্টা করেন। মিলটি ছিল ম্যানচেস্টারের অন্যতম বৃহত্তম মিল।

মিলের মালিক ওয়েনকে দেখে বললেন "তুমি তো একেবারে ছেলেমানুষ হে"। জবাবে ওয়েন বললেন, "আমার সম্পর্কে এ রকম আপত্তি চার-পাঁচ বছর আগে করা হয়েছিল কিন্তু এখন এরকম আপত্তি আমি প্রত্যাশা করি নি।" মালিক শুধোলেন "কত বয়স তোমার?" জবাব—"এই বছর মে মাসে আমার ২০ বছর পূর্ণ হবে।" মালিক—"সপ্তাহে কতবার মাতাল হও?" (এ সময় ম্যানচেস্টার ও ল্যাংকাশায়ারে প্রায় সব লোকই মদ খেত)।

প্রশ্ন শুনে ওয়েনের মুখ লাল হয়ে গেল। জবাবে তিনি বললেন, আমি জীবনে কখনও মদ খাই নি।"

বিস্মিত মালিক তখনই তাঁকে কাজে বহাল করলেন। এ সব কথা ওয়েনই লিখেছেন তাঁর আত্মচরিতে। এর কিছুকাল পরেই ওয়েনের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুতা কাটুনি বলে।

এ সব তো একটি মানুষের জীবনে সাফল্যের কাহিনী। কিন্তু এই সাফল্যের নেশায় ওয়েন মেতে ওঠেন নি। তাঁর মনে তখন জেগেছিল কল-কারখানাতে, শ্রমিকদের জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চিন্তা। তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পরিবেশই মানুষের চরিত্র গড়ে তোলে। অবশ্য পরিবেশে বাস করতে যে মানুষ বাধ্য হয় সে অবশ্য হয়ে উঠতে বাধ্য। বড় একটি মিলের ম্যানেজার পদে আসীন থাকার সময় ওয়েন আলোচনা ও পড়াশুনোর মাধ্যমে নিজের মতবাদ গড়ে তোলেন।

এরপর নিউ লানার্কে একটি বিরাট মিলের ম্যানেজার ও অন্যতম মালিক

রূপে ওয়েন যখন আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন ও আদর্শ শিল্পপতি রূপে সমাজে খ্যাতিলাভ করে বিত্তশালী শ্রেণীর আদরের পাত্র হয়ে উঠেছেন তখনই তাঁর "নিউ ভিউ অব সোসাইটি" বা সমাজ সম্পর্কে নতুন ধারণা নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ওয়েন তাঁর পরিচালিত নিউ লানার্কের সুতাকলকে একটি আদর্শ সুতাকল রূপে গড়ে তুললেন। সেখানে নিয়োজিত আড়াই হাজার শ্রমিকের জীবন-যাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। জনহিতার্থী ওয়েনের সুতাকল ও শ্রমিকদের বসতি দেখার জন্য হাজার হাজার বিত্তশালী ও সাধারণ মানুষের ভিড় হতে থাকল।

ওয়েন দেখিয়ে দিলেন যে, শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়ে, মজুরী বাড়িয়ে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব এবং এর ফলে মোটা মুনাফাও অর্জন করা যায়।

কিন্তু এত করেও ওয়েন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি পরিষ্কার-ভাবেই বললেন, "লোকগুলো (শ্রমিকরা) তো আমার দয়ার উপর নির্ভরশীল দাসমাত্র—যে কোন সময় ওরা বরখাস্ত হতে পারে।"

ওয়েন উপলব্ধি করলেন যে, নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে উৎপাদনের শক্তি এত বেড়ে গেছে যে, তার ভিত্তিতে সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু সমস্ত সম্পত্তিকে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা।

১৮১৪-১৫ সনে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটলে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে। হাজার হাজার সৈন্য বাহিনীমুক্ত হয়ে কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, দেখা দিল অভূতপূর্ব বেকার সমস্যা, জিনিসপত্রের দর পড়ে গেল, মাল জমতে লাগল গুদামে কারণ কেনার লোক নেই। বিচলিত সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে আর্তত্রাণের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের এবং পরিস্থিতির পর্যালোচনা করার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। ওয়েন এই কমিটির সদস্য মনোনীত হলেন এবং ১৮১৭ সনে তিনি তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট পেশ করলেন।

এই রিপোর্টে ১২ শত বেকারকে চাষ আবাদ করার মত জমি দিয়ে এক

একটি বসতি গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়। এর ফলে বেকাররা আর ত্রাণ সাহায্যের উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন ও অর্থার্জন করতে পারবে। এইভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সরকারকে অর্থ সংগ্রহের উপদেশ দেন। ক্রমে ওয়েন তাঁর এই ধরনের কমিউন গড়ে তোলার ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করে সমগ্র সমাজকে সাম্য ও ন্যায়ভ শাসনাধিকারের ভিত্তিতে নতুন করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এই সময় থেকে তাঁর চিন্তাধারায় কমিউনিস্ট মতবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবার্ট ওয়েন শ্রেণীভেদ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও শ্রেণী-সংগ্রামকে কখনও তিনি সমর্থন করেন নি। এই কারণে যতদিন তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাসক-শ্রেণী ও বিত্তশালীদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন ততদিন মানবদরদী ওয়েন শাসকশ্রেণী ও বিত্তশালীদের কাছে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর সাম্যবাদী মতবাদ যতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল শাসকশ্রেণী ও বিত্তশালীরা ততই তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন। তবু ওয়েন বিচলিত হলেন না। গুরুতর শাস্তির ঝুঁকি নিয়েও তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে নতুন সমাজ গঠনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল তিনটি—পাপ : ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম এবং বুর্জোয়া বিবাহ-পদ্ধতি।

রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রেখেও ওয়েন সরকার ও বিত্তশালী শ্রেণীর বিষনজরে পড়লেন। প্রচারের মাধ্যমে সকলকে বুঝিয়ে নতুন সমাজ গঠনের ব্যর্থ চেষ্টায় রত হলেন ওয়েন।

১৮১৯ থেকে ১৮২২ সন পর্যন্ত তিনি একটি আদর্শ পল্লী-সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পিতা কেন্টের ডিউক তাঁকে সাহায্য করলেও তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন তিনি নিজের সহায়-সম্পদের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ("নিউ হার্মনি") নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। আশা ছিল আমেরিকার নতুন গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং সুলভে প্রচুর জমি সংগ্রহ করার সুযোগ গ্রহণ করে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হল না। কিছুকাল পরে উপনিবেশের অবলুপ্তি ঘটল। কিন্তু ওয়েন সব হারিয়েও তাঁর সঙ্কল্প থেকে চ্যুত হলেন না। তাঁর মতবাদ নির্ভুল এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় অটুট রইল।

এ সময় ইংল্যাণ্ডে জমিকশ্রেণীর মধ্যে নতুন চেতনা জেগে উঠেছিল।

রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে শ্রমিকশ্রেণী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল চার্টিস্ট আন্দোলনের প্রবক্তা জেমস ও' ব্রায়েন "পুওর ম্যান্‌স গার্ডিয়ান" পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও প্রশাসন পদ্ধতির জন্য কোন ব্যক্তির জয়গান গাওয়া বা কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা ভুল আর এই ভুলই হল মানুষের উন্নতির পথে একটা সবচেয়ে বড় বাধা। আসলে এ সবই একটা সমগ্র শ্রেণীর কাজ এবং ব্যক্তি এই শ্রেণীর হাতিয়ার মাত্র।

ওয়েন এই তত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছিয়েও এ তত্ত্বকে গ্রহণ করেন নি এবং সকলের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তবু শ্রমিক আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করল তখন তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতে থাকেন। বিত্তশালীদের দ্বারা যা করা সম্ভব হয় নি, শ্রমিকদের দ্বারা তাঁর সেই কাজ সাধিত হবে এই বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ওয়েনের আস্থা না থাকলেও তিনি ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের (গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনসোলিডেটেড ট্রেডস ইউনিয়ন) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনার উপর শ্রমিকদের কতটা আস্থা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ওয়েনের চিন্তাধারা ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তী যুগে এর ফলেই ফ্যাবিয়ান সোস্যালিস্ট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া যাবে এ কথাই ফ্যাবিয়ান সোস্যালিস্টরা প্রচার করেন। সমবায় আন্দোলনও গড়ে ওঠে ওয়েনের মতবাদকে অনুসরণ করে।

তাঁর সামাজিক শান্তি বা শ্রেণী-মৈত্রীর মতবাদ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি অনীহা সত্ত্বেও রবার্ট ওয়েন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রচারে, সমবায় আন্দোলন সংগঠনে এবং বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনে এক অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজ্‌ম্‌-এর পূর্বসূরীদের মধ্যে তিনি এক বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

সাহিত্যে সেদিনকার ইংল্যাণ্ডের ছবি

ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর হাতে তুলে দিল বিপুল ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যকে দেশের মানুষের ঐশ্বর্যরূপে বর্ণনা করে কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদ দেখিয়ে দিলেন যে, লোকের আয় বাড়ছে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। কিন্তু সরকারী রিপোর্ট, পরিসংখ্যান ইত্যাদির ভিত্তিতে এঙ্গেলস ও কার্ল মার্কস থেকে আরম্ভ করে অনেকেই প্রমাণ করেছিলেন যে, স্বল্পসংখ্যক মানুষ বিত্তশালী হয়ে উঠলেও শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের চরম দুর্গতি ঘটেছে। কোনরকমে বেঁচে থাকার মত মজুরী, চরম দারিদ্র্য, নোংরা বস্তিগুলির মধ্যে মাথা গুঁজে থাকা শ্রমিকদের জীবনকে কদর্য ও কলুষিত করে তুলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রঙীন ও সুন্দর করে দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংঘর্ষের যুগেই সবচেয়ে প্রবলভাবে করা হয়েছে। মোটা মোটা কেতাব নিয়ে এবং এঙ্গেলসএর ছোটখাট অনেক ভুল তথ্যের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেও প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইংল্যাণ্ডে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছিল।

নিঃস্ব, জীবিকাহীন মানুষ বাঁচার তাগিদেই বাধ্য হয়ে কারখানার কাজে যোগ দিয়েছিল, তাদের পুরাতন ও চিরাচরিত গার্হস্থ্য জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে তাদের অমানুষ করে তুলেছিল সেদিন এই অবস্থা হয়তো অনিবার্য ছিল, কিন্তু তা বলে উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণীর এই দুর্দশা ও দুঃখকষ্টকে অস্বীকার করা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যাণ্ডের জীবনের ছবি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু চার্লস ডিকেন্সের নয়, স্বল্পখ্যাত এবং বর্তমানে বিস্মৃত কোন কোন লেখকের উপন্যাসেও। এই প্রসঙ্গে ১৮৩১ সনে প্রকাশিত টমাস নিকরের উপন্যাস "ক্রোসে ক্যাসল্" (Crotchel Castle) উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে বর্ণিত একটি ঘটনা নিম্নরূপ :

চেনমেল হলে বিত্তশালীদের একটি সভা চলছে। এমন সময় দরজার সামনে লোক ভিড় করে দাঁড়াল। জানা গেল "ক্যাপটেন সুইং" এসেছেন এবং ক্ষেতমজুররা বিদ্রোহ করেছে। রেভারেণ্ড ডঃ কোলিওট একজন বুদ্ধিমান টেরি। তিনি বলে উঠলেন : পুঁজিপতিরা যে প্রগতি নিয়ে গর্ব করে এই তো

স্কট[৫] অর্থনীতিবিদ মিঃ ম্যাকক্রোয়েডি যিনি পুঁজিবাদের বিশুদ্ধ তত্ত্বের প্রবক্তা তিনি বললেন : অসম্ভব। কৃষক সংগ্রাম আর "মনের অগ্রগতিকে" কি করে একত্র করা যায় ?

রোমান্টিক রক্ষণশীল চেনমেল বললেন : অন্ধকার যুগের মত এখনও কারণটা একই : "নৈরাশ্যক্লিষ্ট দারিদ্র্য।"

এবার ডঃ কোলিওট সারকথাটি তুলে ধরে বললেন : "মিঃ ম্যাকক্রোয়েডি এটা হল রাষ্ট্রের জাহাজ পরিচালন ব্যবস্থার স্বাভাবিক ফল। আপনাদের বিজ্ঞান (বুর্জোয়া অর্থনীতি) তো এই ব্যবস্থা সমর্থন করে। জাহাজীদের ভাগ কমানো ও অফিসারদের বেতন দ্বিগুণ করা বিপন্ন জাহাজে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার একটি সুনিশ্চিত উপায়। মিঃ ম্যাকক্রোয়েডি এই আলোচনার শেষাংশে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আসল চেহারা উদঘাটিত হয়েছে।

ডঃ কোলিওট বললেন : এখন কার্যকারণ সম্পর্ক আলোচনার সময় আমাদের নেই। আসুন আমরা শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত হই।"

এরপরেই ভদ্রমহোদয়গণ বিচার বিশ্লেষণ বন্ধ করে হাতিয়ার হাতে বাইরে ছুটে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে হতভাগা চাষীদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

শ্রেণীসংগ্রামের দাবিটি এইভাবেই উল্লিখিত উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।

সুন্দর পৃথিবীতে নিউক্লিয়ারের করাল ছায়া এবং আমাদের কর্তব্য

ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস

মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে কিছুটা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু সবটাই আয়ত্তাধীনে আনতে পারেনি। অংশ যেমন তার সম্পূর্ণাংগের সমানও নয় বড়ও নয়, মনে হয় বিশ্বজগতকেও মানুষ সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে হয়ত পারবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে সব ভেদাভেদ অবলুপ্ত। ধর্ম, ভাষা, জাতি, বর্ণ, সংস্কৃতি সব ভেদাভেদ অবান্তর। প্রাকৃতিক ভয়াল ধ্বংসলীলায় পৃথিবীতে বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, ভবিষ্যতেও হতে পারবে। সেখানে অবশ্য অন্যভাব দেখা গেছে : If winter comes can spring be far behind ! মানুষ এটা জেনেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে অনেকখানি প্রতিরোধ করেছে ; প্রাকৃতিক শক্তিকে বিবিধ কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে সুন্দরতর করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাকৃতিক অফুরন্ত সম্পদকে সে কাজে লাগাচ্ছে—এটাকে আমরা বলছি বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। সৃষ্টির আদি থেকে জীবকুল বিশেষত মানবসমাজ এ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রকৃতিকে সে ভয় করেছে, ভক্তি করেছে, পূজা করেছে। আবার তার বিধ্বংসী শক্তিকে অতিক্রম করে চলে এসেছে। প্রকৃতির বিরূপতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম—স্বার্থ-বোধ, জাগ্রত ও প্রবল হওয়ার সাথে সেই সংগ্রাম ভিন্নখাতমুখী হল। প্রকৃতি জয়ে মানুষ সফল হল বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বার্থবোধ এত প্রবল এবং স্বৈরশক্তি এমন অদম্য হল যাতে তা আত্মহননের দিকে পা বাড়ালো। অন্যায়-অবিচার, শাসন-অত্যাচার, অমানবিক ব্যবহার রোধ করার জন্য যুগযুগের মহাপুরুষের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। আদি যুগে নিজেকে রক্ষা, পরে গোষ্ঠীকে রক্ষার প্রচেষ্টা ছিল ; সভ্যতার যুগে এসে নীতি বা ধর্ম মান্য করার কথা এল। প্রজাকে শাসন ও পালন করার জন্য রাজাদের সাথে নিয়মশৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুশাসনাদি মান্য করাবার জন্য একে একে মহাপুরুষ এলেন শত শত—তাঁরা গেলেনও। ধর্ম সংস্থাপনার্থায় তাঁরা সাময়িক সফল

হলেন। আবার যেমনকার তেমন। ধর্মকেও কলুষিত করল স্বার্থান্বেষী শোষকশ্রেণী। ধর্মের নামে তারা অকর্ম-কুকর্ম পাপকর্ম করতে কুণ্ঠিত হল না। ধর্ম চলে গেল গৌণ পর্যায়ে, মুখ্য পর্যায়ে এল রাজনীতি। রাজনৈতিকভাবে শুধু নিজের কোলে ঝোলটান' লোকদের, যারা অপরের শ্রমের ওপর বেপরোয়া করে মুনাফা বৃদ্ধি করে পাহাড় জমাতে লাগল, তাদের মোকাবিলা করার প্রয়োজন দেখা দিল। অর্থ-ভোগ্যপণ্য নিয়ে স্বার্থ, তাই শাস্ত্রীয় ভাষায় অর্থ-নীতিই হল মূল সমস্যা। রাজনীতিগতভাবে সেই অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করাই একমাত্র পথ। আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশসাধন মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা হতে পারে কিন্তু যেখানে বাঁচার প্রশ্ন নিজের রক্ষার প্রশ্ন যাকে বলা হয় struggle for survival, সেখানে অর্থাৎ বাঁচার প্রশ্নে জীবিকা অর্জনের কথা আসে। সেই জীবিকায় যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে সেখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান একেবারেই ব্যর্থ, সেখানে শেষ কথায় রক্তারক্তি ব্যাপার আসে। রক্তক্ষয় যথাসাধ্য না করার প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক কৌশল সফল না হলে বিপ্লবাত্মক রক্তক্ষয় হয়ে থাকে। আগে যে পন্থা ধর্মপন্থা নামে চিহ্নিত ছিল বা অধ্যাত্ম-সাধনার বিষয় বলে পরিগণিত হত, প্রগতির আজকের ধাপে তা রাজনীতি বা রাজনৈতিক সাধনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা। এতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার কথা; কিন্তু মানুষের ওপর মানুষ জোঁকসম শোষকের ভূমিকায় আত্মহননের মুখে অগ্রসর হওয়ায়, প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে নয়, মানুষের শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে আমাদেরকে লিপ্ত হতে হচ্ছে। আমাদের এই সংগ্রাম গণ আন্দোলনের মাধ্যমে করতে করতে হয়ত বা শেষপর্যন্ত সর্বাত্মক বিপ্লবের রূপ পাচ্ছে। ধর্মসাধনা, শিল্পসাধনা, শরীর-সাধনা, অধ্যাত্মসাধনা প্রভৃতি সবই সুরক্ষিত এবং সুন্দর থাকবে যদি মনুষ্য-সমাজের মনুষ্য-শত্রু থেকে আমরা মুক্ত থাকি। ওরা পিশাচ অপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং ওদের এমন অমানবিক কাজ ঘৃণার্হ। কারণ ওরা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত। এমন অবস্থায় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শান্তিপ্রিয় সকলকে শান্তি পতাকার নীচে একত্রিত না হয়ে উপায় নেই।

রাজনীতিবিদরা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া চাই। সাড়া না দেওয়ার কি

অর্থ হতে পারে। নিরপেক্ষতা রক্ষা করা কি উচিত। এখানে পরিষ্কার দুটি পক্ষ দেখা যাচ্ছে—ঠিক পন্থা এবং বেঠিক পন্থা। দুটোই ঠিক হতে পারে না। তাহলে নিরপেক্ষতার অর্থ দাঁড়ায় ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত মানবশত্রু-শিবিরে পরোক্ষভাবে যোগদান করা। সৃষ্টিকে রক্ষার অন্যতম প্রহরী কারা? শ্রমিক-কৃষক, নানাবিধ মঙ্গলজনক মেহনতে নিযুক্ত শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষকসমাজ প্রভৃতি। মেহনতী সমাজের সংগ্রামী জনগণকে নেতৃত্ব দেন শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী সমাজে সৃষ্ট সংগঠনগুলি। পৃথিবীতে শোষকশ্রেণীর দুর্বুদ্ধির ফলে যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাতে মানব সমাজ কেন, পৃথিবীর প্রাণীকুলের আর কোন সমস্যাই থাকবে না। গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তি ও প্রগতিকামী, সমৃদ্ধি লাভেচ্ছু বহুদেশের গণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্প্রতি মস্কোতে যে সব কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা জগদ্‌বাসীর নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে সঠিকভাবে ঘোষিত হয়েছে যে—নিউক্লিয়ার যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শেষ সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় বসতে একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। নিউক্লিয়ার প্রলয়ের পর বাইবেলে বর্ণিত দ্বিতীয় কোন 'নোয়ারপোত'ও থাকবে না বা, ব্যাপারগুলি আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যাবে না।

এমত অবস্থায় আমরা যাঁরা বেঁচে আছি এবং নিউক্লিয়ার ধ্বংসের করাল ছায়া দেখতে পাচ্ছি তারা নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকতে পারি না। একথা কি এখনো বোঝার সময় আসে নি? কিন্তু আশ্চর্য! এমন মনে করার মতন কিছু লোক এখনো পৃথিবীতে আছে। তাই আমরা যাঁরা সচেতন, তারা বুঝতে পারছি হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যাচ্ছে না। তাহলে করণীয় কি? করণীয় হল—হয় যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে রাজনৈতিক মানসিকতা নিয়ে ঐ মারণাস্ত্র প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে, নইলে পৃথিবী থেকে সভ্যতা ও জীবন লুপ্ত হয়ে যাবে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে এইসব আলোচনাকে কোনমতেই হাল্কাভাবে ধরলে চলবে না। মানুষের সমস্ত ব্যাপারে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে, মানবজাতি তথা জীবকুলের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের মধ্যে এখানকার প্রধান বিরোধটির কথা আমাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না এবং সময় থাকতেই শান্তির অনুকূলে বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্য সর্বোতোভাবে সচেষ্ট হতে

হবে। স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া আধুনিক বিশ্বের সুপ্ত বিপদগুলি কাটিয়ে ওঠার শক্তি ও সাহস আমরা সংগ্রহ করতে পারব কি না, তারই ওপর নির্ভর করছে মানবজাতির টিকে থাকার প্রশ্নটিও।

আমরা আজ যেভাবে চিন্তা করছি তা ভুঁইফোড় কিছু না। অন্যান্য সেসব কথাবার্তার আভাস ও জল্পনা-কল্পনা পশ্চিমী দুনিয়ায় শোনা যাচ্ছে প্রায় দুশো বছর আগে থেকে। সমাজতান্ত্রিক পথের সন্ধান পাবার পর থেকে কোন কোন স্বৈরতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক দেশ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছে, আবার কোন কোন দেশ সেরূপ হয় নি। শেষোক্ত দেশ সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা গড়ে তোলার সময় অনেক আগেই এসে গেছে। হিরোসিমা নাগাসাকি দুঃস্বপ্নের দিনগুলির কথা আমরা ভুলতেই পারছি না--এমনকি তারাও পারছে না। তারা বুঝছে না যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ এই নীতির রূপকারদিগকেও রেহাই দেবে না—পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। যে বৈজ্ঞানিক সমুন্নতির দ্বারা মানুষের অমরত্বকে আরো সুনিশ্চিত করা যায় তা আজ মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করেছে।

আমরা এটা কেন বুঝব না যে বিশেষ কোন একটি দেশের কতিপয় ব্যক্তি এবং তার মুষ্টিমেয় হঠকারী নেতা সমগ্র মানবজাতির ওপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ আরোপ করতে পারেনা। সে মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারী করার অধিকার আমরা মানব কেন? আমাদেরকে বিচার করার অধিকার তাকে কে দিল? কি বিচারে আমরা তাদের কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধী? জোর করে নিউক্লিয়ার গিলোটিন কারো ওপর চাপিয়ে দিলে তা কি মেনে নেওয়া যায়—নাকি তা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হয়!

মানবসমাজকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গণতন্ত্রপ্রিয় সকল দেশ নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিলোপের কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে অগ্রগামী সোভিয়েত গণতন্ত্র ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে মানবসভ্যতা বাঁচানো দিবস হিসাবে ঐ তারিখটি ঘোষণা করেছেন। তাঁরা দিল্লী ঘোষণা পত্রেও স্বাক্ষর করেছেন। দার্শনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত এবং অহিংস বিশ্ব নির্মাণের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তাই বলে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না। প্রত্যেককেই শুরু করতে হবে নিজেদেরকে দিয়ে। নিজের সমাজের ব্যাপারে আত্মসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া

আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। পরস্পরের সহযোগিতা, পরস্পরকে ভালভাবে জানা এবং সাধারণ সমস্যাগুলির মীমাংসার মাধ্যমে আস্থা গড়ে তোলা দরকার। তাই বলে আস্থা গড়ে না তুললে কোন কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে না—একথা ঠিক নয়। অভিন্ন কর্মপ্রয়াস থেকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়—তা সংহত ও বিকশিত হয়।

নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সভ্যতাকে গুণগতভাবে এক নতুন স্তরে উন্নীত করা শুরু হয়েছে। মিখাইল গোরবাচেভ জোর দিয়ে বলেছেন যে মানবজাতি শীঘ্রই নিউক্লিয়ার অস্ত্রশৃঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এ বিষয়ে নিশ্চিত। এ বক্তব্য শান্তিকামী সকল মানুষেরই। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে হিংসা-পরায়ণ নয়। মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি আছে এবং তাকে ধ্বংস করা যায় না—একথাও ভুল। বাঁচার তাগিদে মানুষকে লড়াই করতে হয় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, লড়াই করতে হয় যারা কৃষির ওপর হস্তক্ষেপ করে তাদের বিরুদ্ধে। অন্যথায় যুদ্ধপ্রবৃত্তি জাগ্রত হবে কেন? এমন দেশ কি আছে যেখানে আক্রান্ত না হওয়ার কারণেও যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে! ভারতবর্ষের কথাই বলি। বৃটিশ উপনিবেশের বর্বরতা, শাসন, শোষণ না থাকলে বিভিন্ন আন্দোলন, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হওয়ার প্রয়োজন হত কি! বৃটিশ শক্তি অপসারিত হলে ভারত তো শান্তিতেই থাকত, যদি চীন ও পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ না করত। যুদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে মেনে নিলে তো আধুনিক মারনাস্ত্র উদ্ভাবিত হওয়াকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হয়। তাহলে নিউক্লিয়ার যুদ্ধকেও মেনে নিতে হয়। তবে তো গণমৃত্যুকেও মেনে নিতে হয়। যারা এসব বলে তারা আত্মহত্যা করতে উদ্যত। তারা কেন পরের মৃত্যু-পরোয়ানা জারী করবে? এমন লোকদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না—তাদেরকে মরতেও দেওয়া যায় না। কারণ তারা আরো অগণ্য নিরীহ লোকদের নিয়ে মরতে চায়।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভাতে মিখাইল গোরবাচেভ ও প্রেসিডেন্ট রেগন এক যুক্ত অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেছিলেন—"মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিবারণ করা হবে ও পৃথিবীতে এর অবসান ঘটানো হবে, নিউক্লিয়ার অস্ত্রও সীমিত ও হ্রাস করা হবে এবং রণনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়ানো হবে।" অথচ আজ আমরা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছি যে তা অবসানের চেষ্টায় ব্যাপৃত না হয়ে উপায়

নেই। এরই ফলে কিছু কিছু দেশ নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবন ও বিকাশের অধিকার জোর করে নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে; যার ফলে তাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ নিজেদেরকে বিপদাপন্ন বলে মনে করছে। এতে করে সমস্যা আরো জটিল হচ্ছে। অন্যান্য দেশ তাই নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কার ও বিকাশে বাধাতামূলক পদক্ষেপ নিতে চিন্তাভাবনা করছে। এটা জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যাও বটে। আমার ক্ষমতা আছে—আমি মহাকাশে অস্ত্রশস্ত্র স্থাপন করলাম। ফলে যুদ্ধের উত্তেজনায় পরোক্ষভাবে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে নাকি? বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত করার সময় এসেছে।

পৃথিবীতে আজ বহু রাষ্ট্র হয়েছে। তাদের নিজেদের অনন্য ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, জীবনধারা রয়েছে। প্রতি জাতি ও দেশের রয়েছে নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ, নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই বাস্তব সত্য তথাকার জনগণ নিজেদের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা নিজেদের সমাজ বিকাশের নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছে। কয়েক দশক আগে তাদের সম্বন্ধে এমনটি ভাববার প্রয়োজন হয়নি। আজ তাই নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে। কোন কোন রাজনীতিবিদের হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি অর্জনের আগেই এই অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই তারা অনেকেই নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ক্ষেত্রে পুরনো ধারণা আকড়ে রয়েছে। ঐ সব পিছিয়ে পড়া লোকদের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। আঞ্চলিক সংঘাত ও ঘৃণাকে তারা উস্কে দিচ্ছে। দারিদ্রপীড়িত দেশগুলি কোথায় বুভুক্ষা থেকে মুক্তি পাবে, তা না ক্রমবর্ধমান অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অপচয়ের দিকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এসব রুখতে হবে। সংঘাত বন্ধ করা বা সংঘাতের সূত্রপাত না হওয়ার জন্য মীমাংসায় উপনীত হওয়া একটা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। উপরোক্ত কারণেই তো আধুনিককালে সন্ত্রাসবাদ এক মহাপাপ বা অভিশাপ নিয়ে জগতে উপস্থিত হয়েছে।

ধনী ব্যক্তি বা ধনী দেশ গরীবদের লুণ্ঠনের জন্য কত যে ফাঁদ পেতেছে তার ইয়ত্তা নেই। দেশ জয়ের অভিযান আজ অচল। উপনিবেশ স্থাপনের যুগ অতীত হয়েছে। উপনিবেশবাদের শেষাংশটুকু মুছে যেতে আর দেরী নেই। গোল টাকা গোল পৃথিবীতে আজ বড়ই গোল পাকিয়ে তুলেছে। অবশ্য অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে শোষণ করার নতুন নতুন কৌশল

গবেষকরা ক্যাপিটালিস্টদের সামনে তুলে ধরেছে। ক্যাপিটালিস্টরা তা কাজে লাগাতে খুবই তৎপর। পাশাপাশি দরিদ্র এবং শোষিত সাধারণ গণমানস সে রহস্য উদ্ঘাটন করেছে,—ধরে ফেলেছে তাদের কিকির। একথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ দেশ আজ মহাজন-রাষ্ট্রের কাছে মোটা টাকা ঋণ নিয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। এতে দিনে দিনে অসন্তোষ বাড়ছে—যার বিস্ফোরণ একদিন ঘটবেই—তার জন্যই কি নিউ-ক্লিয়ার অস্ত্রধারীরা প্রস্তুত হচ্ছে? আমাদের বিশ্বাস সেইটাই ঠিক। হে অর্বাচীন মারণাস্ত্রধারীরা! তোমরা কি জান না যে নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই নির্বংশ হয়ে যাবে, গোটা পৃথিবীটা শ্মশানে পরিণত হবে—যেখানে শব দাহ করার লোকও থাকবে না। এত ঐশ্বর্য এত বিত্ত হারাবার ভয় কি তোমাদের নেই? আমরা সর্বহারার সাথী সর্বহারা; আমাদের হারাবার কিছু নেই,—আমাদের কোন ভয়ও নেই, তোমাদের প্রতি কোন ভরসাও নেই। আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, শান্তি-কামী আমাদের জ্ঞানোন্মেষ হোক, আমরা সাবধান হই, আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতার প্রসার ঘটুক! অন্যান্য সকলের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে মানবিক করে তথ্য আদান-প্রদান, মানবিক যোগাযোগ, পেশাগত বিনিময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে দৃঢ়পদক্ষেপে আমরা কাজ করি। আমাদের মধ্যকার অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা জেনে তাকে মূল্য দিই—তাদের সম্বন্ধে যেন কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষন করা না হয়। আমরা যেন স্মরণ রাখি যে, নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধলে সব সমস্যাই লোপ পাবে, আলোচনায় বসার জন্য একজনও টিকে থাকবে না,—এমন কি গাছের গুঁড়ি বা পাথরের খণ্ডটি পর্যন্ত থাকবে না যার ওপর বসে আলোচনা করা হবে।

তথ্য সংগ্রহে কৃতজ্ঞতা:—আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের স্বার্থে, মানবসমাজের অস্তিত্বের স্বার্থে', মিখাইল গোরবাচেভের ভাষণ।।

'পেরেস্‌ত্রোইকা' কি ও কেন ?

পেরেস্‌ত্রোইকা ও নতুন চিন্তা-ভাবনা : গোরবাচেভ লিখিত নতুন বই প্রসঙ্গে

'এই বইটি লেখার সময়ে, সরাসরি জনগণকে সম্বোধন করে বক্তব্য উপস্থিত করাই ছিল আমার ইচ্ছা···আমি ভালো করেই বুঝি যে সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন না। বাস্তবিকপক্ষে, আমি বিভিন্ন বিষয়ে অন্যদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হব না। এটাই পারস্পরিক সংলাপকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। এবং এই বইটি হল সেই ক্ষেত্রে আমার দান।' সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচেভ এইভাবেই শুরু করেছেন তাঁর 'পেরেস্‌ত্রোইকা' : দেশের ও বিশ্বের জন্যে নূতন চিন্তা-ভাবনা' বইটি (মস্কো, পলিতিজ্‌দাৎ পাবলিশার্স, ১৯৮৭, ২৭১ পৃ)।

'পেরেস্‌ত্রোইকা' জিনিসটা কি ? কিভাবে এটার পরিকল্পনা করা হয়েছে, এবং কেন ? এটা কি কি বাতিল করে দিয়েছে আর কি কি সৃষ্টি করেছে ? এটা কি সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে মোহভঙ্গকে প্রতিফলিত করেছে ? এটা কি সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে যাওয়াটাকে চিহ্নিত করেছে, না কি, তার, ক্ষয়প্রাপ্তিকে প্রকট করে তুলেছে ? ১৯১৭ সালটি কি নিজেই একটি ভুল ? তারপর যে ৭০ বছর কেটে গেছে, সেই সময়টা জুড়ে আমরা কি ভ্রান্ত লক্ষ্যে চলেছি ? নূতন রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাটা কি ?

গ্রন্থকার দেশে এবং বিদেশে তাঁর সফরকালে এইরকম সব অসংখ্য প্রশ্ন শুনেছেন। হাজার হাজার চিঠি পেয়েছেন যাতে এইসব প্রশ্ন করা হয়েছে··· এবং তিনি এইসব সরাসরি প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিয়েছেন।

তবু, এই বইটা কোনো নির্দেশনামা নয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দর্ভ অথবা প্রচারমূলক প্রবন্ধমালা নয়। তার বদলে, এ হল—পুনর্গঠনমূলক প্রয়াস, আমাদের সমাজের সম্মুখবর্তী সমস্যাগুলি, পরিবর্তনগুলির পরিধি এবং আমাদের কালের জটিলতা আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অননুকরণীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে—আলোচনা ও সে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা।

৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধেই এটা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে যে আমাদের দেশ তার উন্নয়নের গতি ঢিলে করে দিতে শুরু করেছে—এটা উল্লেখ করে, গ্রন্থকার সমকালীন জটিলতাগুলি নিয়ে কড়াকড়ি না করে আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হারে হোঁচট খেতে থাকে, একের পর এক বাধা জমে উঠতে থাকে এবং অমীমাংসিত সমস্যাবলী বেড়ে উঠতে শুরু করে। '৮০-র দশক শুরু হবার সময়েই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এমন একটা স্তরে নেমে আসে যে কার্যত সেটা আমাদের অর্থনৈতিক বদ্ধ অবস্থার খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। মনে হচ্ছিল, মিখাইল গোরবাচেভ কথাটা যেভাবে বলেছেন, 'একটি শক্তিশালী মেশিনের বিশাল ফ্লাইহুইলটা ঘুরছে বটে, কিন্তু কাজের জায়গাগুলিতে তার উত্তরণটা পিছলে যাচ্ছে…'

সেই সঙ্গেই, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যেটা আদৌ খাপ খায় না, সেই বদ্ধগতি অন্যান্য ব্যাপারও সমাজে আবির্ভূত হয়েছিল। দৈনন্দিন বাস্তবতার জগৎ আর লোক-দেখানো কৃত্রিম সমৃদ্ধির জগতের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে চলছিল। কথা আর কাজের মধ্যে অতল গহ্বর সমাজিক নিষ্ক্রিয়তার এবং ঘোষিত স্লোগানগুলির প্রতি অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছিল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। মতাদর্শগত ও নৈতিক মূল্যগুলি নিঃশব্দে আর আপাতভাবে সবার অলক্ষ্যে ক্ষয় পেতে শুরু করেছিল।

গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে লিখেছেন নিতান্তই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দর্শক হিসাবে নয়। তিনি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অতীত সম্বন্ধে রায় দেবার কোনো চেষ্টা করেন নি। সেই সময়ে তিনিও জনসাধারণের মধ্যে বাস করেছেন, তাদের সঙ্গেই কাজ করেছেন।

এই বইটির আরও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে: এটা একটা খুবই ব্যক্তিগত রচনা। এটাও বর্তমান কালের একটা লক্ষণ। কারণ, লোকে এখন জানতে চায়—কি বলা হয়েছে, শুধু তাই নয়—কে তা বলেছেন, সেটাও …এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারটা ক্রমাগত আরো বেশি করে তাৎপর্য অর্জন করছে…

তিনি বর্ণনা দিয়েছেন, কিভাবে তিনি ৪০ এর দশকের শেষের দিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরগুলিতে সফর করতে করতে মস্কোয় এসে পৌঁছান। সেখানে তিনি পড়াশোনা করতে এসেছিলেন। তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরগুলি, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় আর আলোচনার

কথা এবং পরবর্তী বছরগুলিতে তাদের লেখা চিঠিপত্রের কথা। ১৯৮৩ সালে লেনিনের ১১৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন লেখার পরে, তাঁর নিজের চিন্তা-ভাবনা আর অনুভূতিগুলি যে তাঁর পার্টি-কমরেডদের এবং আরও অনেকের চিন্তা-ভাবনা আর অনুভূতিগুলির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, সে কথা উপলব্ধি করে তাঁর কি মনে হয়েছিল, সে কথা তিনি স্মরণ করেছেন। সেই প্রতিবেদনটির পরে কেউ কেউ তাঁর প্রতি ভ্রূকুটি করতে শুরু করেছিল। 'কিছু লোক আমার প্রতিবেদনটি পছন্দ করে'নি, লিখেছেন তিনি, 'সেটা যতটা আশাবাদী হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয় নি।'

মিখাইল গোরবাচেভ লিখেছেন: কেন্দ্রীয় সংস্থায় আর জেলাগুলিতে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পার্টি-কর্মকর্তারা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করেন এবং ১৯৮৫-র এপ্রিল মাসের বহু আগেই পার্টির ও সরকারের নেতাদের একটি গ্রুপ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে গভীরভাবে তলিয়ে বিশ্লেষণ করার কাজে রত হন। তাঁরা বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ-গুলিকে—জাতির সামাজিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে যা-কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই সবকিছুই—কাজে লাগিয়েছিলেন। ওই বিশ্লেষণটি এবং গঠনমূলক পরিকল্পনার সেই অন্তঃসত্তাবটি পরবর্তীকালে 'পেরেস্‌ত্রোইকা'র ধারণাটির ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল। সুতরাং এটা কোনো স্বতস্ফূর্ত ব্যাপার নয়। এটা হল একটা সুচিন্তিত ও সুসমঞ্জস নীতি।

অক্টোবর বিপ্লব একটা ভুল কি-না এবং পুরো এই ৭০ বছর ধরে আমরা ভ্রান্ত পথে চলেছি কি-না—গ্রন্থকার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। গত সাত দশক ধরে আমরা—যেখানে ছিল পশ্চাৎপদ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক রুশ সাম্রাজ্য, সেই স্থানটিতে—গড়ে তুলেছি বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র, বিপুল অর্থনৈতিক ও মেধাগত সম্ভাবনা আর অতি উচ্চমানের সংস্কৃতি সম্পন্ন একটি দেশ। ১০০-টিরও বেশি জাতি-অধিজাতির এ হল এক অনন্য জাতি-সমিতি, এমন একটি দেশ যেখানে ২৮ কোটি লোক পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-ষষ্ঠাংশের সমান ভূখণ্ডের উপরে বসবাস করে এবং তাদের জন্যে পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে তোলা হয়েছে।

একমাত্র অক্টোবর বিপ্লবই এই অপূর্ব অগ্রগতিকে সম্ভব করে তুলতে পেরেছে। ইতিহাসের সবচেয়ে, অভ্রান্ত ও বস্তুমুখী বিশ্লেষণ, বলছেন গ্রন্থকার,

এই এক ও অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তের দিকেই চালিত করে যে 'মানবজাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন যে-স্থানের অধিকারী, সমাজতন্ত্রই তাকে সেই স্থানে এনে বসিয়েছে।'

অবধারিতভাবেই, অক্টোবর বিপ্লব আর তার আদর্শগুলি সেই সর্বোচ্চ মান সৃষ্টি করেছে যা, আমাদের পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি আর সদ্দিল গতি সত্ত্বেও, কোটি কোটি মানুষের জীবন ও চেতনার উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। 'আমাদের মহাবিপ্লবের জীবনদায়ীঘাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই ব্যাপারটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে আমাদের পার্টির ও জনসাধারণের পক্ষে বড় বেশি শক্তিশালী। এটাই তার সুফলগুলিকে ব্যর্থ করে দেবে বলে আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল', লিখেছেন মিখাইল গোরবাচেভ।

সেইজন্যেই অক্টোবর বিপ্লব এখনও হয়ে আছে 'পেরেস্‌ত্রোইকা'র এক শক্তিশালী উৎস এবং এখন যে 'পেরেস্‌ত্রোইকা' চলছে, তা হল তার সারমর্মের দিক থেকে বলশেভিক দুঃসাহস আর মানবতাবাদী সমাজ-অভিমুখিনতা।

কিন্তু আজ আমরা অতীতকে, তার সমস্ত জটিলতা সমেত, সমগ্রভাবে উপলব্ধি করছি।

কোনো রোগের কারণগুলিকে না জেনে, সেই রোগ সারিয়ে তোলা অসম্ভব। এবং বর্তমানের বাধা-অসুবিধাগুলির মোটমাট যোগফলকে বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখছি যে সেগুলির মূল ১৯৩০-এর দশকের গভীরে প্রোথিত।

সেই সময়েই, ওই বছরগুলির সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক অভ্যন্তরীণ অবস্থাধীনে, কড়াকড়ি রকম কেন্দ্রিকতা, কাজের খুব বিস্তারিত নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়ম-কানুন আর নির্দেশাধীন কাজের দায়িত্ব অর্পণ এবং সংকীর্ণ রকমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বাজেট বরাদ্দ—এইসবের ভিত্তিতে একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেটা তার ভূমিকাও পালন করেছিল।

কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গণতান্ত্রিক নীতিগুলির এই সঙ্কীর্ণতা নূতন অবস্থায় যারপরনাই প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। শ্রমিক জনগণের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে লেনিনের ধারণাটির, কোনো স্থানই এতে ছিল না। জনগণের সম্পত্তির যারা প্রকৃত অধিকারী, সেই শ্রমিক জনসাধারণের কাছ থেকেই সর্বজনের সম্পত্তিগুলির হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সর্বজনের সেই সম্পত্তি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা ক্রমেই আরো স্পষ্টভাবে প্রকট

মালিক কেউ ছিল না বলেই। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'যা ঘটেছে, তার মৌল ত্রুটিটা এখানেই নিহিত : অতীতে যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেটা এখন সমাজতন্ত্রের বিকশিত হয়ে ওঠার অনুকূল একটি উপাদান থেকে, হয়ে দাঁড়াল তার অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধা।

এই বাধা সৃষ্টি হবার রাজনৈতিক দিকটির কথা বলতে গেলে, এই ক্ষেত্রেও শিক্ষিত, মেধাবী সব লোক, সামাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বস্ত সব লোক সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনাগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে নি, রাষ্ট্রের কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনায় তাদের সত্যিকার অংশগ্রহণের অধিকারকে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারে নি। সর্বসাধারণ আরো সক্রিয় এক রাজনৈতিক সৃজনশীল কাজকর্মের জন্যে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তার কোনো সুযোগ ছিল না।

আমরা তাহলে কোন বক্তব্যে পৌঁছতে চাই ?—এই প্রশ্নটির উত্তরে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'পেরোস্ত্রোইকা-র সারমর্মটি এই তথ্যটির মধ্যে চিহ্নিত যে এটা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের মিলন ঘটাচ্ছে এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগ, উভয় ক্ষেত্রেই, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের লেনিনীয় ধারাটিকে পুনঃপ্রবর্তিত করছে।'

বইটি শুধু সোভিয়েত পাঠকদের জন্যেই লেখা নয়। এর শিরোনামের একাংশ হল : '…বিশ্বের জন্যে…' প্রত্যেক জাতিই তার নিজস্ব এক-একটি 'ফ্ল্যাট-বাড়ি'তে বাস করলেও, আমাদের সকলের একটি অভিন্ন গৃহ আছে—আমাদের এই পৃথিবী গ্রহ। একে ধ্বংসের হাত রক্ষা করা এবং বসবাসের পক্ষে আরও ভালো, আরও নিরাপদ স্থান করে তোলা দরকার। এর জন্যে চাই যোগাযোগ স্থাপনের কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত রূপ আর সর্বজনের মনে গেঁথে দেবার জন্যে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

এই নূতন রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার একেবারে প্রথম ও মৌল নীতিই খুবই সরল : নিউক্লিয়র যুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত বা অন্য কোনো লক্ষ্য সাধনের উপায় হতেই পারে না, লিখেছেন গোরবাচেভ। এটাকে একেবারেই প্রাথমিক বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, এ হল যুদ্ধের ধারণাটিরই এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো। যুদ্ধ আজ রাজনৈতিক একটা সাতিয়ার থেকে আত্মহত্যায় পরিণত হবে।

কিন্তু, থার্মো-নিউক্লিয়র হত্যাকাণ্ড যে অর্থহীন, শুধু সেটা উপলব্ধি করাটাই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্যে দৈনন্দিন

অবিরত ও একনিষ্ঠ প্রয়াস চালানো দরকার। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে মানবিক করে তোলাটা কঠিন কাজ।

উপসংহারে গ্রন্থকার লিখেছেন : আমরা সকলেই ছাত্র, এবং সময় আর স্বয়ং জীবন আমাদের শিক্ষক। আমরা যদি এই প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন লাভ করি তাহলে, অগ্রগতি যে অব্যাহত থাকবে, সে সম্বন্ধে প্রস্তুত ও সুনিশ্চিত হয়েই আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করব। 'আজ সারা বিশ্বের পক্ষেই পেরেস্‌ত্রোইকা-র—অর্থাৎ, অবিরাম অগ্রগতিশীল উন্নয়নের আর গুণগত পরিবর্তনের প্রয়োজন···আমরা এই পথেই অবতীর্ণ হয়েছি, এবং আমরা অন্য সব দেশ ও জাতিকে তাই করার জন্যে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।'

—সোভিয়েত সমীক্ষা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা-১

অক্টোবর বিপ্লবের মূল্যায়নের আলোকে পেরেস্ত্রোইকা

রণধীর দাশগুপ্ত

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে যখন বৃহৎ ও নতুন সমস্যাবলী দেখা দেয় তখন কেবল রাজনৈতিক নেতাদের নয়, জনসাধারণকেও সেইসব সমস্যাবলী বুঝতে হয় ও বিশ্লেষণ করতে হয়। কারণ মানুষের জীবন মানুষকে নতুনভাবে নতুন নতুন সমস্যাবলী চিন্তা করতে বাধ্য করে। মার্কস বলেছিলেন, যখন মতাদর্শ জনসাধারণের ধ্যানধারণাকে আকৃষ্ট করে ও প্রভাবিত করে তখন সেই ধারণা একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচভ রুশদেশে অক্টোবর বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তার প্রধান ভিত্তি হল নতুন চিন্তাধারা বা ধ্যান-ধারণা। এই নতুন ধ্যান ধারণার মধ্যে যেমন নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনই প্রতিফলিত হয়েছে দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক-অর্থ-নৈতিক বিকাশের চাহিদা ও গুণগতভাবে উন্নত সমাজতান্ত্রিক বিকাশের জন্য ত্বরিৎ গতির সর্বাঙ্গীন প্রয়োজন ও প্রয়োগ।

উদ্ভাবনী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর না হলে, আমাদের কালের বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলির সমাধানের পথ উপলব্ধি ও আবিষ্কার করা অসম্ভব। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী শুধু যে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা নয়। সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্বে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেসব প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে, সেগুলিকে সর্বাঙ্গীনভাবে উপলব্ধি করার জন্যও তা একান্তই অপরিহার্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের দীর্ঘ ৭০ বছরের অভিজ্ঞতা মানুষের শিক্ষা থেকে দক্ষতর করেছে। ইতিহাসের একটি স্তর অন্য একটি স্তরে উন্নীত হবার ক্রান্তি মুহূর্তে যেসব কঠিন ও জটিল সমস্যাবলী আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সঙ্গে তাকে পরীক্ষা ও সমাধান করার আত্মবিশ্বাস ও সাহস

বেড়েছে। এই আত্মবিশ্বাস, উপলব্ধি ও সাহসের উৎস হল নতুন ধ্যানধারণা বা চিন্তা। এই নতুন ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করে কমরেড গোরবাচভ অক্টোবর বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিশ্বের ঘটনাবলীর ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন।

কমরেড গোরবাচভ যে নতুন চিন্তাধারার কথা বলেছেন তার মৌলিক নীতিটা কি? নতুন চিন্তা একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা পুরানো গণ্ডী অতিক্রম করে নতুন শিক্ষালাভ করি এবং চিরনতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হই। যেমন পারমাণবিক যুদ্ধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত বা অন্যান্য লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় হতে পারে না বস্তুতপক্ষে এটা হল যুদ্ধ সম্পর্কে পুরানো চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আজ শ্রেণীহীন সমাজ নির্মাণ অথবা শ্রেণী-বৈরীতার অবসান পারমাণবিক বিপর্যয় থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন উপলব্ধি না করলে যুদ্ধ ও বিপ্লব সম্পর্কে অতীত চিন্তাধারার অবসান হতে পারে না।

রুশো-জাপান যুদ্ধের পর রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে বিপ্লব হয়েছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে জারের পতন ঘটে এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে। একই সালে অক্টোবর মাসে শ্রমিক শ্রেণী ও বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পূর্বাহ্নে ও পরবর্তীকালে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লব সংগঠিত হয়। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জোয়ারে সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত হয় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে সদ্যস্বাধীন দেশগুলি তৃতীয় বিশ্ব হিসাবে আবির্ভূত হয়। এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জন্য যুদ্ধকে বিপ্লবের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে মনে করা হতো। বিগত যুদ্ধগুলিতে মানুষ ও সম্পদের অভাবনীয় ও মর্মান্তিক ক্ষয়-ক্ষতি হলেও মানবসভ্যতা বিলুপ্ত হয় নি। কারণ তখনও মানবসভ্যতাকে বিলোপ করার মতো বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি বর্তমান পারমাণবিক স্তরে পৌঁছায় নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব বিপ্লব চিন্তার জগতেও আর কোন কালে এরকম গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে নি।

অতএব অতীতকালে 'যুদ্ধ ও বিপ্লবের' ধারনা বর্তমানকালে একেবারে অবাস্তব বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যুদ্ধ সামাজিক বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য—এই ধারনা প্রাণীজগতের বিলুপ্তির ধারণার সমার্থক। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকালে যখন সাম্রাজ্যবাদ পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে নিজেদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের জন্য বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তখন লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। ঐতিহাসিক অবস্থায় এই আহ্বান ছিল সঠিক কারণ এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করা ও আক্রান্ত দেশসমূহের মুক্তির পথ। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এমনই যে যা এক যুগে ছিল সত্য তা পরবর্তী যুগে আর কার্যকরী হয় না। পারমাণবিক যুগ আর গৃহযুদ্ধে পরিণত করার যুগ নয়। বর্তমান কাল গোটা প্রাণীজগৎকে বহুবার সংহার করার বিধ্বংসী মারণাস্ত্রে সজ্জিত। অতএব যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার সময়-সুযোগ পরিবর্তনশীল ইতিহাস নাকচ করে দিয়েছে।

যুদ্ধ হল বিভিন্ন রাজনীতিকে চালিয়ে যাবার উপায় বা পরিণতি—এই পুরাতন ধারণাও বর্তমানকালে অচল। অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই বিপরীত সমাজব্যবস্থার সহ-অবস্থান হল এক বিশেষ ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে কয়েক দশক ধরেই অনেক মার্কসবাদী আর মার্কসবাদ বিরোধীরা মনে করতেন বা এখনও কেউ কেউ মনে করেন যে দুই বিপরীত বিশ্বব্যবস্থা যখন সশস্ত্র, তাদের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই সশস্ত্র সংঘাতের দিকে অথবা পরস্পরকে আক্রমণের দিকে চালিত করবে। কিন্তু পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভার অতিদ্রুত পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠার ফলে বিপদের গুরুত্ব দ্রুত উপলব্ধি হচ্ছে এবং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আকর্ষনও শিথিল হচ্ছে। এই সহজসত্যটা অনুভূত হচ্ছে যে পারমাণবিক যুদ্ধে কোন পক্ষের জয়লাভ করা অসম্ভব। অতএব শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মধ্যে নতুন চিন্তার উপাদনও যুক্ত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অর্থ হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা হোক না কেন, বিশ্বস্বার্থে ও পারস্পরিক স্বার্থে কোন সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে তোলাই বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করার পথ।

অতএব নিরাপত্তার প্রশ্ন বর্তমান কালে অবিচ্ছেদ্য। আজ বিশ্ব-নিরাপত্তাকে বাদ দিয়ে কোন একটা দেশের নিরাপত্তা বিধান অসম্ভব। এটা একটা সামগ্রিক সমস্যা। বিশ্বের জনমত এই সমস্যাকে ক্রমেই উপলব্ধি

করছে। এর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদ এবং পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনকারী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। এদের প্রতিহত করা সহজ ব্যাপার নয় কারণ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয় না কিন্তু বিশ্বব্যাপী জনমত প্রবল হলে এবং শ্রমিক শ্রেণী তাঁর ভূমিকা সংগঠিতভাবে পালন করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদ তার কৌশল ও কর্মকাণ্ড পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন—অপরাপর শোষিত শ্রেণীকে মুক্ত না করে শ্রমিক শ্রেণী নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে না। কিন্তু পারমাণবিক যুগে বিশ্বের নিরাপত্তাকে গ্যারান্টি না করেও শ্রমিক শ্রেণী তার উপরিউক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ভূমিকা আগেকার তুলনায় অনেক বেড়েছে। এই ভূমিকা পালনের মধ্যে নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব।

সোভিয়েত বিপ্লবের মূল্যায়ন

এই খোলাখুলি মূল্যায়ন পাঠকবর্গের কাছে এক নতুন চিত্র উদ্ঘাটিত করেছে। অক্টোবর বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে জনসাধারণের অভূতপূর্ব ত্যাগ, সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা এবং লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে কর্মকৌশলজনিত সাফল্যের ইতিহাস যেমন শিক্ষামূলক ও বিপ্লবী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, তেমনই লেনিনের মৃত্যুর পর সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে বিভিন্ন বিচ্যুতি, গণতন্ত্রের লঙ্ঘন, আমলাতান্ত্রিকতা, সরকারী হুকুমনামা জারীর মাধ্যমে কাজ পরিচালনা, ব্যক্তি প্রাধান্য, আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রামে অত্যাচার ও অবিচারের চিত্রও কমরেড গোরবাচভ তুলে ধরেছেন। এই ত্রুটিগুলি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নীতির মধ্যে নিহিত নয়, যা পশ্চিমীরা সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যুগ যুগ ধরে বিপরীত চিত্র প্রচার করেছে এবং এখনও তার থেকে বিরত নয়। বিষয়গত দিক থেকে এসব যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতির উৎস ছিল প্রাকবিপ্লব রাশিয়ার অবস্থা। জারশাসিত রুশদেশে গণতন্ত্র এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ ছিল। সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি পুঁজিবাদের বিকাশ মধ্যবর্তী স্তরকে অতিক্রম করতে পারে নি, আর আর্থিক ও সামাজিক গঠন ছিল বহুকাঠামোবিশিষ্ট।

এই বাস্তব অবস্থায় যে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল তাকে গলাটিপে মারবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা ও আভ্যন্তরীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা প্রতিবিপ্লব

সংগঠিত করেছিল। রুশদেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণকার্যকে সমূলে উৎপাটিত করার এমন কোন কাজ বা কৌশল ছিল না যা সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরেরা অবলম্বন করে নি।

সাম্রাজ্যবাদীদের বেষ্টনী থেকে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের মোকাবিলা করার জন্য দ্রুতগতিতে সমাজতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, রীতি-নীতি, তত্ত্ব থেকে কেবল বিচ্যুত হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মতাদর্শগত সংগ্রামও তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সংঘাতের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারন করে। ট্রটস্কীর ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ট্রটস্কীপন্থীদের বিপ্লব রপ্তানি করার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সঠিক সংগ্রাম হলেও স্তালিনের নতুন ভ্রান্ত তত্ত্ব, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামও বেড়ে চলবে—এই তত্ত্বের শিকার হয়েছিলেন বিপ্লবের বহুপরীক্ষিত নেতারা। মতাদর্শগত সংগ্রামে স্তালিনের অবদান অনস্বীকার্য হলেও, এমনকি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও, তারই নেতৃত্বে গণতন্ত্রের লঙ্ঘন, সরকারী হুকুমনামার মাধ্যমে ও আমলাতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বেদীমূলে অনেক নেতাকে নির্বাসন দণ্ডভোগ করতে হয়েছে এবং অনেককে জীবন দিতে হয়েছে। স্তালিন ভক্তিবাদ পার্টি এবং শ্রমিক শ্রেণীর উর্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অথচ এই সময়ে দ্রুত শিল্পায়ন, কৃষি সমবায় গঠন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, বহুজাতিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা, নতুনভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে সংগঠিত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকেরা তীব্র সংগ্রাম করেছে, কঠিন কাজ ও কষ্টসহিষ্ণুতার বিপ্লবী পরিচয় দিয়েছে।

তথাপি সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব সহকারে অতীতের পর্যালোচনা খুবই জরুরী, যা এ পর্যন্ত হয় নি। এটা অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ ঐ সময়ের গুরুত্ব দেশের ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমানে যেসব প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার অধিকতম উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে অতীতকে ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মধ্যে। রাশিয়ার মতো একটা দেশে বিরাট বিপ্লবী পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে মতাদর্শগত সংগ্রাম হয়েছিল। এই সংগ্রাম হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণী

ও গ্রুপের স্বার্থকে কেন্দ্র করে এবং সেই সংগ্রাম ছিল অর্থনীতি, রাজনীতি এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। এই কঠিন পরিস্থিতিতে কিছু পরীক্ষিত ও মর্যাদাসম্পন্ন নেতাদের মধ্যে পেটিবুর্জোয়া আচরণ সংকীর্ণ দলবাজীর রূপ গ্রহণ করেছিল। এই বিচ্যুতি আত্মপ্রকাশ করে কৃষি সমবায় গঠনের ক্ষেত্রে মাঝারী কৃষকের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। মাঝারী কৃষকেরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। রাতারাতি কৃষি সমবায় গঠনকে ত্বরান্বিত করার জন্য ওপর থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সর্বত্র সমবায় গঠনের নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়। কুলাকদের (ধনী কৃষকদের) বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাঝারী কৃষকদের সমবেত করা প্রয়োজন ছিল। তা না করে গণতান্ত্রিক রীতি নীতি লঙ্ঘন করে মাঝারী কৃষকদের বিরুদ্ধে অযথা দমননীতি চালান হয়। এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে অস্বীকার করা যায় না।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক হুকুমদারী নীতি অবলম্বন করা হয়। ফলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ হল এবং গণতন্ত্রের সম্ভাব্য বিকাশও ব্যাহত হয়। গণতন্ত্র লঙ্ঘনের ফলে দেশব্যাপী অসহিষ্ণুতা, বৈরীমূলক মনোভাব এবং আচরণ ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

অতীতের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং সমাজতন্ত্রের বিপুল সাফল্য ও তার পথে বাধা বিঘ্ন অনুশীলন করে পেরেসত্রোইকা এবং গ্লাসনস্ট নীতি রচনা করা হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতা বিচার করে বলা হয়েছে যে পেরেসত্রোইকার প্রাণকেন্দ্র হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। অতীতের ইতিহাস বিশ্লেষণে অনুসন্ধিৎসা, তার সাফল্যের ওপর অটল আস্থার ওপর ভিত্তি করে দুর্বলতা ও ত্রুটির মূল উৎপাটন করার প্রয়াস অত্যন্ত কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়া হলেও সমাজতন্ত্রের আরও অগ্রগতির জন্য অন্য কোন পথ নেই।

সোভিয়েত বিপ্লবের মূল্যায়নে কমরেড গোরবাচভ ইওরো-কমিউনিস্ট এবং নিউ লেফ্‌টদের নাম উচ্চারণ না করে যথার্থভাবে উত্তর দিয়েছেন। এঁরা মনে করেন যে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে কারণ এই বিপ্লব ছিল ভ্রান্ত। এই বিপ্লব প্রত্যাশিত নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে ইওরো-কমিউনিস্ট এবং নিউ-লেফটরা মনে করেন, অক্টোবর বিপ্লব ভাত-কাপড়ের সমস্যা সমাধানের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে নি। এই বিপ্লবে নৈতিকমানের উন্নতি হয় নি। উন্নত ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সমাজতন্ত্র থেকে

মানবতাবোধকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ হল অত্যন্ত নিম্নমানের সমাজতন্ত্র। এই সবকিছুর জন্য এঁরা দায়ী করেছেন স্তালিনকে।

দ্বিতীয়ত, এদের অন্যতম প্রধান অভিযোগ হল, সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সমালোচনায় অসহিষ্ণু মনোভাব! আবার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতরের কেউ কেউ বিংশতি কংগ্রেসে যে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ হয়েছে—এটার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীই ভুল। কমরেড গোরবাচভ বলেছেন রুশদেশে বিপ্লব ছিল অকৃত্রিম ও যথার্থ। তা সত্ত্বেও তার সীমাবদ্ধতা ছিল। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেছেন—১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সাফল্যের মধ্যে নিহিত ছিল অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের সম্ভাবনা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুগে জনগণের সফল বিপ্লব। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের প্রচণ্ড সংগ্রামের গতিবেগ যে আরকে উচ্ছেদ করেছিল, তেমনিই সেই সময় জনগণের বিপ্লবী চেতনার অপ্রতুলতা, সীমাবদ্ধতা, ঐতিহাসিক জড়ত্বের ফলে পলায়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। বিপ্লব ছিল জনগণের, শোষিত মানুষের অথচ ক্ষমতায় বসল শোষক শ্রেণী। এটা বিপ্লবের সীমাবদ্ধতার একটা নিদর্শন।

কমরেড গোরবাচভ যেমন ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লবে উত্তরণে একটা সোপান বলে বর্ণনা করেছেন, তেমনই অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্যকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং বিভিন্ন স্তরে বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করতে ইতস্তত: করেন নি। বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় দ্বৈত ক্ষমতার দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করেছেন।

১৯৩০ সালে রাশিয়ায় কুখ্যাত বিচার প্রসঙ্গে তিনি স্তালিনের কথা উল্লেখ করেছেন। গোরবাচভ স্তালিনের বিরাট অবদানকে স্বীকার করে রিপোর্টে বলেছেন—"incontestible contribution", সমাজতন্ত্র নির্মাণে ৩০ বছর যাবৎ স্তালিন যা করেছেন তার মূল্যায়নে ইতিবাচক দিকটা অনেক বড়। তথাপি পার্টি সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি গণতন্ত্রকে লঙ্ঘন করেছেন, দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট নেতাদের প্রতি কেবল অমানবিক আচরণ করেন নি, নিজেকে শ্রেণী ও পার্টির উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ক্ষতিসাধন করেন। কিন্তু স্তালিন ছিলেন এক বিরাট জটিল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিপ্লবী নেতা। তিনি রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের একটা অংশ। তাঁর সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ খুবই জরুরী।

লক্ষ্য করার বিষয় হল স্তালিন সম্পর্কে আমাদের দেশে দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুই রকম বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশেষত সোভিয়েত পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর থেকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটা অংশের মধ্যে স্তালিনের বিরাট অবদানকে স্বীকৃতি বা গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে অত্যাচারী দৈত্যমানব হিসাবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস লক্ষণীয়। ট্রটস্কীর বিভেদকারী ভূমিকার বিরুদ্ধে স্তালিনের সঠিক মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রতি তাঁরা রুষ্ট।

আবার অন্য দিকে সি পি আই (এম)-এর মধ্যে এমন চিন্তা রয়েছে যে স্তালিনের অবদানই হচ্ছে সমস্যা সমাধানের একমাত্র সঠিক পথ। স্তালেনের নেতিবাচক দিকটা বিশেষত গণতন্ত্র লঙ্ঘন, পার্টির উর্ধে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার ক্ষতিকারক দিক যে সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্য দ্রুত বিকাশকে লঙ্ঘন করেছে তার প্রতি তাদের সমালোচনা ও নিজেদের কাজকর্মের পদ্ধতিতে পরিবর্তনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। ব্যক্তিপূজা, অন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণ, হিংসাত্মক বলপ্রয়োগের ভূমিকা সমাজতন্ত্রের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে এবং দুনিয়ার মানুষের কাছে তাকে হেয় করেছে—এই উপলব্ধির অভাব সমাজতন্ত্রকে নীতি বিবর্জিত করবে।

একটি বিরাট বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য এই উভয় বিচ্যুতিকেই অতিক্রম করতে হবে।

ইওরো-কমিউনিস্টরা সোভিয়েত বিপ্লব ও স্তালিনকে আক্রমণের মধ্যে নিজেদের সীমিত রাখে নি। তারা লেনিনকেও আক্রমণ করেছে। তাদের ভ্রান্ত আদর্শগত অবস্থানের জন্য তারা একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে এবং একাধিক বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতির এটা হল অবশ্যম্ভাবী পরিণাম!

পেরেসত্রোইকা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং গ্লাসনস্ট

এগুলি কেবল বিশ্বব্যাপী পরিচিত শব্দ নয়। পেরেসত্রোইকার অর্থ কি? সমাজতন্ত্র নির্মাণের ইতিহাসে বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের জীবনে এর তাৎপর্য কোথায়? যুদ্ধ ও শান্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? সর্বোপরি এর উৎপত্তির উৎস কোথায়? এই প্রশ্নগুলি কিছুটা মূল্যায়নে আলোচিত হয়েছে।

পেরেসত্রোইকা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। এটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত। এটা একটা বিশেষ ধরণের বিপ্লব তার মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন নেই। এই বিপ্লব যুগপৎ ওপর এবং নিচুতলার থেকে সংগঠিত। এককথায় বলতে গেলে এর অর্থ হল সমগ্র জনগণের ও সমাজের আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক ও মনন জগতের গুণগত পরিবর্তনের বিপ্লব। এটার চরিত্র সর্বব্যাপক নতুন ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ। এটা নতুন যুগের এমন একটা পথ যে পথে কমিউনিজমে উত্তরণের দিকনির্নয় করে।

সোভিয়েত বিপ্লবের মূল্যায়ন হল পেরেসত্রোইকার অন্যতম উৎস। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজতন্ত্রে অবৈরীমূলক বিরোধগুলি ও তার পরিণাম, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে ব্যবহার করে বিশ্বধ্বংসের জন্য সাম্রাজ্যবাদের প্রয়াস।

অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মৌলিক নীতির প্রবর্তন হল পেরেসত্রোইকা কর্মসূচীতে একটি বিরাট অগ্রগামী পদক্ষেপ। পেরেসত্রোইকার অর্থ হচ্ছে বদ্ধাবস্থার প্রক্রিয়ার অবসান করা, যে পদ্ধতি বদ্ধাবস্থা সৃষ্টির যন্ত্র হিসাবে কাজ করছে তাকে ভেঙে দেওয়া এবং এমন নির্ভরশীল ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় এবং বৃহত্তর আকারে গতিশীলতা অর্জন করে। পেরেসত্রোইকার উদ্দেশ্য হল গণউদ্যোগ সৃষ্টি করা. সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন, সমাজতান্ত্রিক স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, উদ্ভাবনী প্রচেষ্টাকে উৎসাহদান, এবং সমাজের সর্বস্তরে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা প্রবর্তন। সোভিয়েত বিপ্লবের মূল্যায়নে এইসবের অভাব ও বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি মর্যাদা দানও পেরেসত্রোইকা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পেরেসত্রোইকা হল সোভিয়েত অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হুকুমনামার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রবর্তন এবং উৎপাদনী সংস্থাসমূহে উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহদান, আধুনিক বিজ্ঞান ও শ্রমের সমন্বয়, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রয়োগ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে তার বিকাশসাধন হল পেরেসত্রোইকার জীবনীশক্তি। সাম্প্রতিক কর্মসূচীর প্রধান চালিকাশক্তি হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ। এই বিকাশে মানবশক্তি ও তাদের জ্ঞান, চেতনা ও সংগঠন হল প্রধান। তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নত ব্যবস্থা, সমাজ ও প্রত্যেকের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অবিরাম প্রয়াস হল গণতন্ত্রের অঙ্গীভূত। সাম্যবাদে উত্তরণকালে নতুন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করা হল উন্নত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র। যত এই প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ হবে ততই human factor-এর গুরুত্ব অনুভূত হবে। এটাকে কেন্দ্র করে সমগ্র সোভিয়েত সমাজ ঘুরছে—উৎপাদন থেকে শুরু করে উদ্ভাবনী চিন্তা পর্যন্ত। এরাই হল প্রধান শক্তি। সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধকে বিকৃত করার প্রয়াসকে নির্মূল করতে হবে, সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে সামাজিক ন্যায়বিচারকে প্রয়োগ করতে হবে ও গণতন্ত্রকে জীবনের অপরিহার্য্য অংশে পরিণত করা এবং উচ্চমানের শ্রমকে উৎসাহিত করা পেরেসত্রোইকার কর্মসূচী। এই কাজ আদৌ সহজ নয়। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করতে হলে সাধারণ মানুষকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে বিরামহীন ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

পেরেসত্রোইকার সারমর্ম হল গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের প্রাণশক্তিতে পরিণত করা এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণে লেনিনবাদী ধারণাকে তত্ত্বে ও কর্মে পুনরুজ্জীবিত করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পেরেসত্রোইকাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি না করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। এই কর্মসূচী বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে গ্যারান্টি করবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের ওপর অসহায় নির্ভরশীলতার থেকে মুক্ত করবে। এই বিরাট কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। এর জন্য চলেছে পার্টির পুনর্গঠন প্রক্রিয়া, পার্টি'র আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ, কর্মপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন, পার্টি সংগঠনকে, কর্মকাণ্ডকে কার্যকরী করার জন্য সারাদেশব্যাপী উদ্যোগ ও উৎসাহ সৃষ্টির প্রক্রিয়া, পার্টি'কর্মীদের মার্কসবাদ লেনিনবাদে শিক্ষিত করার নিরলস প্রয়াস। যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি সোভিয়েতে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দ্বারপ্রান্তে এনেছিল তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। সমস্ত রকম দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মতাদর্শ বিষয়ে অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই মতাদর্শ যখন সমগ্র জনগণকে আকৃষ্ট করবে ও প্রভাবিত করবে তখন দেখা যাবে পেরেসত্রোইকা একটা বিরাট শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ইতিমধ্যে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সমাজকে গণতান্ত্রিকভাবে

পুনর্গঠন করার বিষয়টা নির্ভর করছে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের ওপর। তাই সর্বক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে। সমাজতন্ত্র যে সংঘাতমুক্ত সমাজ নয় বা এটা একটা অন্ধ মতবাদ নয়—এই সেকেলে চিন্তার স্থান দখল করছে নীতিসম্মত সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা। উদ্ভাবনী চিন্তা ও কাজের দ্বারা নতুন চিন্তা ও ধ্যানধারণা মূর্ত হয়ে উঠছে। গ্লাসনস্ট কেবল গণতন্ত্র সম্প্রসারণের বাহন নয়, নতুন চিন্তাধারারও বাহন এবং রক্ষণশীল মনোভাবকে উৎপাটিত করার মোক্ষম হাতিয়ার। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সমাজতন্ত্রকে আরও উন্নত করে তার গতিমুখ ফিরিয়ে দেবে সাম্যবাদের দিকে।

গোরবাচভের রিপোর্টে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নেই তা'হল বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা, দেশে দেশে শ্রেণীসংগ্রামের স্তরের মূল্যায়ন এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ। পেরিসত্রোইকার সঙ্গে এইসব বিষয়গুলি যুক্ত হলে তবেই বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা অনুভূত হবে।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দায়

দাশু রায়

উদ্ভব

বাংলার উনবিংশ শতক বুদ্ধি ও গৌরবে দীপ্ত, বৃহত্তর জগতের সংস্রবে গরীয়ান। এই দুটি গুণই সে সময়কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বিশিষ্ট লক্ষণ। সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি সর্বত্রই তার গতি। সেই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তির জোরেই উনবিংশ শতাব্দের বাঙলার নব-জাগৃতি আন্দোলন উত্থান-পতনের পথে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের উত্তরণের যুগে সমাজে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তারই মধ্যে আবির্ভূত হলেন আধুনিক বুদ্ধিজীবী। সারা ভারতের মধ্যে একটা স্পষ্ট চিহ্নিত সামাজিক স্তর হিসাবে ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রথম ঐতিহাসিক আবির্ভাবের ক্ষেত্র এই বাংলা। পাশাপাশি উনিশ শতকেই বৃটিশ ভূমি-রাজস্ব নীতির ফলে বাংলা দেশের গ্রাম্যসমাজে এমন একাধিক শ্রেণী (সামাজিক স্তর) তৈরী হয়েছে যে শ্রেণীগুলো বৃটিশ শাসনের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ। এরা হল জমিদার শ্রেণী ও নতুন মধ্যস্বত্বভোগী গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী। এর পাশাপাশি নাগরিক সমাজে যেমন কলকাতা শহরে বৃটিশ শাসকরা আরও দুটি শ্রেণী (সামাজিক স্তর) তৈরী করেছিলেন। একটি নতুন নাগরিক ধনিক শ্রেণী, অন্যটি নাগরিক মধ্যশ্রেণী। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ও প্রসারের সুযোগে এই মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই ছোট দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী, দালাল, নানারকমের চাকুরীজীবী। এই নাগরিক শ্রেণীর মধ্যেই গড়ে উঠেছে ইংরাজী শিক্ষিত "এলিটশ্রেণী", মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।

বর্ণাশ্রম প্রথা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বৃটিশ শাসকরা আমাদের দেশে পুরাতন সমাজব্যবস্থার অনেককিছু ওলট-পালট করেছেন বটে, কিন্তু সমাজের মূল গঠন অর্থাৎ বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তিতে একেবারেই আঘাত করতে পারেন নি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য টাকার থাম্বায়

ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ টাকার আকর্ষণ অপেক্ষা শিক্ষা ও চাকুরীলব্ধ টাকার আকর্ষণ অনেক বেশী ছিল। এমনকি বৃটিশ শাসন মুক্ত হওয়ার পরও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতায় চাকুরী ভিন্ন সেরকম কোনও উদ্যোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তারও কারণ সমাজের বর্ণভিত্তিক গঠন আজও প্রায় অটুট, বিশেষ বদলায় নি।

ধর্মসংস্কার ও তার পরিণতি

বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্ম হয়েছিল সনাতন হিন্দুসমাজের বর্ণভিত্তির ওপর নির্ভর করে এবং সেই সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অশুভ সহযোগে। এই সহযোগের ফলেই সৃষ্ট হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ওপর ভক্তি ও আকর্ষণ। পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থায় এবং জীবন-ধারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে ঠিকই, কিন্তু সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে আচার-ব্যবহার ও ধ্যানধারণায় হিন্দুধর্মের বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আদর্শের কাঠামোতেই জীবনধারা প্রধানত আবদ্ধ রয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মূল ভিত্তি বর্ণভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা। যে ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনের পরিবর্তন বৃটিশ আমলের দেখা গেল তাতে সমাজের জাতি বর্ণভেদে, ধর্ম সম্প্রদায়ের বৈষম্য ইত্যাদির কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন হল না। উনিশ শতকে সমাজ-সংস্কারকদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আলোড়ন সৃষ্টি করলেও জাতিবর্ণভেদ, সম্প্রদায়গত প্রভাব এসবের দৃঢ়ভিত্তিতে কোনও আঁচড় লাগে নি।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকদের উন্নতিশীল সংস্কার আন্দোলনের বিস্তারও অনেকটা সংকুচিত থেকে গেছে। এইসব সংস্কার মূলত নগরকেন্দ্রিক থেকে গেছে, পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষিত মুষ্টিমেয় "এলিট" এর জীবনধারা ও আন্দোলনে আবদ্ধ থেকে গেছে, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও ধারণার উপর এ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে নি।

ধর্মের প্রভাব

ধর্ম যখন সমাজের সব থেকে শক্তিশালী সংঘ। বিশেষ করে আমাদের

মতো ঐতিহ্যমুখী সমাজে, তখন ধর্মসংস্কারকদের চেষ্টার কথা প্রথম ভাবা দরকার। অজস্র ধর্মীয় কুসংস্কার, আচার-বিচার, বাহ্য-অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা, বহুদেবতাবাদ হিন্দুধর্ম ও সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে দেখে রামমোহন গভীর বেদনা বোধ করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংকট তিনি দূরদৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই উপনিষদ ও তন্ত্রশাস্ত্র থেকে বাহ্যানুষ্ঠান বর্জিত উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরও উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিল। বৃহত্তর সমাজে ব্রাহ্মসমাজ পৌঁছতে পারে নি। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ প্রধানত তাঁর ব্যক্তিত্বমুগ্ধ সহগামীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্মে রূপ দেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের বিশাল পরিধির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ধীরে ধীরে নির্বিবাদে বিলীন হয়ে গেল। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও নীতির এই করুণ পরিণতির পর উনিশ শতকের চতুর্থ পাদ থেকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের বিজয় যাত্রা আবার অব্যাহত গতিতে শুরু হল।

আদর্শের দিক থেকে হিন্দু অবতারবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন যাঁরা তাদের সংখ্যাই প্রধান অংশ। এইভাবেই নবযুগের বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীগত চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব বাঙলার সমাজ সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাকেও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিয়ানদের ইয়ং বেঙ্গল দলও কোনও স্থায়ী দান রাখতে তেমন সক্ষম হয় নি। তাঁরা কতকগুলি মূল্যবোধ ও ধারণা সমাজমনের উচ্চস্তরে স্থাপন করতে পেরেছিলেন মাত্র। তেমনি হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরাও ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার চেয়েছিলেন ঠিকই, তবে তাঁদের বক্তব্য ছিল—প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের মধ্যে সমস্ত প্রগতিশীল ভাবাদর্শ আছে, সাম্য, গণতন্ত্র, স্ত্রীশিক্ষা, স্বাধীনতা, পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এসবই হিন্দুসমাজে ছিল, এসব ধারণা বাইরে থেকে আমদানী করা অর্থহীন, গীতায় সাম্যবাদ পর্যন্ত আছে। পুনরুত্থানবাদীদের এই চিন্তাধারা ও ধারণা সেসময় বেশ মারাত্মকভাবে অগ্রসর হয়েছিল। পুনরুত্থানবাদীদের এই চিন্তাধারা ও প্রভাব থেকে এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের ঐতিহাসিক,

সমাজবিজ্ঞানী, সমাজনেতা, এমনকি রাষ্ট্রনেতারাও মুক্ত হতে পারেন নি। আর এইখানেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভূমিকা। দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জনসমাজকে বিভ্রান্ত করার দিক থেকে, তাদের অসাড় নিস্পন্দ স্তরে রাখার দিক থেকে প্রধানত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে, তার চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা ভুলে গিয়ে, "সনাতন ধর্মের" কদাচারী স্বার্থের প্রত্যক্ষ সেবা ও পরোক্ষ অগ্রগতির পথ মসৃণ করে চলেছেন।

জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, গুরুবাদ প্রভৃতি আমাদের সমাজে সক্রিয় থাকার ফলে আর যন্ত্রোন্নয়ন—শিল্পোন্নয়নের সংখ্যাতে অর্থনৈতিক অসাম্য বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানেও যেন ধর্মের পুরাতন সংরক্ষণশক্তি ক্রমশই আরও শক্তিশালী হচ্ছে। গুরুবাদ, পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, জাতিভেদ, ধর্মানুষ্ঠান দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে, বাংলাদেশের শহরে নগরে ও তার উপকণ্ঠে। কেবল মধ্যবিত্তদের নানারকম নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার বিচারের দিক থেকেই নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পাশ্চাত্যবিদ্যার আওতপের ওপর প্রাচীন ধর্মীয় সংঘের আঘাত মধ্যবিত্তের মানসস্তরের কত গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে, সে বিষয়ে অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরাতন মধ্যযুগীয় সামাজিক সংঘের পাথর-প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে প্রগতির ভাবধারা প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে। জাতিভেদ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভেদ প্রবণতা, মূর্তিপূজা, বহু ঈশ্বরবাদ, গোঁড়ামি—এইসব ব্যাপারগুলির একটি অথবা অপরটির কাছে নিজেদের ক্রমাগত বিকিয়ে দিচ্ছেন আধুনিক 'বুদ্ধিজীবীরা' যাদের ইংরাজী শিক্ষার ওজন বেশ ভারী। স্বাধীন ভারতের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় এদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই।

আজও সেই ট্রাডিশন

বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পৌঁছেও আমরা আজ বাংলার সমাজে প্রগতিশীল ভাবধারার বিচিত্র সহঅবস্থান দেখতে পাচ্ছি, ধর্মীয় গুরুবাদ থেকে রাজনৈতিক মার্কসবাদ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে। জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সেই উনিশ শতকীয় ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত মানস আজও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশের অলিতে গলিতে পাড়ায় পাড়ায় ধর্মীয় গুরু ও অবতারের প্রাদুর্ভাব। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন করে তরুণ আধুনিক কবি ও কমিউনিস্টদের

শিক্ষায়তনের পাশাপাশি পেশাদার হস্তরেখাবিদের চেম্বার—মধ্যবিত্তের আকর্ষণ ও ভীড়ের চাপ দু জায়গাতেই সমান। আসলে বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় বিনাদ্বন্দ্বে সহঅবস্থান করে কুসংস্কারও। এই সমাজভুক্ত খুব কম মানুষের কথা ভাবা যায় যাঁরা বুঝে বা না বুঝে নানা প্রকার কুসংস্কার মেনে না চলেছেন। মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ, তিথিনক্ষত্র, তাগা-তাবিজ, ব্রত-মানত, পূজা-পার্বণ, জ্যোতিষ গ্রহরত্ন, পরকাল ইত্যাদিতে যারা বিশ্বাস করেন এ ধরনের ব্যক্তিদের চরিত্রে একটা সংহতি আছে। যে সংহতির অভাব অধিকতর প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের মানসিকতায়। আধুনিক ও সনাতনী, প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল এই দুই অংশ সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী হয়েও বাঙালী মধ্যবিত্ত মনে "শান্তিপূর্ণভাবেই সহঅবস্থান" করে চলেছে।

ভবিষ্যৎ

এইরকম সব বিচিত্র সামাজিক উপাদানের মিশ্রণে গঠিত ও উদ্ভূত মধ্যবিত্তদের রাজ্য বাংলাদেশের মতো দেশ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। অপর দিকে এই পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলাদেশের বিশাল বর্ধিষ্ণু জনসমাজে যারা তাদের শক্তি ও শোষিত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিল না, তারা বর্তমানে তাদের Sub-Humanity সম্বন্ধে সজাগ হচ্ছে, শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। প্রাথমিক রাষ্ট্রিক ও নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে এই বিদ্রোহ সার্থক হলে ভবিষ্যতে তারা লিখিত ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করবে এবং তখন এখনকার প্রচলিত মানদণ্ড ও মূল্যবোধ আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করবে। এই রূঢ় মানসিক আঘাতের হাত থেকে মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবীরা পরিত্রাণ পাবে না, বিশিষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকদের হয়তো তখন বর্তমানের ক্লাব-হোটেল-আড্ডাখানা ছেড়ে অরণ্যবাসী হতে হবে। কিন্তু উনিশ শতকের ব্রাহ্মইজম্, হিন্দুইজম্, অথবা ইয়ং বেঙ্গলের র‍্যাডিক্যালিজম্ অরণ্যেও আত্মনির্বাসন সম্ভব হবে না, অন্তত বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ অরণ্যে তো নয়ই।

কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী

ভারতে কমিউনিস্টদের বয়স ৫০ বৎসর পেরিয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব কবে হবে, কিভাবে হবে—এখনও তার নিশানা দৃষ্টিগোচর হয় নি। কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আধিপত্যে "পার্টি জীবন"-এর বিপজ্জনক ঝোঁক

বরাবরই প্রকাশ পাচ্ছে। রাষ্ট্রপরিচালকশ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণে বারবার ভুল হচ্ছে। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং দেশের মানুষের চেতনা ও জীবনযাপনের মূল্যায়ন হচ্ছে না। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নিজের মতো করে নিজের আয়নায় সমগ্র সমাজ দেখতে চেষ্টা করছে, আর যা দেখছে সেইমত নিদান হাঁকছে। সে মানসিকতা ধর্মের মোহ, ধর্মের আভরণে আচ্ছন্ন। এবং প্রচলিত ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির আশীর্বাদে পুষ্ট। মধ্যবিত্তসুলভ যাবতীয় গোঁড়ামি, সংস্কার, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও সুবিধাবাদ বর্তমানে মার্কসীয় চিন্তাধারাকে পঙ্কিল করে তুলছে।

যন্ত্রোন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের আরামদায়ক অধীনতা ও দাসবৃত্তি থেকে মানুষের মুক্তি কোন পথে মার্কসীয় রাজনৈতিক কর্মীদের বুদ্ধিজীবী অংশকে নিজেদের জীবন-যাপনের সঙ্গে মিলিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বৃহত্তর সমাজ থেকে আত্মবিচ্ছেদের ফলে বেদনা, নৈরাশ্য, আত্মবিকার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় দৃঢ়মূল হচ্ছে। বৈপ্লবিক চেতনার মরচে ধরে যাচ্ছে। কৃত্রিম পণ্যময় বুর্জোয়া সমাজে এক বিচিত্র সুখভোগের তরঙ্গে ও দিবাস্বপ্নে বুদ্ধিজীবী মানসিকতা নেশাখোরের মতো বুঁদ হয়ে ভাসমান হচ্ছে, বোধশক্তি বিলীয়মান হচ্ছে। যারা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান অথবা ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতদের মত তর্কের ধোঁয়া সৃষ্টি করে মার্কসীয় তত্ত্বের নিজ নিজ টিকা ভাষ্য করতে চান তাদের স্বার্থ কোনদিকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর রজত পাদুকায় শির স্থাপন করাই তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়। সবজান্তা কেতাদুরস্ত চতুর যারা, বর্তমানে বুর্জোয়া সরকারের শোষণ, শাসন ও লুণ্ঠন পরিকল্পনায় বুদ্ধির যোগানদার ও সহযোগী অংশীদার যারা তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাঁদের পক্ষে বুদ্ধি, যুক্তি ও ধ্যান-ধারণায় পুরাতন শিকড়-উপড়ে ফেলা রীতিমত কঠিন। কিন্তু যে শিকড়ে পচন ধরছে তাতো উপড়ে ফেলতেই হবে আর যদি সে শিকড়ের মধ্যে কোন জীবন্ত শাখা থাকে তাহলে সে শাখাকে পৃথক করে নতুন মাটিতে রোপন করাই শ্রেয়। বুদ্ধিজীবীদের অভ্যন্তর স্তরের এ সংগ্রাম, বুদ্ধিজীবীদেরই অপর অংশের।

নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আকর্ষণ মধ্যবিত্তের কাছে অত্যধিক। কারণ সেটা স্বচ্ছন্দ পেশায় পরিণত হতে পারে এজন্য আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশেও মধ্যবিত্তদের মার্কসীয় রাজনীতি ক্রমশই নগরকেন্দ্রিক হচ্ছে। মূল সত্যটা এড়িয়ে গিয়ে সমস্যা মিটবে না, কালের বিচারে মধ্যবিত্ত

বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব পালন হবে না। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব এই দুই পরস্পর নির্ভরশীল বিপ্লব সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। কৃষক ও শ্রমিকের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় না করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরও সমস্যার সমাধান নেই—বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থেই এটা স্মরণ রাখা দরকার। বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত যখন শূন্যবিত্ত, তখন তাদের প্রধান সার্থকতার পথ হল নিজেদের জন্মগত "শ্রেণীমার্কা" ত্যাগ করে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় মধ্যবিত্তের বিলোপ যেমন নিশ্চিত, বুদ্ধিজীবীদের বিকাশও তেমনিভাবে শ্রেণীহীন সমাজেই সুস্থির।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের সুখভোগের মৃগতৃষ্ণা, মহানগরের আকর্ষণ, নির্বিকার আত্মদাসত্ব, নিরাকার আত্মবিচ্ছিন্নতা—সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারার আধুনিক সংস্কারবাদের নিশ্চিন্ততা তার সঙ্গে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের বিপুল সম্ভারে মানুষ যেন অসহায় দর্শক ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু জীবনমঞ্চে ও সমাজপ্রাঙ্গণে অন্য নাটকও চলছে সে নাটক মানবমুক্তির নাটক। সেই মুক্তি সংগ্রামের পথ ছাড়া মানুষের সামনে বেঁচে থাকার আর দ্বিতীয় পথ নেই। অন্যপথ আত্মহত্যার পথ বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে নির্বাসিতের জীবনযাপনের পথ, নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আত্মবিলোপের পথ, এ পথ প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পথ নয়, জীবনদর্শন নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াশ্রেণী শৈশবকাল ও জাতীয় যৌবন উত্তীর্ণ হয়ে বার্দ্ধক্যে পা দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর উদারতা, মানবতা ও আন্তর্জাতিকতা বোধই আজ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীলতা তাই আজ 'আর্য-সংস্কৃতি', 'নব্য হিন্দু', 'ইসলামী সংস্কৃতি' এইসব উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে শক্তিশালী ও সংহত হচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর শৈশবকালের উদারতা, মানবতা ও স্বাধীনতার বাণী আজ সংকীর্ণতা, বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার গর্জনে পরিণত হচ্ছে। সোসালিজম বিরোধী ধর্মযুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্জনাস্তূপ ঘেঁটে—ধর্মশাস্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, আধ্যাত্মবাদ, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি ভূত-প্রেতদের জড় করতেও আজ বুর্জোয়াশ্রেণী পশ্চাৎপদ নয়।

কিন্তু জাগৃতি ও প্রগতির ধারা ঐতিহাসিক নিয়মেই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রবাহিত হবে। আর সেই প্রবাহের পথে সংঘাত ও বিরোধ তীব্রতর হবে। জাগতি ও প্রগতির ধারা অগ্রবর্তী করতে বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের অভিযান

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এঁদের অভিযান ব্যর্থ হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর রুশ বিপ্লব আর এক যুগান্তরের প্রেরণা দিয়েছে। রবার্ট ওয়েন থেকে মার্কস-এঙ্গলসের পথে লেনিনের যুগ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে পৃথিবীর সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বাঙলার এ যুগের নবজাগৃতির উত্তরাধিকারী শ্রমিক কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা নির্ভীকচিত্তে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে সমীকৃত করবে। বাঙলার জাগৃতিধারা, বাঙলার সমাজ, সংস্কৃতি দৃঢ়পদে বলিষ্ঠচিত্তে—সোসালিজমের প্রশস্ত পথে বৃহত্তর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে—বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এগিয়ে যাবে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে এই প্রত্যাশা অধিক নয়—অবৈজ্ঞানিক নয়।

প্রাচীন ভারতের 'নিয়োগ' প্রথা

জীবন মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারত—এমনকি প্রাচীন বিশ্বের নানা দেশে পর-পুরুষের ঔরসে সন্তান-ধারণ বৈধ ছিল। প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও ইহুদীদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'-ও এর উল্লেখ আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এ প্রথা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এর কিছুকাল আগে থেকে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে থাকলেও খ্রীষ্টীয় ৬০০ অব্দ পর্যন্ত এই প্রথা ভারতের সভ্য সমাজে প্রচলিত ছিল। আধুনিক দৃষ্টিতে বর্বরোচিত বলে বিবেচিত হলেও প্রাচীন ভারতে তা ছিল বৈধ, ধর্মসম্মত এবং সমাজজীবনের সাধারণ নিয়ম। এই প্রথা 'নিয়োগ' প্রথা নামে পরিচিত কারণ সন্তানহীনা নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য একজন পুরুষকে নিযুক্ত করা হতো। এই অবস্থায় নারীকে 'ক্ষেত্র', উক্ত নারীর স্বামীকে 'ক্ষেত্রী, বা 'ক্ষেত্রস্বামী', নিযুক্ত পুরুষ বা উৎপাদনকারীকে 'বীজী' এবং উৎপাদিত সন্তানকে 'ক্ষেত্রজ সন্তান' বলা হতো।

হিন্দুর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারতে' এই নিয়োগ পদ্ধতির প্রচুর উদাহরণ আছে। পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করলে বিধবা ক্ষত্রিয় রমণীগণ সন্তান উৎপাদনের জন্য সৎ-ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হন (আদিপর্ব, ৬৪)। পরম ধার্মিক বলিরাজা নিজ পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য মহর্ষি দীর্ঘতমার কাছে আবেদন জানান। বৃদ্ধ ও অন্ধ মুনিতে আপত্তি থাকায় সুদেষ্ণা তাঁর ধাত্রীকে দীর্ঘতমার কাছে পাঠান এবং ধাত্রীর গর্ভে তিনি কাক্ষীবান প্রভৃতি এগার জন পুত্রের জন্ম দেন। অধ্যয়নশীল এই পুত্রদের রাজা নিজ পুত্র বলে দাবী করলে ঋষি তাঁকে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে বলেন যে, "ইহারা আমার পুত্র।" রাজা তখন মুনিকে সন্তুষ্ট করে সুদেষ্ণাকে তাঁর কাছে পাঠান এবং রানীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচটি বিখ্যাত সন্তানের জন্ম দেন (আদি ১০৪)। বলিরাজা প্রজনন ক্ষমতাহীন ছিলেন না—উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদনের জন্যই তিনি দীর্ঘতমাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

সন্তানের নাম অন্ধক (আদি ১৭৭)। শারদণ্ডায়নী তাঁর স্বামীর আদেশে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের ঔরসে দুর্জয়াদি তিন পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেন (আদি ১২০)।

শুধু কি এই—রাজা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুতে হস্তিনাপুরের রাজবংশ লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাজমাতা সত্যবতী স্বপত্নীপুত্র ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকা দুই সুন্দরী বিধবা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে রাজা শান্তনুর বংশ ও রাজ্য রক্ষার আবেদন জানান। ভীষ্ম বিমাতাকে নিজ শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোন গুণবান ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। অতঃপর সত্যবতী ভারত বিখ্যাত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁরই গর্ভজাত সন্তান। বিবাহের পূর্বে ঋষি পরাশরের ঔরসে ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে তাঁর জন্ম। মাতার প্রস্তাবে বেদব্যাস সম্মত হলেন, কিন্তু শর্ত হল এই যে, এক বছর ধরে ভ্রাতৃ-বধূদের নির্দিষ্ট ব্রত পালন করে পবিত্র হতে হবে—"ব্রতবিবর্জিতা অপবিত্র রমণী কদাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না" (আদি, ১০৫)।

যথা সময়ে বেদব্যাস অম্বিকার কাছে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়ন, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার ও বিশাল শ্মশ্রু দর্শনে ভীতা ও বিস্ময়বিষ্টা অম্বিকা চোখ বন্ধ করলেন। সহবাসের পর মহর্ষি জানালেন যে, অম্বিকার গর্ভে মহাবিদ্বান ও বীর্যবান এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, কিন্তু মাতৃদোষে সে জন্মান্ধ হবে। এভাবে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হল। অন্ধপুত্র দ্বারা রাজকার্য চলতে পারে না। সত্যবতী তাই অম্বালিকার জন্য বেদব্যাসকে নিয়োগ করলেন। তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে অম্বালিকা ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হলেন। পাণ্ডুর জন্ম হল।

অম্বিকার ঋতুকাল উপস্থিত হলে সত্যবতী আবার বেদব্যাসকে তাঁর কাছে পাঠালেন। ঋষির বিকট মূর্তি চিন্তা করে ভীতা অম্বিকা তাঁর এক সুন্দরী দাসীকে ঋষির কাছে পাঠান। এইভাবে দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হয় (আদি ১০৬)।

রাজা পাণ্ডু ছিলেন অপুত্রক এবং মৃগয়ারূপী জনৈক মুনির শাপে তিনি সহবাস থেকে বঞ্চিত ছিলেন ("তুমি যে সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করিবে, সেই সময়ে তোমার মৃত্যু হইবে।" আদি ১১৮)। পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে তিনি পত্নী

কুন্তীকে নিয়োগ প্রথা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের ঔরসে যথাক্রমে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জন্ম হয় (আদি ১২৩) এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নকুল ও সহদেব (আদি ১২৪)।

মহাভারতের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, স্বামীর জীবিতকালেই পরপুরুষের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন—এমনকি স্বামী সন্তান-উৎপাদনক্ষম হলেও উন্নত মানের সন্তান উৎপাদনের জন্য গুণবিশিষ্ট পরপুরুষের সাহায্য গ্রহণ বৈধ ছিল। মহাভারতের যুগে নিয়োগ প্রথা কোনক্রমেই স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যাভিচার বা ধর্ম বা নীতি-বিগর্হিত বলে বিবেচিত হত না (আদি ১০৩/১০, ১২২।২৪, সভা ৪১/২৪)। মহাভারতে ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে।

কেবলমাত্র মহাভারতের যুগেই নয়—এর বহু পূর্বে সম্ভবতঃ আর্য আগমণের পর থেকেই ভারতে নিয়োগ প্রথা প্রচলিত হয়। আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য-গ্রন্থ ঋক-বেদের দশম মণ্ডলের (৪০/২) একটি স্তোত্রে অশ্বি দেবতাদ্বয়কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে—

"...যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে বা কামিনী নিজ কান্তাকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে সেরূপ সমাদরের সাথে কে তোমাদের আহ্বান করে?" পণ্ডিতরা এই শ্লোকটিকে নিয়োগ প্রথা বা বিধবা বিবাহ বা দেবরের সঙ্গে গোপন ব্যাভিচার প্রভৃতি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যাস্কবল্ক্য ও মনুস্মৃতির ব্যাখ্যাকার যথাক্রমে বিশ্বরূপ ও মেধাতিথি এই শ্লোকটিকে নিয়োগ প্রথার উদাহরণ বলে মনে করেন।

যদি উদ্ধৃত শ্লোকটিকে নিয়োগ প্রথার উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ঋক-বৈদিক যুগে সন্তান উৎপাদনের জন্য দেবরই নিযুক্ত হতেন।

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রথার উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। বলা হয়, ভারতে আর্য আগমণের সূচনা-পর্বে অনার্য দস্যুদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে আর্য পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস পায়। বিধবা বিবাহ তখনও প্রচলিত হয় নি। এই অবস্থায় নিয়োগই ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র উপায় এবং এইভাবে জাত সন্তানই ছিল বিধবা নারীর অবলম্বন। এ সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন

থেকে যায় যে, বিধবা বিবাহ প্রবর্তিত হওয়ার পরেও তাহলে এ প্রথা কেন প্রচলিত ছিল ! এর উত্তরে বলা হয়ে থাকে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত বিধবা নারী পুনর্বিবাহের দ্বারা অন্য একটি নূতন পরিবারে নূতন পরিবেশে যাওয়া অপেক্ষা মৃত স্বামীর পরিবারের মধ্যেই থাকা পছন্দ করত। এ ছাড়া, সে যুগে নারীকে সম্পত্তি বলে মনে করা হত এবং মনে করা হত যে, তার বিবাহ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির সঙ্গেই হয় নি—হয়েছে সমগ্র পরিবারের সঙ্গে। সুতরাং সন্তানহীন অবস্থায় কোন পুরুষ মারা গেলে তার ভাই বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় নিয়োগের মাধ্যমে তার বিধবা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করত। এতে উৎপাদিত সন্তানের ধমনীতে পারিবারিক রক্তই প্রবাহিত হত এবং পরিবারের মধ্যে বাস করে সে পরিবারেরই একজন হয়ে উঠত। এতে একদিকে মৃতব্যক্তির স্মৃতি যেমন টিকে থাকত, তেমনি পারিবারিক সম্পত্তিও হস্তান্তরিত হবার সম্ভাবনা থাকত না। এই কারণে দত্তকপুত্র গ্রহণ করা অপেক্ষা নিয়োগ প্রথাই গ্রহণযোগ্য ছিল। ঋক্‌বেদে বলা হচ্ছে—"অন্যজাত পুত্র (দত্তক) সুখকর হলেও তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করতে অথবা মনে করতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানে গমন করে (৭/৮)।" গরুড় পুরাণেও দত্তকপুত্র অপেক্ষা ক্ষেত্রজ সন্তানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সংগৃহীত পুত্র দাসীপুত্রের তুল্য। (গরুড় পুরাণ, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ৩৯০)। এ ছাড়া, নিয়োগের পশ্চাতে ধর্মীয় কারণও ছিল। পুত্রহীনতা সে যুগে নিন্দনীয় ছিল। মনে করা হত যে, পুত্রহীন পিতা মৃত্যুর পর নরকে যায় এবং শ্রাদ্ধের পিণ্ডের অভাবে পূর্বপুরুষদের আত্মা চিরযাতনা ভোগ করে। মহাভারতে বলা হচ্ছে—"পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বমৃত পিতামহদিগকে উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে"—এইজন্য সন্তানকে 'পুত্র' বলা হয় (আদি ৭৪)। জগৎকারু মুনি সম্পর্কে আলোচনা কালেও বলা হয়েছে যে, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পূর্বপুরুষদের সদ্গতিলাভ হয় এবং তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে যে, সন্তানের জন্ম দিয়ে পিতা পূর্বপুরুষদের কাছে তাঁর ঋণ শোধ করেন এবং পুত্রের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করেন। গরুড় পুরাণে বলা হচ্ছে যে, পিতা পুত্রের মুখ দেখলেই পৈতৃক ঋণ থেকে মুক্তি পায়, সর্ব পাপ মুক্ত হয় এবং পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র থেকে অনন্ত স্বর্গলাভ করে। ক্ষেত্রজ প্রভৃতি সব পুত্রই পিতাকে মুক্তি দেয় (গরুড় পুরাণ, নবপত্র, পৃঃ ৩৯০)। বামন পুরাণে 'পুন্নাম নরক' সম্পর্কে আলোচনা করা

হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করে বলেই 'পুত্র' নামকরণ করা হয়েছে (বামন পুরাণ, নবপত্র, পৃঃ ১৪১)।

এমতাবস্থায় নানা কারণে মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা বা বিধবা নারীর দেবর কর্তৃক সন্তান উৎপাদনের বিধি প্রচলিত হয়। এই বিধি এতই স্বাভাবিক ছিল যে, সূত্র ও স্মৃতিসাহিত্যে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেখা যায়। প্রাচীনতম ধর্মসূত্রকার গৌতম নিয়োগ প্রথা সম্পর্কে একটি বিশদ পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। তাঁর মতে, সন্তানকাঙ্ক্ষী বিধবা নারী তার দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদন করতে পারে। এ ব্যাপারে সে তার বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমতি নেবে এবং কেবলমাত্র ঋতুকালেই সহবাস করবে। দেবরের অভাবে কোন সপিণ্ড, সগোত্র বা সমবর্ণের কোন পুরুষের দ্বারা এ কাজ সাধিত হবে। তাঁর মতে—দেবর থাকা সত্ত্বেও অন্য আত্মীয় বা পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদিত হলে সে সন্তান উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তাঁর মতে, এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দু'টি পুত্রই উৎপাদিত হতে পারে—তার বেশি নয়। তিনি আরও বলেন যে, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে স্ত্রীকে স্বামীর জন্য ছ' বছর এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদেশে গেলে কনিষ্ঠকে বারো বছর অপেক্ষা করতে হবে।

বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রেও নিয়োগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথম ছ'মাস কৃচ্ছ সাধনের পর বিধবা স্নান সমাপনান্তে স্বামীর উদ্দেশ্যে আহুতি দেবে। অতঃপর বিধবার পিতা ও ভাই স্বামীর গুরু ও আত্মীয়দের সমবেত করে তাকে নিয়োগের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করতে বলবে। তিনি বলছেন যে, উন্মাদ, রুগ্ন মেজাজী, রোগাক্রান্ত বা কোন বয়স্কা নারীকে এ অধিকার দেওয়া যাবে না। ঋতুমতী হওয়ার ষোল বছর পর বিধবাকে নিযুক্ত করা যাবে। রোগাক্রান্ত কোন পুরুষকে একাজে নিযুক্ত করা যাবে না। নিযুক্ত পুরুষ 'শুভ মুহূর্তে' সহবাস করবে, কিন্তু বেশি মেলামেশা করা চলবে না বা সম্পত্তির লোভে পুত্র উৎপাদন করা যাবে না। এভাবে উৎপাদিত সন্তানের ওপর ক্ষেত্রী ও বীজী উভয়েরই অধিকার থাকবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে নিযুক্ত না হলে সহবাসের ফলে উৎপাদিত সন্তানের ওপর মাতার কোন অধিকার থাকবে না—সে হবে বীজীর সন্তান।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হচ্ছে যে, পুত্রহীন বিধবার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গুরুর অনুমতি নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৃত স্বামীর ভ্রাতা,

সপিণ্ড বা সগোত্র ঋতুকালে বিধবা গমন করবে। বিধবার গর্ভসঞ্চার পর্যন্তই একাজ চলবে। যথাবিধিসহ নিযুক্ত না হয়ে বিধবা গমন করলে পুরুষের একশ' 'পান' অরিমানা হবে।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'-ও এ সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা আছে। কৌটিল্যের মতে, রাজার একমাত্র পুত্র যদি রাজ্য শাসনের উপযুক্ত না হয় তাহলে রাজা নিজ কন্যার পুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করবেন, অর্থাৎ কন্যার পুত্র উৎপাদিত হলে সে পুত্র রাজার হবে—এ রকম চুক্তির মাধ্যমে বরের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করবেন (১/১৭)। রাজা যদি বৃদ্ধ বা ব্যাধিগ্রস্ত হন তাহলে তিনি মাতৃকুলের কোন বন্ধু বা স্বকুলজাত কোন পুরুষ বা গুণবান কোন সামন্ত নৃপতি দ্বারা নিজ মহিষীতে পুত্র উৎপাদন করতে পারেন (১/১৭)। সাধারণ মানুষের ব্যাপারে নিয়োগ প্রথা সম্পর্কে আলোচনা না করলেও তিনি এ সম্পর্কে কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন। কৌটিল্যের নিজ গুরুর মতে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে সৃষ্ট পুত্র হবে ক্ষেত্রীর, কিন্তু কৌটিল্য মনে করেন যে, এক্ষেত্রে পুত্র বীজী ও ক্ষেত্রী উভয়েরই পুত্র বলে গণ্য হবে (৩/৭)।

গরুড় পুরাণে বলা হচ্ছে যে, অপুত্রা নারী পুত্র কামনা করলে শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে ঘি দিয়ে দেহ মর্দিত করে দেবর বা সপিণ্ড কোন পুরুষের সাহায্যে পুত্র উৎপাদন করবে। গর্ভসঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র ঋতুকালে সেই পুরুষ অপুত্রা নারী গমন করবে। এর অন্যথা করা পাপ এবং এইভাবে উৎপাদিত সন্তানের ওপর ক্ষেত্রীর পূর্ণ অধিকার থাকবে (গরুড় পুরাণ, পৃঃ ১২৫।) বামন পুরাণে বলা হচ্ছে যে, পতি ক্লীব, উন্মত্ত বা ব্যসনাসক্ত হলে তার অনুমতি নিয়ে পত্নী পরপুরুষের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করতে পারে (বামন পুরাণ, পৃঃ ২৪২)।

এতক্ষণ যা আলোচনা হল তাতে দেখা যাচ্ছে যে, নিয়োগ প্রথার সমর্থক এইসব আইনপ্রণেতাগণ কিন্তু সব বিষয়ে একমত নন।

(১) মহাভারত ও অর্থশাস্ত্রে স্বামীর জীবদ্দশাতেও নিয়োগ প্রথা বৈধ, কিন্তু গৌতম, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য কেবলমাত্র স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রহীনার জন্যই এই প্রথার সমর্থন করেছেন।

(২) গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য নিযুক্ত পুরুষ হিসেবে দেবরকে প্রথম স্থান দিয়ে সগোত্র ও সপিণ্ড প্রভৃতির কথা বলেছেন, কিন্তু মহাভারত ও বশিষ্ঠ এ সম্পর্কে

কিছু বলেন নি—কৌটিল্য বরং এ সম্পর্কে 'মাতৃকুলের কোন বন্ধু' বলে নতুন একটি নাম যোগ করেছেন, যা অন্য কোথাও উল্লিখিত হয় নি।

(৩) গৌতম, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য নিয়োগের ব্যাপারে গুরুজনদের দ্বারা যথোচিতভাবে নিযুক্ত হবার কথা বলেছেন, মহাভারতেও তা দেখা যায়—কিন্তু কৌটিল্য এ ধরনের কোন অনুমতির কথা বলেন নি।

(৪) নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত সন্তানের সংখ্যা সম্পর্কে গৌতম দু'টি ও যাজ্ঞবল্ক্য একটির কথা উল্লেখ করেছেন। বশিষ্ঠ বা কৌটিল্য কোন সংখ্যা বেঁধে দেন নি। এ সম্পর্কে মহাভারতে কুন্তী বলেছেন—"শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্যন্ত পরপুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তরসংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিনী কহে, পাঁচবার উক্ত প্রকার কার্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যা—পদবাচ্য হইয়া থাকে (আদি ১২৩।)" বলা বাহুল্য, কুন্তীর গর্ভে তিনটি পুত্রই জন্মগ্রহণ করে।

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলার পর নিয়োগ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। বৃহস্পতি, মনু, আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ এর বিরোধী ছিলেন। আপস্তম্ব ও বৌধায়ন ঔপজঙ্ঘনি মুনির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, পুত্র উৎপাদনকারীরই এবং এর দ্বারা বিধবার মৃত স্বামীর কোন উপকার হয় না। বৌধায়ন বলছেন—

রেতোধা পুত্রং নয়তি পরেতো যমসাদনে।
তস্মাদ্ ভার্যাং রক্ষন্তি বিভ্যতঃ পররেতসঃ।

অর্থাৎ রেতোধা বা রেতঃসেকের দ্বারা উৎপাদনকারীই যমলোকে গিয়ে পুত্র অর্থাৎ পুত্রকৃত্যের ফললাভ করে। তাই সকলে ভয়ে পররেতঃ থেকে ভার্যাকে রক্ষা করে।

মনু এই প্রথার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন যে, কোন বিধবা কোন অবস্থাতেই পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে না এবং বিধবাকে একাজে নিযুক্ত করার অর্থ হল চিরন্তন বিধি ভঙ্গ করা। তাঁর মতে, বিবাহ-সংক্রান্ত কোন পবিত্র আইনে এর উল্লেখ নেই। তিনি বলেন যে, বাগদানের পর কন্যার মৃত্যুই হলেই এই প্রথা কার্যকরী হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে পুত্রের অধিকারী হবে মৃত স্বামী।

আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে বলা হচ্ছে যে, সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অপরের হাতে সমর্পণ করা কলিযুগে নিষিদ্ধ হয়েছে। কলিযুগে এ ধরনের যৌনমিলন ব্যভিচাররূপে গণ্য হয় এবং এর জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বৃহস্পতির মতে, কলিযুগে এই প্রথা অচল।

বলা বাহুল্য, নিয়োগ প্রথার বিরোধীদের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নি এবং এই কারণে এই প্রথাকে সীমায়িত করার জন্য তাঁরা কিছু নিয়ম-কানুন তৈরী করেন।

বৌধায়নের মতে—নিয়োগ প্রথা অবলম্বনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিধবা এক বছর মধু, মাংস, মদ ও লবন ব্যবহার করবে না এবং মাটিতে শয়ন করবে। তাঁর মতে, বন্ধ্যানারী, যার পুত্র আছে, যার গর্ভধারণের বয়স অতিক্রান্ত, কোন মৃত সন্তানের মাতা এবং অনিচ্ছুক নারীকে এই কার্যে নিযুক্ত করা যাবে না। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে পুত্রের সংখ্যা হবে একটিই এবং স্বামীর জীবিতবস্থায় নপুংসক ও রোগাক্রান্ত স্বামীর স্ত্রীরাও এই পথ গ্রহণের অধিকারী।

নিয়োগ-বিরোধী মনু এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, স্বামী জীবিত বা মৃত—যাই হোক না কেন তার কোন পুত্র থাকবে না, কেবল-মাত্র মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাই নিযুক্ত হবে—অন্য কেউ নয় এবং এই কাজে তাকে নিযুক্ত করবে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা। কাম চরিতার্থ করা নয়—নিযুক্ত ব্যক্তি বিশেষ কর্তব্যবোধেই একাজে নিযুক্ত হবে। তাঁর মতে, নিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘি বা তেল দ্বারা অভিষিক্ত হতে হবে, বিধবার সঙ্গে সে কোন কথা বলবে না, বেশি মেলামেশা করবে না এবং চুম্বন করবে না। মনুর মতে, এভাবে কেবলমাত্র একটি পুত্রই উৎপাদিত হবে এবং পুত্রোৎপাদনের পর তারা একে অন্যকে পিতা এবং ভ্রাতৃবধূ বলেই মনে করবে।

মনু সম্পূর্ণভাবেই নিয়োগ প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি এই প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেন। তাঁর মতে, ক্ষেত্রজ সন্তান ক্ষেত্রীর মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধ করার অধিকারী নয় এবং ক্ষেত্রীর সম্পত্তিতেও তার অধিকার নেই। তিনি মনে করেন যে, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতাদের কোন পুত্র থাকলে, সেই পুত্রই মৃতের বা পরিবারের সকলের পুত্র বলে বিবেচিত হবে।

পরাশর বলেন যে, "ক্ষেত্রের অধিকারীর (স্বামীর) অনুমতি নিয়ে কেউ যদি অধিকারীর 'ক্ষেত্রে' বীজ বপন করে, তাহলে সেই উৎপন্ন ফলের অধিকারী উভয়েই—'ক্ষেত্র' অধিকারী ও 'বীজ' অধিকারী। তবে বীজ অধিকারী

যদি ক্ষেত্র অধিকারীর গৃহে গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে বীজ অধিকারী সন্তানের মালিক নয়। শাস্ত্রকাররা এইরূপ মিলনকে ব্যাভিচার বলে গণ্য করেছেন। আর স্ত্রী যদি বীজ অধিকারীর গৃহে তার সঙ্গে মিলিত হয়, তবেই বীজ অধিকারী সেই উৎপন্ন সন্তানের অধিকারী হয়।"

নারদও এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর বক্তব্যও মনুর অনুরূপ। মনু ও নারদ এই প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিধি ভঙ্গ করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, বিধি ভঙ্গ করে কোন পুত্রের জন্ম দিলে সে জারজ সন্তান বলে চিহ্নিত হবে।

এবারে প্রশ্ন: সমাজে ক্ষেত্রজ সন্তানদের মর্যাদা কি ছিল? মহাভারতের আদিপর্বে (১২০) যে ছয় শ্রেণীর পুত্রের কথা আছে তার মধ্যে তিনশ্রেণীর পুত্রই ক্ষেত্রজ সন্তান এবং একের অনুপস্থিতিতে অন্যের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তবে ঔরসজাত পুত্রকেই আত্মাস্বরূপ বলা হয়েছে (অনুশাসন ৮৯)। গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে যে, একমাত্র ঔরসপুত্রই পিতার পার্বণ শ্রাদ্ধ করতে পারে, যা অন্য প্রকার পুত্ররা পারে না (গরুড় পুরাণ, পৃঃ ৩১০।) মহাভারতের দ্রোণপর্ব থেকে জানা যায়, অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষায় কর্ণ অর্জুনকে রঙ্গমঞ্চে আহ্বান করলে ভীমসেন কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলে উপহাস করেন। এর উত্তরে দুর্যোধন বলেন যে, ভীমের কর্ণকে বিদ্রূপ করা উচিত নয়, কারণ পাণ্ডবদের জন্মের ইতিহাসও সকলের জানা আছে (দ্রোণপর্ব ৩৮/২৫)। জয়দ্রথ, দুঃশাসন ও দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রায়ই পাণ্ডুর 'ক্ষেত্রজ পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন (দ্রোণপর্ব ৭২/৪)। সুতরাং মহাভারতের যুগে সমাজের চোখে ক্ষেত্রজ সন্তানদের কি স্থান ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

মনু পুত্রদের চারটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন—ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, দত্তক এবং ক্ষেত্রজ; অর্থাৎ দৌহিত্র ও দত্তক পুত্রকেও তিনি ক্ষেত্রজ সন্তানের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। নিয়োগ প্রথা নয়—তিনি পুত্রহীনা বিধবার ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণের পক্ষপাতী। মনুর অন্যতম টীকাকার মেধাতিথির মতে, নিয়োগের মাধ্যমে জাত কন্যাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করা উচিত নয়।

বলা বাহুল্য, নিয়োগ প্রথা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যারও সৃষ্টি করেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই দেবররা অগ্রজ-পত্নীকে নিজের ভাবী-পত্নী বলে মনে করতে থাকে, দেবরের স্ত্রীর কাছে শ্বাশুর-পত্নী স্বাভাবিকভাবেই

ঈর্ষার-পাত্রীতে পরিণত হয়, এবং নিয়োগ প্রথা কার্যকরী হলে সম্পর্ক আরও তিক্ত হতে থাকে। দেবরের মাধ্যমে পুত্র উৎপোদনের ফলে সম্পত্তির সমস্যা বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু সগোত্র ও সপিণ্ডের কোন পুরুষের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন হলে সম্পত্তির জন্যই সেই পুত্র ঈর্ষার পাত্র হত। কেবলমাত্র এই-ই নয়—ইতিমধ্যে মানুষের নৈতিকতার মানেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রথা নিন্দনীয় হতে থাকে। বৃহস্পতি এই প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেন। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই প্রথা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। আদিত্য পুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণে বলা হয় যে, কলিযুগে এই প্রথা সম্পূর্ণ অচল।

নানা ত্রুটী সত্ত্বেও নিয়োগ প্রথার কিছু ব্যবহারিক মূল্য ছিলই। সমাজে বিধবা বিবাহ যখন অনুপস্থিত তখন নিয়োগ বিধবা নারীদের কিছু সুবিধা করেছিল। নিয়োগের মাধ্যমে জাত পুত্ররা মৃত পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং এর ফলে বিধবারাও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা পায়। এই প্রথা বিধবাকে সমাজ ও গৃহে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে যে স্বয়ম্ভর এবং স্বামীর ভ্রাতার সংসারের সঙ্গেই সে যুক্ত—বাঁচার তাগিদে তাকে অন্যের করুণাপ্রার্থী হতে হত না, অবলম্বন হিসেবে তার পাশে আছে পুত্র। যে যুগে পুত্রহীনতা নিন্দনীয় ছিল, সে যুগে এই প্রথার মাধ্যমে নপুংশক ব্যক্তিও পুত্রের পিতা হতে পারত।

কালক্রমে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয় এবং একই সঙ্গে নিয়োগও চলতে থাকে। পরে বিধবা বিবাহও নিয়োগ একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এতে বিধবাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। আধুনিক যুগে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ নিয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর অনুগামীরাই এমত গ্রহণ করেন নি—বরং বিধবা বিবাহই এ যুগে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক জার্মানীতে ভারত চর্চা

[জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রখ্যাত ভারত বিশেষজ্ঞ হোর্স্ট ক্রুগারের Die internationale Arbeiterbewegung und die indische nationale Befeiungsbewegung (আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন এবং ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন) শীর্ষক এক সুবৃহৎ গবেষণাকর্মের প্রথম খণ্ডটি কিছুদিন হল বার্লিন আকাডেমী ফেরলাগ থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র গবেষণাটি চার খণ্ডে প্রকাশিতব্য। প্রথম খণ্ডের শিরোনামা Indische Nationalisten und Weltproletariat. Der nationale Befeiungskampf in Indien und die internationle Arbeiterbewegung Vor 1914 (ভারতীয় জাতীয়বাদীরা ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও ১৯১৪ সালের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন।) প্রথম খণ্ডটির সারাংশ এখানে প্রকাশ করা হল। —সম্পাদক]

বর্তমান শতকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, এই তিনটি বৈপ্লবিক ধারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আফ্রো-এশিয় ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সংকুচিত হয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান ভারতের আদর্শগত অবস্থার কারণ নির্ণয়ের জন্য ক্রুগার জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ভারতীয় প্রাচীন ধ্যান ধারণাগুলি নতুন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ছিল না। ফলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তাঁদের শাসনের সুবিধার জন্য নতুন ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করেন। ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী এই ধ্যানধারণার সাহায্যেই জাতীয় স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছিল।

প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডে মার্কান্টাইলী ব্যবস্থাবাদিরা প্রচারের

মাধ্যমে শাসক হিসেবে তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে ধীরে ধীরে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙন ধরায়। ইংরেজের নীতি ভারতবর্ষের ভূমিরাজস্বব্যবস্থাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে অর্থব্যবস্থার ভারসাম্যকে ধ্বংস করে দেয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি হলেও কৃষিতে উৎপাদনপ্রক্রিয়া অপরিবর্তিত থেকে যায়, কারণ কৃষিকার্যে পুরনো যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতে থাকে। মোট কথা, ভারতে ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটলেও কতকগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নি। বাস্তবক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায়। এর পরিণতিতে ঔপনিবেশিক ভারতে অসম, বৈপরীত্যমূলক ও বাধাপ্রাপ্ত ধনতন্ত্রের চরিত্রটি মতাদর্শের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়।

ভারতের প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জাতিপ্রথা। ধর্মীয় প্রথার আবরণে এবং জাতিভেদপ্রথায় সমাজব্যবস্থার প্রতিটি কাজ ও স্তর স্থিরীকৃত ছিল। ফলে পরিকল্পনা ও অগ্রগতি ছিল অসম্ভব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রশ্নও ছিল অবান্তর। এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের সামাজিক শর্তগুলি সুগঠিত হয় নি এবং ইউরোপীয় রিফর্মেশনের মত কোন ধর্মীয় আন্দোলনও শুরু হয় নি। যখন উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি রূপ নিতে থাকে, তখন ভারতের জাতীয় স্বার্থকে শ্রেণীস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করার মত কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী এ দেশে ছিল না। এই অবস্থায় নতুন সামাজিক বিন্যাস ও আদর্শের বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং কোন বিশেষ শ্রেণীচরিত্রমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বা অধিকাংশ মেহনতি জনগণের মুক্তির উপযোগী কোন মতবাদ গড়ে ওঠে নি। এই অবস্থায় জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনের চেতনাকে জাগ্রত করেন ঠিকই,—কিন্তু এই জাগরণ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতিচেতনা, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িত ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্যকে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো ও ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমে দুটি অধ্যায়ে উপরোক্ত বক্তব্যকে অধ্যাপক ক্রুগার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই দুটি অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে : উপনিবেশবাদের অধীনে ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ; সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ; উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ ; ১৯০৫-১৯০৮ পর্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চরিত্র ; স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা ; জনগণ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।

পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী আন্দোলন (তৃতীয় অধ্যায়); 'ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী' (পঞ্চম অধ্যায়) ; 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে ভারত প্রসঙ্গ' (সপ্তম অধ্যায়)। এই পর্যায়ের আলোচনায় লেখক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে বৃটিশ, জার্মান ও রুশ শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ফেবিয়ান মতাদর্শ ও সংস্কারপন্থী চিন্তার প্রভাবে বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রধানতঃ সংস্কারধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ নারায়ণ কৃষ্ণ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাছে কলকাতায় একটি 'সোস্যালিস্ট লীগ' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, হার্ডি ও ম্যাকডোনাল্ডের অসহযোগিতার ফলে কিভাবে সেটি শেষ পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়, তার একটি বিস্তৃত আলোচনা এই পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। পক্ষান্তরে জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী শাখাটি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের নিন্দা করলেও এই পর্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে জার্মানীর বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে। উপরন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জার্মান শ্রমিক আন্দোলন মূলতঃ ছিল বৃটেনের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের ব্যাখ্যার' পরে নির্ভরশীল। এই সময়তেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক 'সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক নীতির' প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে শুরু করে ও তার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশ্নের আলোচনাটি উত্তরোত্তর জটিল হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি রুশ শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী [illegible]

ক্র্যাটরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অংশীদাররূপেই দেখেন নি। তাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় সহযোগিতা করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি।

এই সঙ্গে লেখক একথাও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে ফেবিয়ান ও সংস্কারপন্থী মতাদর্শের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও ধীরে ধীরে মার্কসবাদ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের প্রভাবে বিপ্লবীদের একাংশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ব্যাপ্তি ঘটতে শুরু করে এবং তার ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চরিত্রেও পরিবর্তন সূচিত হতে শুরু করে।

লেখক তাঁর এই সুবৃহৎ গবেষণাগ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করেছেন প্রধানতঃ ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা, নেহরু মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার, লণ্ডনস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার, জার্মান জাতীয় মহাফেজখানা, ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বিভিন্ন দলিল, চিঠিপত্র এবং সম্ভাব্য সমস্ত রকমের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী থেকে। অধ্যাপক ক্রুগারের এই গবেষণা তাঁর বিপুল নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সর্বোপরি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর আগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মূল জার্মানের সারাংশ :

দীপিকা মজুমদার

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

"নারীসমাজের পরাধীনতার বীভৎস রূপের নাম সতী"

রন্‌জু ঘোষ

সতীপ্রথা আমাদের দেশের একটা বিশিষ্টরূপ হলেও তা আদৌ নারী সমাজের স্বাধীনতার বা মর্যাদার নয়। বরং সতীর মাহাত্ম্য কীর্তন নারী সমাজের পরাধীনতার উপর মেকী প্রলেপ মাত্র, একটি প্রবঞ্চনার হাতিয়ার—যার পরিণাম অসামাজিক ও অমানবিক।

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে নারীরা অনেক কাল পূর্বে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়েছে। এই বিবর্তনের রূপ এক এক দেশে এক এক রূপ। বিশেষত সমস্বাধীন ও পশ্চাৎপদ দেশে নারী জাতির পরাধীনতা বহুরূপী হলেও তার অভিব্যক্তি অত্যন্ত ভয়াবহ ও অমানবিক। তা সত্ত্বেও সমাজ বিবর্তনের মূল বিধি অনুসারে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ নারী জাতির যে এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়—এঙ্গেলস-এর এই বক্তব্য অনস্বীকার্য, তিনি আরও বলেছেন "পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল নারী হ'ল পদানত, শৃঙ্খলিত; পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র। নারীর এই অবনত অবস্থা যা বিশেষভাবে বীরযুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রীকদের মধ্যে পরিস্ফুট, তাই ক্রমে পালিশ এবং আংশিক রূপান্তরে মোলায়েম হয়েছে কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয়নি।"

এই বিষয়টি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অতিভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে। নারীরা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা মহারাজা ও নবাবদের লালসা চরিতার্থ করার হাতিয়ার। হারেমব্যবস্থা, দাসপ্রথার ঋণের দায়ে কৃষক রমনীদের ভূ-স্বামী ও মহাজনদের কাছে বন্ধক রাখার ব্যবস্থা এমনকি মন্দিরে সেবাদাসীর প্রবর্তন ইত্যাদি নারীদের সর্বাঙ্গীন পরাধীনতার সাক্ষ্য বহন করে। অদ্যাবধি সতীপ্রথার প্রচলন ও তাদের প্রতি মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থার প্রতি গণসমর্থন প্রমাণ করে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব ধর্মের আবরণে বা ধর্মকে ব্যবহার করে নারীদের এক অভিশপ্ত ও অমানবিক জীবনযন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সারা বিশ্বে নারীসমাজের পরাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল।

নারী সমাজের পরাধীনতার বিলোপ সাধন ঐ বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ অংগ। ফ্রান্স এ সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ ও স্লোগানকে ভিত্তি করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের এই বাণী নারীদের পরাধীনতার থেকে মুক্ত করতে পারেনি, সাম্যের মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি, কোন দেশেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এই কাজ সম্পন্ন করতে পারে নি। যদিও এটা ছিল বুর্জোয়া বিপ্লবের একটা অন্যতম কর্তব্য। বুর্জোয়ারাও যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে না এটাই তার প্রমাণ। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শোষণ ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়েছে। এটা রূপান্তরই, বিলুপ্তি নয়। যতদিন শোষণ-ব্যবস্থা আরি থাকবে ততদিন নারী সমাজের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

যদিও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে আমাদের দেশের তুলনায় নারীদের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি তথাপি নারীরা সমান মর্যাদায় সমাজে, রাষ্ট্রে ও পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত নয়। লক্ষ্য করা দরকার যে পণ্য উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ রূপের মধ্যে রয়েছে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সভ্যতার অনুসঙ্গী। রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে কোন দেশে নারীসমাজ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে নি। নারীমুক্তি ছিল অক্টোবর বিপ্লবের কর্মসূচীর অংশ। নারীজাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়ের প্রথম অবসান ঘটল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। নারীজাতির মুক্তির এই আন্তর্জাতিক তাৎপর্য হল নারীমুক্তির আন্দোলনের এক অতি মূল্যবান সম্পদ। ভারতে পাশ্চাত্য দেশের প্রগতিশীল ভাবধারা নারীসমাজ সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণকে সংস্কার-মূলকভাবে হলেও আঘাত করেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক কু-সংস্কার ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়—বিদ্যাসাগর।

রাজা রামমোহন সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তাকার্যও হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের ও নারীশিক্ষা প্রচলন করেছিলেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই দুই বীর সংগ্রাম করেছিলেন। যদিও তাদের বিরুদ্ধে সমাজের তথাকথিত গণ্য মান্য ব্যক্তিরা

রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু এদেরকে এ পথ থেকে সরাতে পারেন নি। আর সরাতে পারেন নি বলেই এ'দের সফলতা এসেছিল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পরেও আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সতী হওয়ার ঘটনা। এটা সতী হওয়া নয় এ নারী হত্যা। এই নারী হত্যার পিছনে আছে সম্পত্তির লোভ। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ না হবে ততদিন পর্যন্ত একদিকে সতী অপরদিকে ডাইনি এই অপবাদে নারীদের হত্যা করা হচ্ছে এবং হবে। স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন আসে এই সতী এবং ডাইনি সবকিছুই নারীদের ক্ষেত্রে কেন? পুরুষদের নয় কেন? আর নারীকে মৃত্যুবরণ করে সতী হতে হবে কেন? বেঁচে থেকে সম্পত্তির অধিকারিনী হলে দোষ বা অপরাধ কোথায়? পুরুষশাসিত সমাজ থাকলেই কী নারীদের জীবন এভাবে চলবে? নারীদের মর্যাদার আসনে বসানো কি সম্ভব নয়?

অক্টোবর বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতায় অধিষ্ঠিত করেছে তেমনিই তার প্রভাবও আমাদের দেশে নারী মুক্তি আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি যেমন নারীসমাজের পরাধীনতা সূচনা করেছে তেমনই সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান নারীমুক্তিকে বাস্তব করে তুলেছে। প্রমাণ করেছে যে সমাজতন্ত্রই নারীমুক্তির একমাত্র পথ।

সমাজতন্ত্র উত্তরণের সমস্যা ঃ চীনের রাজনীতি ও ত্রয়োদশ কংগ্রেস

সত্যব্রত দত্ত

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াঙ এর রাজনৈতিক প্রতিবেদন এবং কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে নানা ধরনের বিকৃত প্রচার শুরু হয়েছে। 'চীন বিশেষজ্ঞরা' বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করে দেখাতে চাইছেন যে চীনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ' গঠনের প্রচেষ্টা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে ; কারণ চীন যে ধরনের সমাজতন্ত্রের কথা বলছে তা ধনতন্ত্রেরই নামান্তর। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক অসারতাও চীনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে বলে এইসব 'বিশেষজ্ঞরা' মনে করেন। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত চীনকে "সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরে" থাকতে হবে বলে চীনের নেতারা যে ঘোষণা করেছেন তাকেও এরা চীনের সামগ্রিক ব্যর্থতার স্বীকৃতি বলে গণ্য করেন। অদূর ভবিষ্যতে চীনে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র প্রবর্তিত হবে বলেও এইসব 'বিশেষজ্ঞরা' আশা প্রকাশ করেন'। চীন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে কথিত এইসব তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের বক্তব্য যে একপেশে ও উদ্দেশ্যমূলক তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে অতীতের রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি এবং দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে চীনের নানা ধরনের বিচ্যুতি ঘটেছে এবং অগ্রগতিও ব্যাহত হয়েছে। বিগত প্রায় এক দশক ধরে (১৯৭৮ সালে পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর) চীনের বর্তমান নেতৃত্ব এইসব মূল্যায়ন করে ত্রয়োদশ কংগ্রেসে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, চীনের মত আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক দেশে ছক বাঁধা পথে বা কোন "মডেল" অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো অসম্ভব। মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত আঙ্গিকের মধ্যেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই চীনকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে

হবে। ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে এজন্যই চৈনিক বৈশিষ্ট্যসহ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

চীনের আদর্শগত অবস্থান এখনো তেমন স্পষ্ট নয়। বক্তব্যের মধ্যেও বেশ কিছু তত্ত্বগত অসঙ্গতি আছে। তাছাড়া তথ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার জন্য (অধিকাংশই পশ্চিমীসূত্রে প্রাপ্ত) চীন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অসুবিধা আছে। আলোচ্য নিবন্ধে চীনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার বিবর্তনের একটা পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। উৎস হিসেবে মূলতঃ নির্ভর করা হয়েছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন দলিল, চীন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকা এবং পশ্চিমী লেখকদের পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

২

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (১৯২১ সালে ষাট জনেরও কম সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত) গুরুত্বপূর্ণ অবদান আজও স্বীকৃত, কারণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মৌল তত্ত্বকে নির্ভর করেই চীনের সর্বহারার বিপ্লব সংগঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ায় চার বৎসরের মধ্যে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আত্মপ্রকাশ তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য পাল্টে দিতে সক্ষম হয়। চীনের অভ্যুদয় সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তিকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। চীন-সোভিয়েত মৈত্রী আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনকে আরো সংহত করে। আত্মপ্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই কোরিয়া যুদ্ধে (১৯৫০-৫২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করতে দশ লক্ষ চীনা সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবী প্রাণ দেন। চীন এশিয়া আফ্রিকার পদানত জাতিগুলির মুক্তি-সংগ্রামে প্রেরণা জোগায়। বিপ্লবোত্তর চীনের আদর্শগত অবস্থান, সোভিয়েত-চীন মৈত্রী, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি চীনের দায়বদ্ধতা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। বস্তুতঃ বিপ্লবের পর প্রথম দশকে সোভিয়েত সাহায্যে বৈষয়িক দিকেও চীনের প্রভূত অগ্রগতি হয়। শিল্প-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায়ও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার বহুলাংশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটে। শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। শোষণ ব্যবস্থাও অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়

শোষকশ্রেণীর বেশির ভাগ লোকই স্বাবলম্বী শ্রমজীবি শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চীনের বিরাট অগ্রগতি সূচিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চীনের বর্তমান নেতৃত্বও ১৯৪৯-১৯৫৬ সালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে বলেছেন "সাত বছরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সকল জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে, জাতীয় অর্থনীতি দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক গঠন কাজ চালিয়ে, দেশের বেশির ভাগ এলাকায় উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পন্ন করে নয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ক্রমশঃ বাস্তবায়িত করে। এই ঐতিহাসিক কালপর্বে পার্টির নির্ধারিত নীতি ও কর্মপন্থা সঠিক ছিল এবং গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যলাভ করেছিল। এই সময়ই ঘোষণা করা হয় 'শত পুষ্প বিকশিত হউক, শত ভাবধারার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলুক'। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করে। এক সুস্থ, বিপ্লবী নীতিবোধ সারাদেশে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই পর্বেই অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেস।

অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত লাইন সঠিক ছিল বলে বর্তমান নেতৃত্ব মনে করেন। কিন্তু 'বাম ঝোঁক', 'হুকুমনামা আমলার মনোভাব', 'আত্মতুষ্টি', 'সমালোচনা সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা' ইত্যাদির জন্য চীনের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আদর্শগত বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্কে ফাটল ধরে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন থেকেও চীন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শুরু হয় মহাউল্লম্ফন (Great leap Forward) এবং গ্রামীণ গণ-কমিউনের আন্দোলন। এই সময় প্রচার করা হয়, সরকার ও পার্টির অভ্যন্তরে একদল লোক পুঁজিবাদের পথগামী হয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চাইছে। তাদের নিশ্চিহ্ন করার নাম করে অনেক সাচ্চা কমিউনিস্টদের ওপর চলে বিরামহীন নিপীড়ন ও অত্যাচার।

শেষের মাও জেদুং-এর নির্দেশে সংগঠিত হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-৭৬)। বর্তমান নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে চীনের পার্টি, রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষে কঠোরতম দুর্বিপাক ও ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করেছেন। মাও জেদং-এর নির্দেশে প্রচার করা হয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে একটা

বুর্জোয়া সদর দপ্তর গড়ে উঠেছে এবং এই দপ্তর থেকে সংশোধনবাদী রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নীতি ও কর্মসূচী অনুসরণ করে চলা হচ্ছে। দীর্ঘ ১৩ বৎসর পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নবম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে। নবম কংগ্রেসের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সমস্ত সিদ্ধান্তই ভুল ছিল। কংগ্রেস থেকে শ্রেণীসংগ্রামকে আরো প্রসারিত ও সর্বাত্মক করে তোলার আহ্বান জানানো হয়। মাও জেদং মার্কসবাদবিরোধী বিভিন্ন তাত্ত্বিক সংযোজন করে বলেন, সমাজতন্ত্রের গোটা ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে বুর্জোয়াশ্রেণী বিরাজ করবে এবং পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করবে। সুতরাং 'সর্বহারার একনায়কত্বে ক্রমাগত বিপ্লব' এই নীতি চীনকে দীর্ঘদিন অনুসরণ করে চলতে হবে। লিউ শাও কি, দেঙ জিয়াও পেং, হু-ইয়াবাং, ঝাও-জিয়াঙ প্রমুখ নেতারা নিগৃহীত ও উৎপীড়িত হন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোন তত্ত্বের সঙ্গেই মার্কসবাদ লেনিনবাদের সঙ্গতি ছিল না। সাংস্কৃতিক বিপ্লব পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সারাদেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে চীনে এক মহা বিপর্যয় নিয়ে আসে।

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয় তাতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও তার আগেকার বিভিন্ন রাজনৈতিক বিচ্যুতির পর্যালোচনা করে মূল চারটি নীতি গৃহীত হয়। এই চারটি নীতি হল : (১) সমাজতান্ত্রিক পথকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন, (২) জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব তথা সর্বহারার একনায়কত্ব, (৩) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং (৪) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও জেদং-এর চিন্তাধারাকে নির্ভর করে কর্মসূচী ও লক্ষ নির্ণয়। শ্রেণীসংগ্রামের মাওবাদী তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়ে ১৯৭৮-এর প্লেনাম সিদ্ধান্ত নেয়, চীনের ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে, একে প্রসারিত করা হবে না।

চীনের বর্তমান নেতৃত্ব মাও জেদং-এর ভূমিকা ও চিন্তাধারার মূল্যায়ন করে বলেছেন, 'মাও ছিলেন একজন মহান মার্কসবাদী, সর্বহারা বিপ্লবী, রণনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক। চীনের মুক্তিসংগ্রামে এবং বিপ্লবোত্তর চীনে দীর্ঘদিন মাও যেভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল তত্ত্বের সঙ্গে চীনের অভিজ্ঞতা ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তা প্রশংসার দাবী রাখে' বলে বর্তমান নেতৃত্ব মনে করেন। কিন্তু চীনে শ্রেণীসংগ্রাম প্রসারিত করার তত্ত্ব, নিষ্ঠাবান ও সৎ কমিউনিস্টদের পুঁজিবাদের অনুগামী বলে আখ্যাদান,

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিলুপ্তি, ব্যক্তিপূজায় উৎসাহদান ইত্যাদি মাওবাদী নীতি ও কর্মসূচীর সমালোচনা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য মাওকে পুরোপুরি দায়ী করে এর তত্ত্বগত সিদ্ধান্তকে মার্কসবাদবিরোধী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছে কীভাবে মাও এমন অহঙ্কারী হয়ে ওঠেন, নিজেকে বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্র থেকে এবং জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পার্টির দলিলে। পার্টির ভিতরে ব্যক্তিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মাও-কে দায়ী করা হয়। মাও জেদং-এর ভুলভ্রান্তির জন্য অবশ্য কতকগুলি সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণকে বর্তমান নেতৃত্ব চিহ্নিত করেছেন। মাও-এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে (১৯৮৩) চীনের পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হু-ইয়াওবাং যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন তাতেও তিনি মাও-এর ইতিবাচক দিকগুলির প্রশংসা করে তাঁর ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করেন। চীনের নেতৃত্ব অবশ্য মাও জেদং-এর বৈদেশিক নীতি, বিশেষ করে তিন বিশ্বের নীতি নির্ভুল ছিল বলে দাবী করেন। তবে ত্রয়োদশ কংগ্রেসের রিপোর্ট ও চৈনিক নেতাদের বক্তব্যে ইদানীং মাও জেদং সম্বন্ধে তেমন উল্লেখ পাওয়াযায় না।

৩

বিগত এক দশকে চীনের পার্টি যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা মোটামুটিভাবে কয়েকটি দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে চারটি দলিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: (১) ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটি তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত; (২) ১৯৮১ সালের ২৭শে জুন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব; (৩) কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে (১৯৮০) গৃহীত রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী; (৪) ত্রয়োদশ কংগ্রেসের (১৯৮৭) দলিল ও সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট। এইসব দলিলেই মার্কসবাদের প্রতি চীনের দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি জানানো হয়েছে কিন্তু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের সমস্যা বা সংহতি বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রতিবেদনে চীনের আন্তর্জাতিক নীতির কোন বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। সব দলিলে চীনের সামরিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। বিশ্ব রাজনীতির

পর্যালোচনা, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ ইত্যাদি বিশ্লেষণ দলিল-গুলিতে বিশেষভাবে অনুপস্থিত।

এই দলিলগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াঙের রাজনৈতিক প্রতিবেদন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ (সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট দলের সদস্য প্রায় ১০ কোটি)। কংগ্রেসে প্রদত্ত ঝাও-এর রাজনৈতিক প্রতিবেদন সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সংক্ষেপে দ্বাদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিগত কয়েক বৎসরে সমাজতন্ত্রের দিকে চীনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বলা হয়েছে দেং সিয়াও পিং-এর তাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও আধুনিকী-করণের নীতি অনুসরণ করার ফলে চীনে সমাজতন্ত্রের সাফল্য নিশ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আছে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরের সূত্রায়ন এবং এ সম্বন্ধে পার্টির চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচী। তৃতীয় অংশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রণনীতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কী কী নীতি অনুসরণ করে এবং কোন পদ্ধতিতে চীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোবে তার নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে এই অংশে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে চতুর্থ অংশে বলা হয়েছে চীন পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনীতি ও সামাজিক মালিকানাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহ দিবে। পঞ্চম অংশে রাজনৈতিক কাঠামোতে বিভিন্ন সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ অংশে আছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী ও সংহত করার বিভিন্ন সুপারিশ। সর্বশেষে চীনে মার্কসবাদের অগ্রগতি ও বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ কংগ্রেসের দলিলে "সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তর", ঝাও-এর এই সূত্রায়নকে চীনে মার্কসবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ তাত্ত্বিক সংযোজন বলে দাবী করা হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, বিপ্লবের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর চীনের নানাদিক দিয়ে যখন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে; শোষণব্যবস্থা ও শোষকশ্রেণী চীন থেকে যেখানে বিলুপ্ত হতে চলেছে তখনো চীন সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরেই থেকে যাবে, এটা কি করে সম্ভব? ঝাও তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন, চীনে সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে। এখনো চীনের ৮০ শতাংশ লোক

গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। এক-চতুর্থাংশ মানুষ নিরক্ষর (চীনের বর্তমান জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ)। জাতীয় উৎপাদনের হার অত্যন্ত নিম্নস্তরে। অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনের যন্ত্রপাতি সেকেলে; শতাব্দী না হলেও কয়েক দশক পিছিয়ে রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় যথেষ্ট অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনো অনুন্নত, দারিদ্র্যপীড়িত! ঝাও তাঁর প্রতিবেদনে সেজন্য বলেছেন চীনে দীর্ঘদিন শিল্পোন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ, জনসাধারণের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচী অগ্রাধিকার পাবে।

সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ত্রয়োদশ কংগ্রেসে বলা হয়েছে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারিক ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে পশ্চাদমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বন্দ্বই বর্তমানে চীনের প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্ব। শ্রেণীসংগ্রাম চীনের প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্ব নয়। শ্রেণীসংগ্রাম চীনে হয়তো আরো দীর্ঘদিন চলবে কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাকবে বিশেষ গণ্ডির মধ্যে। সমাজের বর্তমান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবার জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণ ও উপরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার।

ঝাও জিয়াঙ তাঁর প্রতিবেদনে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরে চীনে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে ছ'টি নীতি অনুসরণ করার সুপারিশ করেছেন। এগুলো হল, (১) আধুনিকীকরণ, যা দারিদ্র্য ও পশ্চাদমুখিনতাকে দূর করবে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। (২) ব্যাপক সংস্কার, যা পিছিয়ে পড়া চীন সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিব্যাপ্ত হবে এবং উন্নত সমাজ গঠনের সহায়ক হবে। (৩) মুক্তনীতি, যা বহির্বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও কারিগরি বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে চীনের বিকাশ সহজতর করবে। (৪) পরিকল্পিত অর্থনীতি, যাতে সামাজিক মালিকানার প্রধান ভূমিকা থাকবে কিন্তু বহুস্তরে বিস্তৃত অর্থনৈতিক কাজকর্মের মাধ্যমে অর্থনীতির বুনিয়াদ আরো শক্তিশালী হবে। (৫) সমন্বিত গণতন্ত্র যা ঐক্য ও স্থিতিশীলতার মাধ্যমে চীনকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। (৬) মার্কসবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠায় চীন ব্রতী হবে যাতে অগ্রসর সাংস্কৃতিক মান, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে। স্বভাবতই

সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তর সাময়িক বা স্বল্পকালীন নয়। একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চীনকে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরে থাকতে হবে বলে ঝাও তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন। উৎপাদন শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন না করে, আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ না করে এবং ব্যক্তিমালিকানার পুরোপুরি সামাজিকীকরণ না করে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করা সম্ভবপর বলে ত্রয়োদশ কংগ্রেসে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরকে অনেকে 'নরম' নীতি বলে অভিহিত করেন। এর মাধ্যমে ধনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এই ধরনের আশঙ্কার কোন ভিত্তি আছে বলে চীনা নেতারা মনে করেন না। তাঁদের যুক্তি পরিকল্পিত, সমাজতান্ত্রিক ও সামাজিক মালিকানা এই ত্রিবিধ নীতিকে ভিত্তি করেই চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির রূপরেখা রচনা করা হবে। বর্তমান স্তরে চীনের শিল্পোৎপাদনের মাত্র ২·৪ শতাংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদির মারফৎ হয়ে থাকে। চীন পশ্চিমী অর্থনীতির সূত্র বা এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর কোন গুরুত্ব দেবে না। সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ চীন বেছে নেবে বলে চীনের নেতারা ঘোষণা করেছেন। তা ছাড়া যে রাজনৈতিক ও আদর্শগত পরিমণ্ডলের মধ্যে, যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি দায়বদ্ধতা, কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য, সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরের নীতিগুলি বাস্তবায়িত হবে, তার মধ্যে ধনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের কোন সম্ভাবনা নেই। কৃষি অর্থনীতিতে যে ধরনের সংস্কার-সাধন করা হয়েছে তাতে কোন কোন অঞ্চলে মুষ্টিমেয় চাষীর হয়তো "সম্পন্ন" হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌল গতিধারাকে প্রভাবান্বিত করবে না বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

চীনে বর্তমানে যে আন্দোলন চলছে তার মধ্যে রাজনৈতিক কাঠামোর সংস্কার অন্যতম। পার্টিকে সরকার থেকে পৃথক করার সুপারিশ করে বলা হয়েছে পার্টি ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য না থাকলে পার্টির ভাবমূর্তি মলিন হতে বাধ্য। কমিউনিস্ট পার্টি দেশকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবে, আর্থ-সামাজিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মৌল নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকবে পার্টির। পার্টি হবে জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার যোগসূত্র। সরকারের দায়িত্ব পার্টি নির্ধারিত নীতির যথাযথ ও বাস্তব রূপায়ণের। রাজনৈতিক

ও সরকারী স্তরে কোনমতেই যাতে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা প্রশ্রয় না পায় সেদিকে পার্টি সদাসতর্ক থাকবে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দিকেও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রয়াস চালাচ্ছে। বুর্জোয়া উদার নীতির প্রভাব সম্বন্ধেও জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গড়ে তোলার বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয়। পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা প্রতিটি দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচালিত হয়। নানা বাধা-বিপত্তি ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে চীনকে এগোতে হচ্ছে। চীনের নেতারাও ইদানীং খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন দুর্বলতার কথা বলছেন। পার্টি নেতৃত্বের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অত্যধিক পরিমাণে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার প্রাধান্য, দুর্নীতি, সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করছেন। সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্বন্ধে চীনের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চীনের সমাজ-বিজ্ঞানীরা সমাজতন্ত্রের পথে সোভিয়েতের জয়যাত্রার সপ্রশংস উল্লেখ করছেন। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করছেন। চীনের পত্র-পত্রিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েতের ইতিবাচক ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এক প্রতিনিধিদল চীনের পার্টি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যাচ্ছেন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে চীন প্রয়াসী হয়েছে। ওই প্রবণতাগুলি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি, যুদ্ধ ও শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে চীনের পার্টি বক্তব্য এখনো তেমন স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন বিষয়ে চীনের বক্তব্য সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল ধারার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মাও জেদং এর অনেক বক্তব্য, যা অনেকেই মার্কসবাদবিরোধী বলে মনে করেন, চীনা নেতৃত্ব এখনো সেগুলি অস্বীকার করেন নি। তবুও বিগত এক দশক চীনে

যে পরিবর্তনের আভাস সূচিত হয়েছে তা যথাযথ রূপায়িত হলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেও সমৃদ্ধ করবে এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে—এ আশা করার যথেষ্ট ভিত্তি আছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। Tan Chung : Statesman, ২৩শে, ২৪শে নভেম্বর ও ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭

২। Beijing Review Publications, Beijing
13th National Congress of the Communist Party of China.

৩। William H. Hlnton, Investigating China's New Family Contract System : Monthly Review, Vol 35, No. 6 November 1983

৪। Gilbert Rozmen ; A New Era in Chinese Scholarship : World Politics Vol XXXVII, No. 4 July (1985)

আলোচনা

ভারতে রাজনৈতিক সংকট

এ-সম্পর্কে দুটি মত নীচে ছাপা হল। পাঠকদের মতামত জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মতামত স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

সম্পাদক

সংকটের রাজনীতি—একটি বামপন্থী মূল্যায়ন

দলনেতার সংকট মানে দলের সংকট। দলের সংকট থেকে রাষ্ট্রের সংকট এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে সমগ্র জাতির সংকট আসতে বাধ্য। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ তথা বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংকট কি আন্তর্জাতিক সংকটের পূর্বাভাষ নয়? অকাট্য যুক্তি। সংকট মোচনের দায়িত্ব বিপরীতক্রমে প্রথমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরের, বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের, তারপর সমগ্র দেশপ্রেমী জনগণের, তারপর বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের এবং পরিশেষে যদি সংকটের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে দলনেতার। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামো নেহেরুর আমল থেকে এইরকম ব্যক্তিসর্বস্বতার সংস্কৃতি সযত্নে লালন করে আসছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক আচরণ পর্যালোচনা করেন, তারা এই প্রক্রিয়াটির সাথে সম্যক পরিচিত। স্বাধীনতালাভের পর প্রতি দশ বছর অন্তর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা, শাসক দলের সামনে এসেছে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার সমস্যা। কখনও গণআন্দোলনের চাপে এরা ক্ষমতা হারিয়েছে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে (১৯৫৭য় কেরালা এবং ১৯৬৭তে দেশের আটটি রাজ্য নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকদলের হাতছাড়া হয়েছে), কখনও সারাদেশব্যাপী অস্থিরতার কেন্দ্রেও হয়েছে শাসকদলের পরিবর্তন (১৯৭৭), আর সম্প্রতি শাসকদল ও তার একচ্ছত্রাধিপতি হারিয়েছেন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা। ৫৭, ৬৭,

৭৭ পেরিয়ে ৮৭তে এসে স্বভাবতই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংকট হয়েছে আরও ঘনীভূত, বহুমাত্রিক।

বহু আলোচিত এই সংকটের স্বরূপ কি? প্রশ্নটির উত্তর বেশ জটিল। চেতনাসম্পন্ন যুক্তিবাদী জনমানসে ভারতবর্ষীয় রাজনীতির একটি স্থাবর, সংকটাপন্ন বাস্তব চেহারা প্রতিভাত। এই সংকটের মূলে রয়েছে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণকারী ভূস্বামী ও ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের নির্লজ্জ স্বৈরাচারিতা, স্বল্পমেয়াদী স্বার্থসিদ্ধির নিরলস প্রয়াস, জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে যাবতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধকে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠী-স্বার্থ চরিতার্থ করার অনুকূলে পরিচালিত করা এবং তদুদ্দেশ্যে সবরকম কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও মতান্ধতাকে প্রশ্রয় দান। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে এ জাতীয় রাজনৈতিক আচরণের ফলশ্রুতি হল পাঞ্জাব, ত্রিপুরা ও দার্জিলিং-এর সন্ত্রাস, উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা, বিহারে জাতপাতের মারণ লড়াই এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উগ্র প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতাবাদের উন্মেষ, এর সাথে ক্রমবর্ধমান বুনিয়াদি সমস্যাগুলো তো আছেই। কৃষি উৎপাদনে অচলতা, নথিভুক্ত বেকার তিন কোটির বেশী, নিরক্ষর শতকরা ষাটের উপর, অগুনতি কলকারখানা বন্ধ, মুদ্রাস্ফীতি লাগামছাড়া। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সন্তরের মাঝামাঝি থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতিনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আসছেন অকুতোভয়ে। আড়াই বছরের জনতা শাসন বাদ দিলে, স্বাধীনতার পরবর্তী চল্লিশ বছর একটানা শাসকদল হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশ শাসন করছে। আর এই জাতীয় দলের নেতৃত্ব অলিখিত নিয়মানুযায়ী বর্তেছে নেহেরু পরিবারে। দলীয় কাঠামো ও দলের মধ্যে ক্ষমতার বিতরণ ও বিন্যাস এই পারিবারিক কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে দেশ এবং তার প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে এক ও অভিন্ন সত্তা। রাজনৈতিক স্তাবকতা হচ্ছে শাসকদলে যেকোন পদার্জনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি।

নীতি বিবর্জিত এই পারিবারিক তথা দলীয় শাসনে কোন প্রতিবাদীর স্থান নেই। মাঝে মাঝে দুএকটি ক্ষীণ কণ্ঠে যে প্রতিবাদের সুর শোনা যায়, তার কারণ অবশ্যই বিবেক-তাড়না নয়, কারণ হল দলপতির বিরাগভাজন হয়ে ক্ষমতার আসন থেকে এদের উচ্ছেদ। এভাবেই শাসকদলের রাজনীতিতে

নানা সময় প্রণব মুখার্জি, বিশ্বনাথ প্রতাপ, ভি সি শুক্লা, রামধন প্রভৃতি বিক্ষুব্ধদের আবির্ভাব ঘটে, ইতিপূর্বে যেমন শারদ পাওয়ার, প্রিয়রঞ্জন, এন্টনি প্রভৃতিরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। এরা হলেন 'আবার ডাকিলেই যাইব' এই শ্রেণীর।

এবার শাসকদলের সংকট সম্পর্কিত ভাষ্যটি দেখা যাক। না, চটশিল্পের শ্রমিকরা কর্মাভাবে অনাহারে অর্ধাহারে মারা যাচ্ছে এটা সংকট নয়। পাট-চাষীরা পাটের ন্যায্য দর না পেয়ে দুর্দশার চরমে পৌঁছেছে এটা সংকট নয়। শাসকদলের প্রধান প্রধান অমাত্যরা বিদেশী শিল্প সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বাণিজ্যিক লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন এটাও সংকট নয়। দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার খুঁটিনাটি তথ্য সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে—সেটাও কোন জাতীয় সংকটের পূর্বাভাষ নয়। তাহলে সমস্যাটা কি? তার উৎস কোথায়? শাসকদলের কাছে সমস্যার উৎস হল, রাষ্ট্রপতি সংবিধান সম্মতভাবে প্রধান-মন্ত্রী ও তার অমাত্যবর্গের কাছে জাতি তথা রাষ্ট্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রধান-মন্ত্রীর অনুগ্রহপুষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গের আন্তর্জাতিক চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে তদন্ত দাবি করেছেন। তৃতীয়তঃ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দেশের কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চমৎকারীত্ব ভোটদাতাদের মোহগ্রস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এসব ঘটনাই নাকি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসে হয়েছে। অতএব দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা (Destabilisation) সৃষ্টির চক্রান্ত চলছে। শাসকদলের মতানুযায়ী এই চক্রান্তের মোকাবিলার উপায়গুলি হল: (১) বর্তমান শাসকদল ও তার নেতার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন বা Good conduct certificate, যা ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে, (২) সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে চলতে বলার ধৃষ্টতা দেখাবেন এরকম রাষ্ট্রপতির অপসারণ, সেটিও সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে করে ফেলা গেছে, (৩) বিরোধী দলগুলির ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে নস্যাৎ করে দেওয়া এবং (৪) [illegible]-ব্যবস্থার সেই পুরনো কৌশলটি যেটি নেহেরু থেকে প্রযুক্ত হয়ে আসছে, সেটির পুনরবলম্বন অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা অন্যান্য কিছু বামঘেঁষা, মেকি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর ঘোষণা। এভাবেই জনদরদী, গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী

ও তার সরকার প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী শক্তিগুলিকে পরাস্ত করবেন, অন্ততঃ পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচন পর্যন্ত।

যদি এবম্বিধ ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও পরিস্থিতি শাসকদলের অনুকূলে না যায়, যদি আরও কিছু কেলেঙ্কারি জনগোচরে আসার ফলে শাসক দলের সংকট একই সঙ্গে বিরোধিদেরও সঙ্কটাপন্ন করে তুলছে।

শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান বামপন্থী দলগুলিকেই খুঁজে বের করতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এ কাজ সংসদীয় রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে থেকে করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলার দশ বছরের বেশি সময় ধরে একটি বামপন্থী সরকার তার বিকল্প গণমুখী কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এবং এই সরকার প্রতিষ্ঠার পিছনে দীর্ঘ স্বাধীনতা-পরবর্তী-কালের রাজনৈতিক সংগ্রাম আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকার পরও শতকরা চল্লিশ জন মানুষ এখানে কংগ্রেসকে সমর্থন করে। এদের কোন বিকল্প রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশীদার করা যায় নি এখনও। কিংবা আত্ম-সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে এই বিকল্প সংস্কৃতির ভিত্তি খুব দৃঢ় হয় নি আজও। ভারতবর্ষের অন্যত্র অবস্থা নিঃসন্দেহে আরও শোচনীয়। বামপন্থী রাজনীতিই কংগ্রেসী অপশাসনের একমাত্র বিকল্প হতে পারে—এই প্রত্যয় থেকে স্বভাবতই ভারতবর্ষের বর্তমান বামপন্থী দলগুলির সাংগঠনিক এবং মতাদর্শগত অবস্থানের সমস্যাগুলি বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের শ্রেণীগত ভিত্তি মূলত মাঝারি ও ছোট চাষী, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর এবং শিল্প-শ্রমিক। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইতে এই বিবিধ শ্রেণীগোষ্ঠীর সমন্বয় ও ঐক্য একান্ত জরুরী। অথচ এদের মধ্যে ধর্মীয়, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিকতার ব্যবধান সুগভীর। তদুপরি বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির প্রভাব থেকে এইসব শ্রেণীর এক বিরাট অংশ এখনও মুক্ত নয়। শুধুমাত্র অর্থ-নৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব দিয়ে কিংবা নির্বাচনী প্রচারান্দোলনের ছত্রছায়ায় এদের সংহত করে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি চাই একটি বিকল্প শ্রেণী সংস্কৃতি। যে দলীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ এই সংস্কৃতি শোষিত সমাজে প্রোথিত করবেন, তাদেরও বুর্জোয়া-জমিদারি কিংবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীসুলভ

চেতনা থেকে মুক্ত হতে হবে। ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলির বিভিন্ন সাংগঠনিক দলিলে মধ্যবিত্ত নির্ভরতার উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যবিত্তের ভাষা, সাজপোষাক, আচার আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষের শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষের সাথে মেলে না। সেখানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে মেলবন্ধন সর্বদা সম্ভব কি ?

আত্মসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জাতপাতের বিচার ভারতবর্ষে একটি মৌলিক সামাজিক ব্যাধি। এবং এটি হিন্দু ধর্মের নানাবিধ অযৌক্তিক, বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার অঙ্গ। ভারতবর্ষে শ্রেণীসংগ্রাম সংগঠিত করার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আগুন যদি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয় তাহলে অবশ্যই রাষ্ট্রের দমন নিপীড়নের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে, সংসদের ক্ষমতা আরও সংকুচিত হবে, আমলতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রসারলাভ করবে। ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসবাদ দমন, সাম্প্রদায়িক-জাতপাতের বিরোধ মোকাবিলা এবং কেন্দ্রীয় তথা জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে পুলিশ, আধা সামরিক ও সামরিক বাহিনীকে প্রভূত ক্ষমতাশালী করা হয়েছে। আরওয়াল এবং মালিয়ানার হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি যাদের বিবেকে এখনও ঘা দিচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই রাষ্ট্রযন্ত্রের এই নিপীড়নমূলক ভূমিকাটির গুরুত্ব ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সহজেই বুঝতে পারবেন।

শ্রেণী শাসিত রাষ্ট্রে গণপ্রতিনিধিত্বের যত মনোহারি ব্যবস্থাই থাক না কেন, রাষ্ট্রের এই দমন যন্ত্রটি সদা সক্রিয় থাকে। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকদল যে রাজনৈতিক অস্থিরতার জিগীর তুলে তাদের হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পেতে চেষ্টা করছে, সেটা কার্যকরী না হলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আরেকবার ১৯৭৫ ফিরে আসবে, আরও বেশী অপশাসন নিয়ে। হয়তো তখনও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মোকাবিলা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাত থাকবে।

এই মুহূর্তে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক শাসন (যেটি অবশ্যই বৃহৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের অনুমোদিত) এর বিকল্প একটি গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বিভিন্ন বিরোধী দলগুলি নিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা এখন পর্যন্ত জনমানসে যথেষ্ট আস্থার সঞ্চার করতে পারে নি। রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে কংগ্রেসের

বিরোধী শিবির দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে আছে উগ্র সাম্প্রদায়িক, সমাজতন্ত্রবিরোধী, রক্ষণশীল গোষ্ঠী। অন্যদিকে বামপন্থী শক্তি জোট। কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে এই দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী জোটের সাময়িক সংযুক্তি সম্ভবও নয়, কোনমতেই কাম্যও নয়। এই দুই দৃঢ় মতাদর্শভিত্তিক দলগোষ্ঠী ব্যতীত অন্যান্য দলগুলির কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বা নীতিগত অবস্থান স্থিরীকৃত হয় নি। তার কারণ, এদের বেশীর ভাগই কংগ্রেস রাজনীতিরই অপসৃষ্টি। ক্ষমতার লোভ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি কংগ্রেসী অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই দলগুলি। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজটি বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই অত্যন্ত জটিল। অথচ কংগ্রেসী অপশাসনের অবসান এই মুহূর্তে জনগণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ঘটানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ, আঞ্চলিকতাবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিকশক্তি ভারতবর্ষে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এই ধর্মীয় জাতপ্রথাভিত্তিক অপসংস্কৃতির বিরোধী একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা জাগরণ সৃষ্টি করা কর্তব্য। এই পাল্টা সংস্কৃতির অংশীদার করতে হবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর কৃষি মজুরদের। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে এই আন্দোলন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী তথা প্রগতিবাদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পণ দেওয়া নেওয়া, বহুল অর্থব্যয়ে বিবাহানুষ্ঠান (বিয়ে বাড়ির বাইরে পরিত্যক্ত খাবার নিয়ে মানুষে-কুকুরে কাড়াকাড়ির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন নি এমন ব্যক্তি বিরল), ন্যূনতম মজুরীতে গৃহভৃত্য বা পরিচারিকা নিয়োগ এবং তাদের সাথে প্রভুসুলভ আচরণ করা, বক্তৃতার মঞ্চ ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে না পারা, বিনয়ী না হওয়া প্রভৃতি অকমিউনিস্টসুলভ চেতনা ও মানসিকতা দোদুল্যমান বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের মধ্যে খুব বিরল কি ? সমাজ সচেতনতা বামপন্থী রাজনৈতিক সচেতনতার প্রাথমিক উপাদান। শোষিত শ্রেণীর সচেতনতা গড়ে ওঠে শাসকশ্রেণীর মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিপ্রতীপ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃজনের সংগ্রামের মাধ্যমে। এই লড়াইটা পেছিয়ে দেওয়া বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তি মজবুত করার অনুকূল নয় মোটেই।

এই সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেওয়া এই মুহূর্তে বিশেষ জরুরী। ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে ক্রমবর্ধমান সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে

শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের আন্দোলন ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক জয়ের পটভূমি সৃষ্টি করছে। কিন্তু এর বাস্তবানুগ বামপন্থী মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণে অপারগতা আবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে—'Tragedy' থেকে 'Farce'এ।

অপূর্ব কুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতে বামপন্থীরা ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হতে পারছে না কেন ?

আমার, আপনার বা কারুর ইচ্ছার উপরে সরকারের উত্থান-পতন নির্ভর করে না। একটি সরকারের উত্থান-পতনের পিছনে থাকে কতকগুলি আর্থ-সামাজিক কারণ।

আমাদের দেশে বামপন্থীরা দীর্ঘদিন ধরে ভেবে এসেছে—কংগ্রেস সরকার যেহেতু ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণ করছে,—যার অবশ্যম্ভাবী ফল ধনিকের শ্রীবৃদ্ধি এবং গরীবের সর্বনাশ—যার পরিণতি মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের ক্রমিক অবনতি—সেইহেতু এই সরকার অচিরেই জনপ্রিয়তা হারাবে এবং তার পতন ঘটবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ধনতন্ত্রের পথের কাঠামোর মধ্যেই কংগ্রেস সরকার বিচরণ করেছে, অথচ এই সরকারের পতন ঘটেনি বা ঘটানো সম্ভব হয় নি। ভাবাবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে, কেন এমনটি ঘটেছে তা গভীর-ভাবে বামপন্থীদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে, ভারতে অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথের বেশ কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। ধনতন্ত্রের পথের কাঠামোর মধ্যে বিচরণ করেও কংগ্রেস সরকার কতকগুলি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, যেমন—(১) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে, (২) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মোটামুটি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার নীতি অবলম্বন করেছে, (৩) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বুনিয়াদ বজায়

রাখতে পেরেছে, (৪) জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে—ভারত ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ করলেও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পনের পথ (পাকিস্তানের মত) গ্রহণ করে নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদের প্রেসকিপ্‌সন অনুযায়ী ভারত পুরোপুরি চলতে রাজী নয়। দেশের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে সে সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাহায্যকে কাজে লাগাচ্ছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের ফাঁস গলায় পরে পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পনের পথ গ্রহণ করছে। অপরদিকে ভারত সোভিয়েত সাহায্যের সুযোগ নিয়ে দেশের স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। এই দুই ধারার পার্থক্য সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন।

তবে ভারত সঙ্গতিপূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি অনুসরণ করছে ভাবলে ভুল হবে। ধনতন্ত্রের পথে পরিচালিত হয়ে কোন দেশ সঙ্গতিপূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাটি অনুসরণ করতে পারে না। ভারতের অর্থনীতি বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। বিশ্বব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ. প্রভৃতির সাহায্যের উপর সে বিশেষ নির্ভরশীল এবং সেই সাহায্যের শর্ত হিসাবে তাকে জনগণের উপর নানা ধরণের নিপীড়ণের বোঝা চাপাতে হয়। যেসব শর্তে এই সাহায্য পাওয়া যায় তা অনেক ক্ষেত্রে অপমানজনক, এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষেও ক্ষতিজনক।

তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা ধনতন্ত্রের পথের দৌলতে, স্বাধীনতার পরে, সবচেয়ে লাভবান হয়েছে বৃহৎ পুঁজি, বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গরীব মানুষেরা। জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি আজও দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে।

কি আভ্যন্তরীণ নীতি, কি বৈদেশিক নীতি, ভারত সরকারের উভয় নীতিই ধনতন্ত্রের পথের সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি ও বৈদেশিক নীতি একটি অপরটির পরিপূরক।

কাজেই একদিকে যেমন মনে রাখতে হবে ভারত সরকারের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ এখনও নিঃশেষিত হয় নি, তেমনি আবার এও মনে রাখতে হবে, এই সরকার যে আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করছে তা

জনবিরোধী। এক কথায়, ভারত সরকার দ্বৈত নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

ভারত সরকারের এই দ্বৈত নীতির তাৎপর্য বামপন্থীদের অনুধাবন করতে হবে। এটিকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ ভাবলে যেমন ভুল হবে তেমনি এর জনবিরোধী চরিত্রটি উপেক্ষা করলেও চলবে না। কংগ্রেস সরকারের এই দ্বৈত চরিত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সরল রেখায় চালানো সম্ভব নয়। বৈদেশিক নীতি সমর্থন এবং আভ্যন্তরীণ নীতির বিরোধিতা—এই দ্বৈত ট্যাকটিক্স একটি জটিল প্রক্রিয়া।

সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র-সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, স্বৈরাচারী, জনবিরোধী সরকারের (যেমন, ফিলিপাইনে মার্কোস, পাকিস্তানে জিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি) বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধনতান্ত্রিক পথের মধ্যে বিচরণ করেও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার নীতি, সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করছে—এমনি একটি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক কথা নয়।

ভারতে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও জটিল ও আরও কঠিন, এই কারণে যে কংগ্রেস দলের এক দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কংগ্রেস আন্দোলন একটি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার (গান্ধী ও নেহেরুর নামের সঙ্গে যা জড়িত) উত্তরাধিকার বহন করছে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতের কৃষক সমাজের বিপুল অংশের সমর্থন লাভ করেছিল। নেহেরুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আধুনিক চিন্তাধারা বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল। এই উত্তরাধিকারের বলে কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ভারতের কৃষক ও মধ্যবিত্তের এক বিরাট অংশের সমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। শুধু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বড়, মাঝারি ও ছোট অংশ নয়, কৃষক সমাজের বিরাট অংশ ও মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বড় অংশের উপর এই সরকার তার আদর্শগত প্রভাব (গ্রাম্‌সির ভাষায় যাকে বলা চলে "hegemony") বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এই অবস্থায়, কৃষক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে দীর্ঘস্থায়ী আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে বামপন্থীদের উদ্যোগী হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর আদর্শগত প্রভাবের দিকে তাঁদের নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই কাজটি

আরম্ভ করতে হবে ক্ষমতা দখলের আগে, ক্ষমতা দখলের এটিই হবে অন্যতম পূর্বশর্ত।

আরো মনে রাখতে হবে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক বাম ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হবে। শুধু বামশক্তির ঐক্যের ভিত্তিতে এই কাজ সম্ভব নয়। তবে এটি হবে এমন যুক্তফ্রন্ট যাতে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশঃ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবে—শ্রমিক-কৃষক ঐক্য হবে যার মূল স্তম্ভ।

তাছাড়া, পার্লামেন্টের বাইরে বিপুল কৃষক ও শ্রমিক সমাজের সংগঠিত শক্তি হবে এই যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতার আসল উৎস। এই ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে পার্লামেন্টের ভিতরের সংগ্রাম হবে বাইরের সংগ্রামের পরিপূরক। এক কথায়, পার্লামেন্টের বাইরে ও ভিতরে উভয়বিধ সংগ্রাম পদ্ধতির (extra-parliamentary and parliamentary) সাহায্যে এই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের লড়াই পরিচালনা করতে হবে।

কাজেই এটি এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া—আদর্শগত সংগ্রাম যেখানে রাজনৈতিক সংগ্রামের পিছু পিছু চলবে না, রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, এই কাজে গ্রামসির চিন্তাধারা (the concept of 'hegemony') আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের দেশের বামপন্থীরা এই জটিল প্রক্রিয়াটির সম্মুখীন হতে চান না। তাঁরা অতি-সরলীকৃত চিন্তার ভিত্তিতে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জিততে চান। যাঁরা অতি-বিপ্লবী তাঁরা অতি সশস্ত্র বিপ্লবের কথা মুহুর্মুহু উচ্চারণ করেন, যা এই দেশের বিশেষ অবস্থায় অবাস্তব এবং সেহেতু যা জনগণের সমর্থন পায় না। আরেক অংশে—যাঁরা সংখ্যায় বেশ ভারী—তাঁরা বিপ্লবের কথা বারবার উচ্চারণ করলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।

মোট কথা, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভারতে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম এক বিশিষ্ট চরিত্র গ্রহণ করবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে যেমন বিশ্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হবে, তেমনি দেশের বিশেষ অবস্থাটি (যেটি প্রধান কথা) গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের নতুন কৌশল (tactics)।

শুভব্রত বসু

উপজাতি সমস্যা ঃ আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জাতি সমস্যা সারা দেশ জুড়ে আজ এক বিস্ফোরণের আকার ধারণ করেছে। সংখ্যালঘু জাতি, উপজাতি, যারা ক্ষমতার পাদপ্রদীপ থেকে দূরে তাদের দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আজ তারা সংগ্রামে লিপ্ত। আবার কিছু স্বার্থান্ধ মহল তাদের ন্যায্য দাবীকে ব্যবহার করে তাদের বিপথে চালিত করতে তৎপর। তাই দেশের অখণ্ডতা আজ বিপন্ন। আর তাই রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যারাই দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে আগ্রহী, এই সমস্যার সমাধানের সঠিক পথ খুঁজে পেতে আজ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

লক্ষ্য করার মত যে এই সমস্যা শুধু ভারতের নিজস্ব নয়। এই জাতি সমস্যা এক আন্তর্জাতিক চরিত্র লাভ করেছে। ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে রাঁচীতে অনুষ্ঠিত দেশজ ও উপজাতীয় জনগণ সম্পর্কিত এক সম্মেলন থেকে দেশজ ও উপজাতীয় জনগণের ভারতীয় পরিষদ (The Indian Council of Indigenous and Tribal Peoples) গঠিত হয় এবং তার ফলে এই আন্দোলন কতকগুলি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO), রাষ্ট্র সংঘ (UNO) দেশজ জনগণের বিশ্ব পরিষদ (World Council of Indigenous Peoples—WCIP), দেশজ জনগণের প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও এশীয় পরিষদ (The Pacific-Asia Council of Indigenous Peoples—PACIP) ইত্যাদি।

১৯৫৭ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (ILO) সাধারণ সম্মেলন থেকে স্বাধীন দেশগুলিতে দেশজ ও অন্যান্য উপজাতীয় ও আধা উপজাতীয় জনগণের সংরক্ষণ ও তাদের জাতীয় মূলস্রোতে অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে এক কনভেনশন গৃহীত হয় এবং উক্ত কনভেনশনে সহযোগিতা করে রাষ্ট্রসংঘ, রাষ্ট্র-সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন, রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংগঠন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিঃসন্দেহে দেশজ ও উপজাতীয় জনগণের আন্দোলনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বাধীন দেশগুলির দেশজ উপজাতীয় ও আধা উপজাতীয় জনগণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঐ কনভেনশনে বলা হয়—'জাতির অন্যান্য স্তর অপেক্ষা যাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কম অগ্রসর এবং যাদের অবস্থা (status) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রথা অনুযায়ী বা বিশেষ আইন বা বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইসব জনগোষ্ঠী যাতে স্বাধীনতা ও মর্যাদার আবহাওয়ায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে নিজেদের বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যেসব জমি তারা ভোগ করছে তার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার, তাদের ইচ্ছার বাইরে তাদের স্থানান্তরিত না করার, চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা দানের, মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দান ইত্যাদিরও সুপারিশ করা হয়। আবার জাতীয় সংহতি রক্ষার নামে বলপূর্বক কৃত্রিমভাবে তাদের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করা না হয় সে বিষয়েও সতর্ক করে দেওয়া হয়।

বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালের উপরোক্ত কনভেনশনের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এইসব উপজাতীয় জনগণকে মূল স্রোতধারার অঙ্গীভূত করার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব বিশিষ্টতাকে রক্ষা করার প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের সরকার অনুভব করে। এই কারণে বিশ্ব শ্রম সংস্থার পরিচালন সংস্থা একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে যারা ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার উপস্থিতিতে তাদের সুপারিশ পেশ করে এবং একটি সংশোধিত কনভেনশন ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা হয়।

কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের কাছে আলবার্ণে বন্দরে ১৯৭৫ সালে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এক সাধারণ সভার আলোচনার ভিত্তিতে দেশজ জনগণের বিশ্ব পরিষদ (WCIP) গঠিত হয়। এক আগে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে জর্জ টাউনে একটি বিশ্ব সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত ১৯৭৫ সালের জুন মাসে কোপেনহেগেনে। এইসব প্রস্তুতির ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে আলবার্ণে বন্দরের সম্মেলন থেকে বিশ্ব পরিষদ গঠিত হয় যে সম্মেলনে ২০টি দেশের ৫২ জন প্রতিনিধিসহ ২৬০ জন যোগদান করে। আলবার্ণের সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সম্মিলিত দেশজ জনগণের প্রতিনিধিরা এক ঘোষণা পত্রে পররাজ্যগ্রাসীদের

যারা শৃঙ্খলিত ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে প্রকৃতির কোলে তাদের স্বাধীন উন্মুক্ত জীবনের কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে এবং আবার তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ মানবিক অধিকার ফিরে পাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য কয়েকটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের হাওয়াই দ্বীপের এক সম্মেলন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশীয় পরিষদ গঠিত হয় যার কেন্দ্র হয় হনলুলু। ভারতের দেশজ ও উপজাতীয় জনগণ সম্পর্কিত পরিষদের প্রস্তুতি কমিটির সদস্য এ. কে কিস্কু ও পুণের Centre for Tribal Conscientization-এর নারদ কুলকার্ণি ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশীয় পরিষদের এবং বিশ্ব পরিষদের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৮২ সালের মে মাসে রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এক প্রস্তাব অনুসারে দেশজ জনগণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের একটি working group গঠিত হয়। বর্তমানে ঐ সংস্থা বিশ্ব পরিষদের সাতেরো দফা নীতির ওপর ভিত্তি করে দেশজ জনগণের অধিকার সংক্রান্ত নীতির একটি ঘোষণাপত্র রচনার কাজে লিপ্ত। এই ঘোষণায় শুধু যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তাই নয়, যেটিকে প্রাথমিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সেই সঙ্গে এই ঘোষণায় কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাও রয়েছে যা সংশোধন করা না হলে এইসব দেশজ জনগণ যে জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করে তাদের থেকে বাইরে চলে যাবে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ দেখা দেবে।

বিশ্ব পরিষদের নীতিগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন শুধু দেশজ জনগণের ভারতীয় পরিষদ উক্ত বিশ্ব পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বলেই নয়, এই নীতিগুলি রাষ্ট্রসংঘের working group-এর আলোচনারও ভিত্তি। এই সব নীতি সম্পর্কে আলাপ, আলোচনা, বিতর্ক আমাদের দেশের দেশজ উপজাতীয় জনগণের আন্দোলনের ওপরও প্রভাব ফেলবে।

বিভিন্ন জাতি-উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির এইসব

আলোচনা ও গৃহীত নীতি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং আমাদের দেশের দেশজ উপজাতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রামে এইগুলিকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে তাদের সাহায্য করতে হবে।

[দেশজ ও উপজাতীয় জনগণের আন্তর্জাতিক সম্মেলন (১৯৮৭) সংক্রান্ত একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে লিখিত।]

দীপিকা বসু

গ্রন্থ-পরিচয়

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ—সনৎ রাহা

বইখানির বিষয়বস্তু : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের ভূমিকা। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বইখানিকে এক স্বকীয়তা এনে দিয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা এই বইয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যতগুলি স্রোতধারা ছিল তার প্রত্যেকটি সম্পর্কেই সুবিচার করা হয়েছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস আন্দোলনের মূলস্রোতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্য স্রোতধারাগুলি—যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ, পরবর্তীকালের সশস্ত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টা, বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্রোতধারাগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বইখানিতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এতে আছে পলাশীর যুদ্ধে, সাঁওতাল বিদ্রোহে, সিপাহী বিদ্রোহে, নীল বিদ্রোহে মুর্শিদাবাদের অংশগ্রহণের কাহিনী। আর আছে স্বদেশী আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে ও ভারত ছাড়ো সংগ্রামে মুর্শিদাবাদের যোগদানের কাহিনী। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য : লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা—স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে মুর্শিদাবাদে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে যে গণ আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছিল (যেমন, তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, ২৯শে জুলাই প্রভৃতি) তার ধারাবাহিক ইতিহাস। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে এই অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই ভাবীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের জেলা ইতিহাস রচনায় এগুলি হবে অতি মূল্যবান উপকরণ।

নরহরি কবিরাজ

ভাল মন্দ—কালী বাগ,
শৈব্যা পুস্তকালয়,

আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্য সমালোচকও নই। তাই অনধিকার চর্চা করব না। তবে পাঠক হিসাবে গল্পগুলি আমার ভাল লেগেছে—একথা অকপটে স্বীকার করব।

গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকেই বোঝা যায় ইনি ভিন্ন জাতের লেখক। তাদের জীবন নিয়েই তিনি লিখেছেন যাদের তিনি চেনেন, যাদের জীবন সংগ্রামে তিনি অংশীদার। তাঁর গল্পের চরিত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ ছেলেমেয়েরা, ইস্কুলের শিক্ষক, দোকান কর্মচারী, রিফিউজি বা মধ্যবিত্ত পাড়ায় গড়ে ওঠা কারখানার শ্রমিক, এরা কাজের জন্যই কাজ করে না, কাজের পিছনে একটি উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ায়। দারিদ্র ও সংগ্রাম এদের নিত্য সহচর। তবে সংগ্রাম এদের কাছে খুনোখুনি নয়, উচ্চতর মানবিক গুণে সমৃদ্ধ নতুন জীবন আবিষ্কারের অঙ্গ।

মধ্যবিত্ত চরিত্রের দুটো দিক—একটা অন্যায়কে ভবিতব্য হিসাবে মেনে নেওয়ার দিক অথবা উদ্দেশ্যহীন হয়ে স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দেওয়ার দিক অথবা সমাজকে প্রবঞ্চনার দিক। আরেকটি দিক : নিরন্তর দুঃখকষ্টের মাঝেও জীবনকে আলিঙ্গন করার দিক, আদর্শের জন্যে প্রাণ দেওয়ার দিক, সংগ্রাম ও মানবিক গুণের সহজ সমন্বয়ের দিক।

মধ্যবিত্ত জীবনের এই দুটো দিকই সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে বলেই বোধ করি গল্পগুলি হয়ে উঠেছে সজীব ও সতেজ।

বইখানি বহু পাঠকের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন। আশা করি আমার মত আরো অনেকের গল্পগুলি ভালো লাগবে।

নরহরি কবিরাজ

যে বন্ধুদের স্মরণ করি

ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার ইতিহাস সংক্রান্ত বহু পুস্তক ও প্রবন্ধপত্রের রচয়িতা, আজীবন শিক্ষাব্রতী, 'মূল্যায়নের' নিয়মিত লেখক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রশীদ আল ফারুকী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু গবেষণা গ্রন্থের প্রণেতা, চট্টগ্রামে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, 'মূল্যায়ন'-এর লেখক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মোহাম্মদ ফরহাদ

বাংলাদেশের অন্যতম প্রোজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মেহনতী সংগ্রামী জনগণের নেতা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মৈত্রী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী, 'মূল্যায়ন'-এর শুভানুধ্যায়ী।

কালান্তর

দৈনিক ও সাপ্তাহিক

পড়ুন ও পড়ান

3, Gorky Terrace,

CALCUTTA-17

Cordially invites you

To

ctures, Saminars, Discussions on various aspects of Soviet Life and
viet-Ind an affairs by eminent Soviet and Indian schelars.
ltural programmes by Soviet and Indian artists.
gular Film shows
m shows for children
rary and Reading Hall
e library has books on Soviet Art & Culture, Indo.Soviet friendship,
well as Russian and Soviet Literature and popular works on Science,
riculture and Technology in English and in various Indian languages.
rary and Reading room open in all week days except Sundays.
ming : 10 a. m. - 7 p. m. (Regular) ; 3 p. m. - 7 p. m. (Saturday)
st Friday of the month - Sanitary day.

CLUB ACTIVITIES

Peace and Solidarity Forum

PY OF KNOWLEDGE FOR EVERY HUMAN BEING
to of Indo Soviet Council of Educational Development for Children and Youth.

EVERYTHING ABOUT THE SOVIET UNION JOIN
w News Club, Soviet Women rs' Circle, News from Ukraine nds Circle, Radio Moscow & Tashkent Listeners' Circle.
nesday, Wednesday & Friday 6 -8 p.m.)

TH IS WELCOME TO JOIN Youth Guild
ma, Music, Dance, Seminar, Sports Monday Friday 5.30—7.30 p.m.)

CINEMATOGRAPHY FOR PEACE & PROGRESS JOIN Eisenstein Cine Club
day & Thursday 6—7.30 p.m.)

RESS FOR PEACE &

COLLECT STAMPS * STRENGTHEN INDO SOVIET FRIENDSHIP JOIN
Indo Soviet Philatelic Club
Every Friday 5 7 p.m.)

LANGUAGE FOR FRIENDSHIP JOIN
Moitree
(Wednesday 5—8 p.m.)

RAINBOW OF SONGS AND MUSIC JOY
Raduga Choir Group
(Wednesday 5 7 p.m.)

TO PROMOTE THEATRICAL UNDERSTANDING JOIN
Lebedev Drama Circle
Tuesday & Friday 6—7.30 p.m.)

RHYTHMS AND MELODIES OF SONGS AND MUSIC IN
Rimskiy Korsakov
Music Saloon

যুব সমীক্ষা

গ্রাহক হোন ও পড়ুন

ভারতীয় যুব সমাজকে সোভিয়েত যুব সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা ও কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত করানোর সচিত্র মাসিক পত্রিকা এই যুব সমীক্ষা ১৯৮৮-র জানুয়ারী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে যে পুনর্গঠনের কাজ চলেছে, সারা দেশে যে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার খোলা হাওয়া বইছে, তারই আলোকে সোভিয়েত যুব সমাজের আজকের মানসিকতা, আশা নিরাশা, আনন্দ বেদনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা চিন্তার আনুপূর্বিক পরিচয় প্রদান এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। আজকের আধুনিক তরুণ কবিদের দুঃসাহসী কবিতা, আভাঁগার্দ শিল্পীদের চিত্রকলা, শখের রক ও পপ গায়কদের গান, তরুণ দম্পতির সংসার জীবন, উচ্চ পদে আসীন তরুণদের কাজকর্ম, অগ্রজের চোখে অনুজ, অনুজের চোখে অগ্রজ, আধুনিক চলচ্চিত্র ও ক্রীড়া জগতের হাল আমলের ফ্যাশন—এসবই জানতে পারবেন এই পত্রিকাটি থেকে। এ ছাড়া পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সোভিয়েত ও ভারতীয় যুব-সমাজের মৈত্রীর সার্থক প্রসার। যুব সমীক্ষার জন্যে যেসব গ্রাহকের তিন বছরের চাঁদা আমাদের দপ্তরে জমা পড়বে, তাঁরা ১৯৮৮-র একটি সুন্দর বহুবর্ণ ক্যালেণ্ডার উপহার স্বরূপ পাবেন। ক্যালেণ্ডারের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত, সুতরাং অবিলম্বে গ্রাহক হোন। শনি ও রবিবার বাদে যে কোন কাজের দিন (শুক্রবার হাফ ডে পর্যন্ত) বেলা চারটের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন।

সোভিয়েত দেশ

১৮ প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি
(বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড)
কলিকাতা-৭০০ ০১৯
টেলিফোন : ৪৭-৭৫৬৪/৪৭-৭৬৬৬

প্রকাশন ১০ বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯ দাম : পাঁচ টাকা

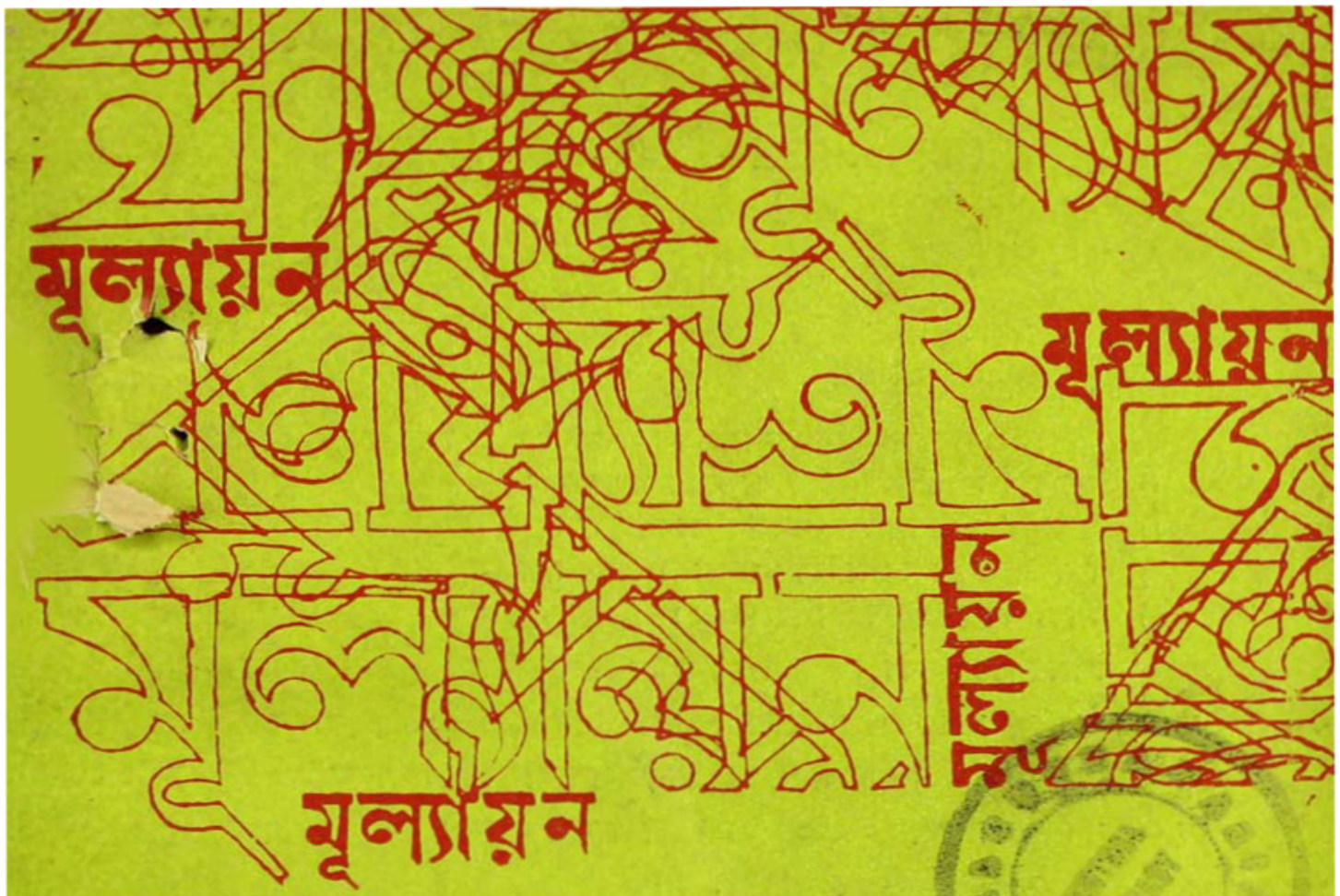

ভারতের জাতিসত্তার সমস্যা / জাতীয় সংহতি ও আদিবাসী সমাজ / জাতীয় সংহতি ও জনজাতি / জাতি ও উপজাতি বিকাশের গোটাকয়েক কথা / ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা / বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন / মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীর দায় / পেরেস্ট্রোইকা ও গ্লাসনস্ত / বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন ধারা / বুখারিনের পুনর্বাসন / প্রসঙ্গ : গ্রামশ্চি / কার্লমার্কসের বিজ্ঞান ভাবনা / কাজী আবদুল ওদুদ : অসাম্প্রদায়িক অনুপ্রেরণা / দ্বান্দ্বিক প্রবাহে প্রাচীন মনীষা / দি ন্যাশনাল পেপার / রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্যাসিবাদ।

শারদীয়
১৩৯৫

দাম : বারো টাকা

নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০ ০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সহজ মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ক) এইচ, এম, টি. ইন্টার ন্যাশানাল। এসকটস। মিৎসুবিশি ট্রাকটরস্
খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।
গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।
ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।
ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২০-২৩১৪-১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস ঃ

২৪-পরগণা (দক্ষিণ)	:	১৪, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
,, (উত্তর)	:	৪২ ই কে. এন. সি. রোড, বারাসাত
হুগলী	:	সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, পুরসুরা / চুঁচুড়া
বর্ধমান	:	সদর ঘাট রোড, জি, টি, রোড, মেমারি, বর্ধমান | ১, বি. সি. রোড
বাকুড়া	:	লালবাজার, বাকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	:	সুভাষ নগর, মেদিনীপুর
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	:	পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পো: পাঁশকুড়া
বীরভূম	:	সিউড়ি
মালদা	:	মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	:	১৬, শহীদ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	:	'সবারি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং	:	বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি / মাটিগাড়া
কুচবিহার	:	এন, এন. রোড, কোচবিহার / দিনহাটা
পুরুলিয়া	:	নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া
নদীয়া	:	১/১, এম. এম. ঘোষ ষ্ট্রীট, নদীয়া

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন

বহু জাতি, সম্প্রদায় ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের দেশ। আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবার জন্য নানা বিভেদকামী শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সুতরাং জাতিগত ভাষা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক সমস্যা এবং বৈষম্য তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোগের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এই সকল সমস্যা যাতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করে সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৫৪৩/৮৮

অধিক জমিতে
সেচের ব্যবস্থা করে
আপনার ফসল বাড়ান

নিম্নোক্ত মুখ্য লক্ষ্যগুলি হাতে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম ১৯৭৯ সাল থেকে তার যাত্রা শুরু করেছে :

(১) গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নির্মাণ, সংস্থাপন, নির্বাহ এবং তা যথাযথভাবে কার্যাকরী ও পরিচালনের ব্যবস্থা করা।

(২) গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সংস্থাপন করা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৫, মুস্তাক আহমেদ স্ট্রীট (পূর্বতন মার্কুইস স্ট্রীট)

কলিকাতা-৭০০ ০১৬

ফোন : ২৪-৫৮০৬, ২৪-০০৮১, ২৪-৬২০৬

Just Published

GANDHI NEHRU

Through

Marxist Eyes

by

Narahari Kaviraj

MANISHA GRANTHALAYA

4/3B Bankim Chatterjee Street,

Caleutta-73

WITH COMPLIMENTS FROM :

East India Pharmaceutical Works Limited.

CALCUTTA-700 071.

জাতি বিভিন্ন / রক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর / পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With Best Compliments of :

M/s. Metal Engineers

18/26, Ballygunge Place East
Calcutta-700 019
Phone : 26-6696

With Best Compliments of :

Premier Construction Co.

7A, Hospital Street,
Calcutta-72

উষ্ণ প্রস্রবণে

স্নানের আরাম উপভোগ করুন

বক্রেশ্বরে

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ আরোগ্যনিকেতন বক্রেশ্বরে। কলকাতা থেকে মাত্র ২২৯ কিলোমিটার দূরে সতীপীঠ বক্রেশ্বর।

এখানকার ট্যুরিস্ট লজে উঠুন। পছন্দসই ঘর এবং খাবার পাবেন স্বল্প খরচে। ডর্মিটারীর ব্যবস্থাও আছে। এখান থেকে শান্তিনিকেতন, কেঁদুলি, তারাপীঠ, মশানজোড় এবং নানুর ঘুরে আসতে পারেন।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বি-বা-দী বাগ (ইস্ট) কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন—২৮-৫১৬৮, ২৮-৫৯১৭

গ্রাম :—TRAVEL TIPS

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৫৪৩।৮৮

'রূপা'র বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাগেশ্বরী
শিল্প-প্রবন্ধাবলী
শিল্প-কথা ॥ ৪০.০০

কালীপদ সরকার
ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী
চরিত-কথা ॥ ৩০.০০

বাণভট্ট / প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
কাদম্বরী
উপন্যাস ॥ ৩৫.০০

আবুল বাশার
মাটি ছেড়ে যায়
গল্প-সংগ্রহ ॥ ২৫.০০

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

To Strengthen Steel. It needs Ferro alloys. With varieties we are here. It only needs your choice.

L. C. Alloys Private Limited.

Head Office : **27, Mirza Ghalib Street, Calcutta-700 016**
Phone : 21-2740. 24-3068
Regd. Office ; **D. D. A. Industrial Plots, Karangapara Road, Durgapur-713201 Phone : 5838**

Please Ask to :

M/s. Amulya Enterprises

For : Contractor for G. M. & C. I. Cocks & Valves, G. I. & Steam Pipe Fittings Nuts & Bolts.
Hardware goods and general order suppliers.
SREE DURGA BHAVAN
J. K. Paul Lane, Durgapur-713213
Phone : 3431

Space Donated by :

Rajen Gupta (Pappu)

পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা

আমাদের দেশ ও সমগ্র বিশ্ব — শোভন ৫০ টাকা

মিখাইল সের্গেইভিচ গোর্বাচেভ — সুলভ ৩০ টাকা

"পেরেস্ত্রোইকা বা পুনর্গঠন বলতে কী বুঝি? আমাদের এটা চাই কেন? এর বিষয়বস্তু আর লক্ষ্যগুলোই বা কী? এ কোনটা বর্জন করছে আর কোনটাইবা সৃষ্টি করছে? এর অগ্রগতি কেমন কেমন হচ্ছে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্ববাসীর জীবনে এর ফলাফলই বা কি হতে পারে?" গোর্বাচেভ

এ সব প্রশ্নের উত্তর বইটিতে পাবেন

মনীষা গ্রন্থালয়

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

With Best Compliments From :

Eastern Railway Catering

At

Dhanbad

With Best Compliments From :

SONU BAKERY

Gaya, (Bihar)

With Best Compliments From :

Kumar Karina Stores

Govt. Railway and General orders supplier of food.

New Market

Patna (Bihar)

With Best Compliments From :

RITA ICE CREAM

Govt. Railway and General Order Supplier of Ice Cream.

Maldaha, Varanashi

(U. P.)

শারদোৎসবে বাংলার তাঁতের কাপড়

এই উৎসবের

মরসুমে কেনাকাটার

বিষয়ে একটু

অন্যরকম ভাবুন না !

বাংলার হস্তচালিত তাঁতের কাপড় আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। রঙে, বুননে, নকশায় অনন্য। যন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক উৎপাদন নয়, মানুষের সহৃদয় ছোঁয়ায় উজ্জ্বল।

বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার থেকে বেছে নিতে পারবেন নিজের পছন্দসই জিনিসটি আছে বালুচরী, জামদানী, টাঙ্গাইল, ধনেখালি ও অন্যান্য শাড়ির সমারোহ। তাছাড়া মর্যাদাপূর্ণ খদ্দরের শাড়ি। আছে সালোয়ার ও কুর্তার হরেকরকম কাপড় এবং পুরুষদের জন্য রুচিসম্মত পলিয়েস্টার সুটিং ও শার্টিং। আর রয়েছে বেডশিট, বেডকভার ও পর্দার কাপড়। ঘর সাজানোর জন্য পাবেন চর্ম, ধাতু ও মৃৎশিল্পের আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন।

হস্তশিল্পজাত সামগ্রী কেনবার সিদ্ধান্ত নেওয়া মানেই আপনি আপনার বিশিষ্ট রুচির পরিচয় দিতে চলেছেন। আর সেই সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অগণিত শিল্পীদের দিকে, আপনার সিদ্ধান্ত তাকে স্বনির্ভরতার পথে আরো একটু এগিয়ে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই এস এ ৪৫৪৩/৮৮

Our tribute :

Be moral, be brave, be a heart whole man—strictly moral, brave unto desperation. Don't bother your head with religious theories ; cowards only sin, brave men never. Try to love anybody and everybody.

—Swami Vivekanand

From : For Gift Articles

Esdi Sales & Service

23/42 Gariahat Road, Calcutta-700 029

With Best Compliments From :

M/s. P. M. Bakery

Bread. Biscuit and Bakery Products Suppliers / of Eastern Railway and Govt.

Mughalsari (U.P.)

তন্ত্রশাস্ত্র ও দর্শন

গোপীনাথ কবিরাজ : তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত (১ম ও ২য়) প্রতি খণ্ড	২০·০০
মৃণালকান্তি ভদ্র : অস্তিবাদ ঃ গাঁ পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য	৪০·০০
ডঃ সুধীর কুমার নন্দী : দর্শন জিজ্ঞাসা	৫০·০০
সুধীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন প্রস্থানে বৈষ্ণব সাধনার ধারা	৩৫·০০
রামচন্দ্র অধিকারী : শ্রীবিজ্ঞান-ভৈরব	৮·০০
স্বামী বিদ্যারণ্য : বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ ৩৫·০০ ব্যাস দর্শন	যন্ত্রস্থ
কালিদাস ভট্টাচার্য : ভারতীয় সংস্কৃতি ও অলেকান্ত বেদান্ত	১০·০০
নন্দদুলাল গঙ্গোপাধ্যায় : সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন ঃ জীবন ও দর্শন	১৮·০০
কালী কুমার মিত্র : চিদ্বিজ্ঞাননিঃশ্রেয়সম্	১০·০০
অনির্বাণ : উপনিষৎ প্রসঙ্গ [ঈশোপনিষৎ]	১০·০০
[ঐতরেয়োপনিষৎ]	১২·০০
[কেনোপনিষৎ]	১৫·০০
[কঠোপনিষৎ]	যন্ত্রস্থ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রকাশন শাখা), বর্ধমান-৭৩১ ১০৪

With
Best
Compliments
From :

A WELL WISHER

With Best Compliments From :

INDIAN ROADWAYS CORPORATION

H. O. 1 SUNYAT SEN STREET
CALCUTTA-700 012

Phone Nos. : 26-5110
26-5111
26-5112

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের

সর্বশেষ গ্রন্থ ঃ

মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি

(সারস্বত লাইব্রেরী)

মূল্যায়ন

বর্ষ ২৪

শারদীয়

১৩৯৫

সূচী পৃষ্ঠা

ভারতে জাতিসত্তার সমস্যা ও বামপন্থীদের কর্তব্য /
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১

জাতীয় সংহতি ও আদিবাসী সমাজ /
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ১৯

জাতীয় সংহতি ও জনজাতি / এন. জি. বসু ২৬

দার্শনিক প্রবাহে প্রাচীন মনীষা / দীপক ভট্টাচার্য ৩১

প্রসঙ্গ গ্রামশচি / শোভনলাল দত্তগুপ্ত ৫২

প্রসঙ্গ : দি ন্যাশনাল পেপার / অমর দত্ত ৬২

প্রসঙ্গ : জাতি ও উপজাতি বিকাশের গোটাকয়েক কথা /
মাণিক সরকার ৭৯

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ১৯৪৮-১৯৬৯ /
রণেন সেন ৮৫

কাজী আবদুল ওদুদ : অসাম্প্রদায়িক অনুপ্রেরণা /
অপূর্ব কুমার রায় ১০১

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন /
নরহরি কবিরাজ ১১৪

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশতম সম্মেলনের
আলোকে পেরেস্ট্রোইকা ও গ্লাসনস্ত /
রথীর দাশগুপ্ত ১২৭

বুখারিনের পুনর্বাসন সম্পর্কে / রণজু ঘোষ ১৪০

মধ্য শ্রেণী বুদ্ধিজীবীর দায় / দাশু রায় ১৪৭

কার্ল মার্কসের প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান ভাবনা /
প্রদীপ বক্সী ১৫৭
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্যাসিবাদ /
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৭৫
বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন : বিকাশমান সংহতি ও
কয়েকটি প্রশ্ন / সত্যব্রত দত্ত ১৮৮

উপদেষ্টামণ্ডলী :
**রণেন সেন, সুশীল জানা, নির্মাল্য বাগচী,
রণধীর দাশগুপ্ত, সত্যব্রত দত্ত।**

সম্পাদক : **নরহরি কবিরাজ**

সহ-সম্পাদনা : **দীপিকা বসু**

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত ও ১০ বঙ্গেল রোড, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত।

ভারতে জাতিসত্তার সমস্যা ও বামপন্থীদের কর্তব্য

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতিসত্তার প্রশ্নটিকে ঘিরে আজ দেশের মানুষের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নেও আমরা সাধারণ মতৈক্যে পৌঁছুতে পারছি না। কেন এই ব্যর্থতা তা পর্যালোচনার আগে সম্ভবত প্রতিক্রিয়াগুলির স্বরূপ অনুধাবন করা প্রয়োজন। প্রথমত, সাধারণ অশিক্ষিত খেটে-খাওয়া মানুষজনের কথাই ধরা যাক। অসমীয়া, পাঞ্জাবী, নেপালী বা নাগা জাতিসত্তার প্রশ্নগুলি তাদের কাছে এক বিজাতীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎস বলেই প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে এর পরেই আসেন বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শে প্রভাবিত শ্রমিক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এক বিমূর্ত অদ্বৈত ধারনার বশবর্তী হয়ে এঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য যে কোন ভাষাগত গোষ্ঠী বা জাতিসত্তার স্বাধিকারের আন্দোলনকে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলে গণ্য করেন। এঁদেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ আবার বৃহৎ জাতিগর্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যে কোন জাতিসত্তার আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রকাশের পথরোধ করতে চান। এমনকি প্রয়োজনে বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নিতেও তাঁরা পিছপা নন। তৃতীয়ত, বিভিন্ন মত ও পথের বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও মানুষের কথাও অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। এটা অনস্বীকার্য যে এই অংশের রাজনৈতিক অবস্থানের তাত্ত্বিক গুরুত্ব অসীম। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিক্রিয়া বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন বলেই এই সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান তাঁদের তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকভাবে আজ এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্যবাদী ভাবাদর্শই পারে জাতিসত্তার প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করতে। তাই বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্ট রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্ব বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু মুসকিল হল এই যে, ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যেও এ সম্পর্কে 'নানা

ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মত বৈচিত্র্য প্রকট হয়ে উঠেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগলেও এটা ঘটনা।

সাধারণভাবে যাঁরা মার্কসবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের একাংশ বহুক্ষেত্রেই বুর্জোয়া মানসিকতার দাস হয়ে পড়েন। কাগজে কলমে স্বীকার না করলেও এঁরা অনেকেই যে 'উন্নত' জাতিসুলভ অনুকম্পার দৃষ্টিতে তথাকথিত 'ছোট' জাতিসত্তাগুলির দাবিদাওয়াকে অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলে মনে করেন তা দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই। তবে এরকম বিকৃত-মস্তিষ্ক 'মার্কসবাদী' বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিশেষ সমস্যা নেই। যথার্থ সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন মতাদর্শগতভাবে মার্কসবাদে নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তি ও দলগুলির মধ্যে মতানৈক্যের সঞ্চার হয়। আর সব দেশের মত ভারতেও এ ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দেশে জাতিসত্তার প্রশ্নে মার্কসবাদীদের মধ্যেই অন্ততঃ দুটি মূল দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। এর একদিকে রয়েছে সেইসব দল (যেমন সি. পি. আই, সি. পি. আই. এম), আর, এস. পি, এস. ইউ. সি. আই ইত্যাদি) যারা সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সাপেক্ষে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই কিছু সংশোধনের মাধ্যমে ও গণতান্ত্রিকতার প্রসার সাধন করে জাতিসত্তাগুলির বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে চায়। অন্যদিকে রয়েছে সি. পি. আই (এম. এল) সহ বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠী যারা বিভিন্ন জাতিসত্তার সংগ্রামকে শ্রেণীসংগ্রামের পরিপূরক বলে মনে করে এবং বহু-জাতিক ও বহুভাষিক ভারতবর্ষের জাতিসত্তাজনিত সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ হিসেবে লেনিন-রচিত বিখ্যাত 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' তথা বিচ্ছিন্নতার অধিকার স্বীকার ও প্রয়োগ করার কথা প্রচার করে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কতদূর প্রযোজ্য তা নির্ণয় করে বামপন্থী আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

২

ভারতের জাতিসত্তা-সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রথমেই যে কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন তা হল এই যে, যে-কোনও উন্নয়নশীল দেশের মত আমাদের দেশেও এটি একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত Critical Remarks on the National Question শীর্ষক প্রবন্ধে লেনিন একটি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন : "জাতি সমস্যার ক্ষেত্রে বিকাশমান পুঁজিবাদ দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত। প্রথম প্রবণতা হল জাতীয় জীবনের ও জাতীয় আন্দোলনের জাগৃতি, যাবতীয় জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং জাতি-রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় প্রবণতা হল বিভিন্ন রূপে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, পুঁজির ও সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবনের এবং রাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা" (Lenin ; Questions of National Policy, Progress Publishers, Moscow, p. 20)। লেনিনের মতে এই দ্বিবিধ প্রবণতাই পুঁজিবাদের সর্বজনীন নিয়ম। বিকাশের প্রাথমিক পর্বে পুঁজিবাদ যদি প্রথম প্রবণতাটির জন্ম দেয় তবে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজেই দ্বিতীয় প্রবণতা কার্যকরী হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয় নি। শুধু তাই নয়, এখানে আমরা একই সঙ্গে দুটি প্রবণতাকেই কার্যকর দেখি। তার ফলে সমস্যা যুগপৎ জটিল ও সরল হয়ে উঠেছে। জটিল এইজন্য যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের ও ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন জাতিসত্তার মধ্যে স্বকীয়তার সঙ্কট-জনিত স্বাধিকারের দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। আর সরল এই কারণেই যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রাভিগ শক্তিসমূহের শক্তিবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন জাতিসত্তা ক্রমাগতই আরও বেশী করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ব্রিটিশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় জাতিসত্তাসমূহের বিকাশের সূচনা হয়। বাঙালী, ওড়িয়া, অন্ধ্র, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি ভাষাগত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সমাজ-বিকাশের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধানও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক সমাজে দেশজ পুঁজিবাদের স্বাধীন বিকাশের সকল পথ রুদ্ধ থাকায় পাশ্চাত্যের 'নেশন্' অর্থে জাতি বিকাশের প্রক্রিয়াটি এখানে একটু ভিন্ন রূপ নেয়। কারণ প্রতিটি ভাষাগত, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত বা রক্তসম্বন্ধীয় জন-গোষ্ঠীকে এক বিদেশী পুঁজিবাদী শক্তির মোকাবিলা করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে। ফলে কোন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর পক্ষেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বৃহৎ জাতিসুলভ একাধিপত্য কায়েম করা সম্ভব হয় নি। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, জাতি-রাষ্ট্রিকতার বাহক কোন উৎপীড়ক বা শোষক জাতির আবির্ভাব ব্রিটিশ ভারতে

হয় নি। বরং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সমবেতভাবে অংশ-গ্রহণের ফলে বাঙালী, মারাঠি বা তামিল ইত্যাদি খণ্ডিত জাতিসত্তার উপরে এক সর্বভারতীয় জাতিসত্তার উদ্ভব হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা-লাভ রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিধায়ক দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির শক্তিবৃদ্ধিরই পরিচায়ক।

তবে বিবিধের মাঝে ঐক্যের মহান বাণী বহুবার উচ্চারিত হলেও সর্বভারতীয় জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন যে অনেকটাই অলীক, দেশভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতাই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যাই হোক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতা সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষ ছড়াতে সক্ষম হলেও স্বাধীন ভারতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পথ অনুসৃত হওয়ার ফলে ঐক্য-সঞ্চারী দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। সর্বভারতীয় পুঁজিবাদের শম্বুকগতিতে হলেও দৃঢ় পদক্ষেপ এই প্রক্রিয়াকে সাহায্যই করেছিল।

দেশ যখন স্বাধীন হল তখন জাতীয় পরিস্থিতি কম জটিল ছিল না। একদিকে যেমন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার অন্তর্গত জনগোষ্ঠীগুলি ছিল প্রায় অগুণ্‌তি, অন্যদিকে পুঁজিবাদের অসমবিকাশের ফলে জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক অবস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। বাঙালী, মারাঠি বা তামিলদের মত পূর্ণ বিকশিত জনগোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি মাগধী, রাজস্থানী, তেলেগু বা পাঞ্জাবীর মতো বিকাশমান জাতীয় জনসম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। আবার এদেরই সতীর্থ হিসাবে উপস্থিত ছিল সভ্যতার নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়, যাদের অনেকেরই ভাষা বা সংস্কৃতিও তখনো পর্যন্ত নির্দিষ্ট কাঠামো প্রাপ্ত হয়নি। এমতাবস্থায় স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতিসত্তার সমস্যা যে একটি বিশেষ জটিল রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ পরাধীন দেশে যাদের সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সাম্রাজ্যবাদী জোয়ালে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল, স্বাধীনতার পরিবেশে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হতে বাধ্য। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটি অন্যতম শর্ত হল জাতিসত্তাসমূহের সমানাধিকার ঘোষণা এবং এক বা একাধিক জাতির বিশেষাধিকারের অবসান। আর একটি আবশ্যিক শর্ত হল প্রতিটি জাতিসত্তা যাতে নিজস্ব জীবনধারার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক পরিচালনার অধিকার অর্জন করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের আদর্শে রচিত ভারতীয় সংবিধানে অন্তত আনুষ্ঠা-

নিকভাবে জাতিসত্তাসমূহের সমতার নীতি স্বীকৃত হয়। সকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করার অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণাও করা হয়। এছাড়া তপশীলী উপজাতিদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং (কেবলমাত্র আসামে হলেও) উপজাতিপ্রধান এলাকায় স্বায়ত্তশাসিত জেলা ও আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কিন্তু সাংবিধানিক আইনী সাম্যের সঙ্গে বাস্তব সমাজ-জীবনের সাম্যের বিস্তর প্রভেদ। জাতিসত্তার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। স্বাধীনতার শুরু থেকেই পূর্ণ বিকশিত বা উন্নত জাতিসত্তার সঙ্গে অর্ধবিকশিত বা অনুন্নত জাতিসত্তার সংঘর্ষ জাতীয় জীবনে আসন্ন ঝড়ের সংকেত বহন করে আনে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। বল্লভভাই প্যাটেল বা জওহরলাল নেহেরুর মত অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে কেবলমাত্র ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করা হলে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিরা বাড়তি উৎসাহ পেয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন করে তুলবে। এখনো অনেকে এই আশঙ্কাকে সঠিক মনে করেন। যেমন, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। কিন্তু একথা আজ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে ১৯৫৬ সালে এই নীতি গৃহীত না হলে দেশজুড়ে অশান্তি বাড়ত বৈ কমত না। তবে একথাও ঠিক যে বহুভাষিক রাষ্ট্রই বাস্তব-সম্মত। কিন্তু ইতিহাস এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, যেকোন জাতিসত্তার বিকাশের ও আত্মপ্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল তার ভাষা। তাই বিশ্বের সর্বত্রই জাতীয় জনসমাজ গঠনের মূলে ভাষারই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। অতএব, নীতিগতভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে অতীতের বিদর্ভ বা তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবি বা বর্তমানের গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই প্রশ্ন মনে জাগায় : এর শেষ কোথায় ?

প্রসঙ্গত, সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা খুব সঙ্গত কারণেই এসে পড়ে। কারণ বহুজাতিক সোভিয়েত ইউনিয়নে অঙ্গ রাজ্য, স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্ব-শাসিত প্রদেশ ও জাতীয় অঞ্চল ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ছোট-বড় বিভিন্ন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে আমাদের দেশেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল অভিজ্ঞতাকে আমরা অবশ্যই কাজে লাগাতে পারি। তবে আমরা যদি সোভিয়েত সমাজ-

তন্ত্রের অঙ্গসংস্থানটিকে বাদ দিয়ে তার যুক্তরাষ্ট্রীয় উপরিকাঠামো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে যাই তাহলে গোড়াতেই গলদ থেকে যাবে। তাহলে কি যতদিন এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন আমাদের কিছুই করার নেই ? অনেক 'বিশুদ্ধ' মার্কসবাদীর মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্তাকে ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতার অধিকার সহ স্বশাসনের অধিকার প্রদান করলেই জাতিসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট। লেনিন বলেছেন, যেকোন সামাজিক প্রশ্ন অনুসন্ধানের একটি আবশ্যিক শর্ত হল তাকে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্ব ও নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট সামাজিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিচার করা। এই কারণেই রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশেষ পরিস্থিতিতে লেনিন তাঁর 'আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব' পেশ করেন. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তিনি একটি 'নেতিবাচক দাবি' বলে ঘোষণা করে বলেন যে, কোনও বিশেষ জাতির অপর কোনও জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সুযোগ সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর নয়। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ তার শ্রেণীসংগ্রামে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকেও সে তার স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই সমর্থন করে। সুতরাং নীতিগত-ভাবে এই দাবিকে স্বীকার করা আর তাকে কার্যকর করার মধ্যে পার্থক্য টানার প্রয়োজনীয়তা লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন এবং যেখানে কোন প্রাধান্যকারী জাতিসত্তা বিশেষাধিকার ও সুবিধা দাবি করে ও অন্যান্য জাতিসত্তাকে উৎপীড়ন করে একমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে পুলিসী প্রশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন (Lenin : The Right of Nations to Self Determination দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তিনি ত হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন জাতিসত্তা যখন একটি রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন মার্কসবাদীদের উচিত বিকেন্দ্রীকরণের চেয়ে কেন্দ্রীকরণকেই সমর্থন করা। কারণ মধ্যযুগীয় অনৈক্য থেকে অগ্রবর্তী বুর্জোয়া রাষ্ট্রই ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করবে (Lenin : Critical Remarks on the National Question দ্রষ্টব্য।)

তাহলে দেখা যাচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে লেনিন নিজে কখনোই নিঃশর্তভাবে উপস্থিত করেন নি। তাছাড়া প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার জাতিসত্তাগুলির শ্রমজীবী মানুষের তথা ব্যাপক জনগণের [illegible] বিচ্ছিন্নতার অধিকার

নীতিগতভাবেই মেনে নিতে হয়েছিল। তা না হলে ঐ সব জাতিসত্তাগুলির আন্দোলন বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনের চোরাবালিতেই নিমজ্জিত হত। একথা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে লেনিনের কথারই প্রতিধ্বনী করে বলতে হয় যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী যখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরেই রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে (যদিও সমস্ত ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নয়) তখন তাদের মধ্যে নতুন করে বিচ্ছিন্নতার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সঞ্চার করা প্রলেতারীয় আন্দোলনের সামগ্রিক স্বার্থের অনুকূল হবে না। একথা যেমন সত্য যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনই এই জনগোষ্ঠীগুলিকে একই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে থাকতে বাধ্য করেছে, তেমনি একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বিকাশমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে এদের মধ্যে অর্থনৈতিক নিবিড়-শীলতাও ক্রমবর্দ্ধমান থেকেছে। তাছাড়া এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে পুঁজিবাদী বাজারের সম্প্রসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও পণ্য চলাচল বৃদ্ধির কারণেই সুপ্ত জাতিসত্তাগুলির মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, ভারতে আমরা এক দ্বৈত প্রক্রিয়ার সমাপতন লক্ষ্য করি। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলে যেমন অবহেলিত অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রাভিগ শক্তিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে বাজার-অর্থনীতির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রাভিগ শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রচনা করার মধ্যেই জাতিসত্তাজনিত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে।

বিচ্ছিন্নতার অধিকার স্বীকার করার আগে আমাদের আরো একটি দিক ভালোভাবে ভেবে দেখা উচিত। পঞ্চাশের দশকের পর থেকে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ যে নয়া ঔপনিবেশিক কৌশল অবলম্বন করেছে তার কথাই আমরা বলতে চাইছি। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া আজ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে নানা রকম উস্কানী দিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধ্বংস করতে সচেষ্ট। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবির ও বিশ্বশান্তির পক্ষে তা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, নয়া উপনিবেশবাদীরা তা বিলক্ষণ জানে বলেই নানা ফিকিরে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা অনধিকার চর্চা করতে চাইছে। জাতিসত্তা বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অনেক আন্দোলনকেও তারা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চাইছে। পাঞ্জাবে খালিস্তানী উগ্রপন্থীদের হত্যালীলার উস্কানদাতা, দার্জিলিঙে গোর্খা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে-র আহ্বান বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের গেরিলা তৎপরতা

ইত্যাদির পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কার্যকর রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্যই যাবতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী ধুয়ো তুলে মূল সমস্যাকে এড়ানো যেতে পারে না। কিন্তু যে কথাটা গভীর-ভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন তা হল, এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে জাতিসত্তার বিচ্ছিন্নতার অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকার করার অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া।

৩

জাতিসত্তার সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন বারে বারে শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেছেন। শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করা, বিভিন্ন জাতসত্তার অন্তর্গত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ঐক্যসাধন ও সর্বহারার, আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা—জাতিসত্তার প্রশ্নে লেনিনবাদী নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু অবহেলিত জাতিসত্তার শ্রমজীবী মানুষেরা যাতে বুর্জোয়া প্রচার যন্ত্রের কবলে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি জাতিসত্তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন জানানোর কথা বলেছিলেন। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল এই যে, কোন নির্দিষ্ট জাতিসত্তার দাবিসনদের কেবলমাত্র সেই দাবি-গুলিকেই কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করতে পারে যেগুলি গণতান্ত্রিক ও প্রগতি-শীল সামাজিক আন্দোলনের পথ সুগম করে। কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বীকারের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সমবেত করাই হল অন্তিম লক্ষ্য।

জাতিসমস্যায় জর্জরিত আজকের ভারতবর্ষে লেনিনের এই শিক্ষার মর্ম অনুধাবনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ জাতিসত্তার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এদেশে এক মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেছে। স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক ধরে ভাষার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের আন্দোলন, জনগোষ্ঠীর নিজস্ব অঙ্গরাজ্য গঠনের আন্দোলন ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে আঞ্চলিকতাবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে বিশেষ করে জরুরী অবস্থার পর থেকে, আঞ্চলিকতা-বাদ ক্রমশ জঙ্গী রূপ নিতে নিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ প্রশ্রয় পেলে দেশ অচিরেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের [illegible] ক্ষেত্রে পরিণত হতে আর বিশেষ বিলম্ব ঘটবে না। তাই সমস্ত মার্কসবাদী

ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে এই আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতাবাদকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এক বিশেষ চ্যালেঞ্জ রূপেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু এও আমরা জানি যে, বুর্জোয়া মতাদর্শের ভিত্তিতে বুর্জোয়া প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর মধ্যে এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই চ্যালেঞ্জকে সার্থকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। জাতিসত্তায় বৈষম্যপ্রসূত বিদ্বেষভাব দূর করে পুঁজিবাদবিরোধী শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ঐক্যকে অটুট রাখতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ-গত ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে ধৈর্য ধরে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে গোটা ভারতবর্ষকে মাতিয়ে রাখতে হবে। বর্তমান পুঁজিবাদী কাঠামোর ভিতরেই শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনে এমন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যা প্রবাদবচনের ভাষায় 'এক ঢিলে দুই পাখি' মারতে পারে। অর্থাৎ জাতিসত্তাসমূহের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। একাজ করতে গেলে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রতিটি জাতিসত্তার সমস্যা বিশ্লেষণ করে তাদের সাধারণ সমস্যাবলী সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতি এবং বিশেষ সমস্যার জন্য বিশেষ নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই সাধারণ ও বিশেষ নীতিসমূহের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই হবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এগিয়ে চলার পাথেয়।

ভারতের প্রতিটি জাতিসত্তার সমস্যা বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে সাম্প্রতিককালের যে সব আন্দোলনের ফলে জাতীয় জীবনে আলোড়ন উঠেছে তাদের সম্পর্কে দু'এক কথা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের কথা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভাবায়। এই আন্দোলন যদিও শুরুতে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান তুলেছিল, পরবর্তীকালে তা প্রত্যাহার করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে মূলতঃ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একে অনেকটাই পুরনো 'উত্তরখণ্ড' দাবির নতুন সংস্করণ বলা যায়। কিন্তু এর প্রধান সমস্যা হল এই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে। কারণ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি বা ডুয়ার্সের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তারা দাবি করেছে সেখানে নেপালীভাষা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। আর যেখানে তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেই দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ ও কার্শিয়াং মহকুমা তিনটি নিয়ে যদি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা হয় তাহলে অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে তা অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পেছনে কোনই যৌক্তিকতা নেই। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, দার্জিলিং-এর নেপালীভাষী জনগণের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্য নেই। নেপালী ভাষা বিদেশী ভাষা বলে অপাংক্তেয় থাকবে—এই যুক্তিরও কোন সারবত্তা নেই। অন্য যে কোন ভাষার মতই নেপালী ভাষারও সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতি অর্জনের অধিকার আছে। সংবিধানের অষ্টম তপশীলে নেপালী ভাষাকে স্থান দেবার দাবি তাই খুবই যুক্তিসঙ্গত। তবে এই স্বীকৃতিই সব নয়। নেপালীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটও দেখা দিয়েছে। গোর্খা লীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই নেপালীভাষী বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে সমতলবাসী, বিশেষ করে বাঙালীদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব প্রচারিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে এক ধরনের মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে যে পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে থেকে সবদিক থেকে উন্নত বাঙালীদের সঙ্গে সরকারী চাকুরী, ব্যবসায় বা শিক্ষাক্ষেত্রে তারা সব সময়েই অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। অবশ্য সমতলবাসী মানুষের অনেকের মধ্যে ঔপনিবেশিক আচরণও এই মানসিক দূরত্ব রচনায় ইন্ধন যুগিয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক কারণগুলির মত এর অবদানও কম নয়। অতএব, অকর্মণ্য 'দার্জিলিং উপদেষ্টা পরিষদে'র পরিবর্তে প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা গঠন করে নেপালীভাষী মানুষের নিরাপত্তাবোধের অভাব মোচনের চেষ্টা করা উচিত। এ জন্য যদি সংবিধানে ষষ্ঠ তপশীলে সংশোধনের প্রয়োজন হয় তার জন্যও আন্দোলন করা উচিত। এভাবে নেপালী ও বাঙালীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমেই পাহাড়ী এলাকার শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সমতলবাসী শ্রমজীবী মানুষের সংহতিবোধ দৃঢ়তর হবে।

আসামের সমস্যা মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা। আসামের অনগ্রসর অর্থনীতিতে সুদীর্ঘকাল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী ও ছোট কারবারীরা আধিপত্য করেছে। সমাজবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে ষাটের দশক থেকেই ধীরে ধীরে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উন্মেষ ঘটতে থাকে অসমীয়া জনজাতিদের মধ্যে। "আসাম কেবলমাত্র অসমীয়াদের জন্য"—এই স্লোগান দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা আশির দশকে তা-ই "বিদেশী" সনাক্তকরণ ও বিতাড়নের রূপ পরিগ্রহ করে। অপ্রীতিকর বাড়াবাড়ির ফলে বিভিন্ন জন-

গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তা অবশ্যই শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী ও বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং আসামের শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদী নেতৃত্বের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা প্রতিটি মার্কসবাদী কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করতে গেলেও অসমীয় জনগণের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতা ও সত্তা সংরক্ষণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এখানেই অবশ্য এক জটিল সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হয়। সাম্রাজ্যবাদী কাল থেকে আসামের অর্থনীতি পরনির্ভরশীল থাকায় এবং স্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ বিলম্বিত হওয়ার সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত নানা উপজাতি ও জনগোষ্ঠীসমূহকে অসমীয় জাতিসত্তা তার মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে নি। এ হেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় সীমানার ওপার থেকে ব্যাপক জন-সমাগম হওয়ায় আসামের অর্থনীতি ও জনজীবন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অতএব, একদিকে যেমন আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, অন্যদিকে প্রকৃত বিদেশী সনাক্তকরণের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তবে বহুজাতিক আসামের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় যাতে তাদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারে এবং অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তা অনুভব করতে পারে সেজন্যও সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলীকে আরো অনেক বেশী জোরদার করা প্রয়োজন। সোভিয়েত ধাঁচে 'জাতীয় অঞ্চল' বা 'স্বশাসিত এলাকা' গঠন করা হলে সম্ভবত গারো, খাসি বা বোরো উপজাতিদের 'হোমল্যাণ্ড' গঠনের দাবিকে সংযত করে আসামের পুনর্বিভাজনকে ঠেকানো যেতে পারে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যে আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিয়েছে তার চরিত্র কিছুটা স্বতন্ত্র। যেহেতু ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দু বা ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে এই অঞ্চলের জনজাতিগুলির মিলের চেয়ে অমিলই বেশী, তাই সাধারণভাবে এই প্রান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে উপজাতীয় মানসিকতার সঙ্গে জাতীয় মানসিকতার ব্যবধান বেশ প্রকট। তবে এই অঞ্চলের বর্তমান উত্তেজনার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা অনেকটাই দায়ী। ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে এইসব অঞ্চল ভারতের অন্তর্গত হলেও ব্রিটিশ প্রশাসনের সাম্রাজ্যবিস্তার ছাড়া অর্থবহ অন্য কোন উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল না। ফলে এইসব অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশও ব্যাহত হয়েছিল। উপরন্তু

বেখাপ্পাভাবে উত্তর পূর্ব ভারত বাদ্য, পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় এখানকার আদি বাসিন্দারাও, অর্থাৎ নাগা, মিজো, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি উপজাতিগুলিও তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ দেখা দিলে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আজকে নাগা, মিজো ইত্যাদি উপজাতীয় মানুষজনের মধ্যে জাতীয় মুক্তির জন্য যে সশস্ত্র সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছে তার অনেকটাই এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিণতি। যদিও মূলত সংখ্যালঘু শিক্ষিত প্রবরদের মধ্যেই এর বাহ্য প্রকাশ ঘটেছে, তথাপি এর গুরুত্ব অসীম। কারণ রাজ্য পুনর্গঠন বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই উপজাতীয় জনসমাজগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বাস্তবায়িত না করলে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিকাঠামো সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ও ঐতিহ্যানুসারী সমাজব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডূকতা থেকে উপজাতীয় জনগণকে মুক্ত করা অবশ্যই জরুরী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আবার সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী বেশ কিছু গেরিলা গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠেছে। সর্বভারতীয় বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোতে যদি এদের সামিল করানো যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে নাগা বা মিজো জাতি সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যেতে পারে।

পূর্বাঞ্চলের আর একটি পুরনো সমস্যা হল ঝাড়খণ্ড সমস্যা। প্রধানত বিহারের সিংভূম ও ছোটনাগপুর জেলা এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো ইত্যাদি উপজাতির মধ্যে জাতীয় চেতনার প্রারম্ভিক বিকাশের ফল হল এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী আমল থেকেই এখানকার ভূমিপুত্রেরা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'র জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। স্বাধীনতার পরেও সমতলবাসী জমিদার, জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন অব্যাহত থেকেছে। অথচ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, দারিদ্র, উপজাতীয় সমস্যার প্রতি প্রশাসনের ঔদাসীন্য ও বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। ফলে স্বভাবতই এখন তারা অরণ্যের অধিকার ফিরে পেতে, শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থানের দাবিতে এবং নিজস্ব জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সংগ্রাম অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হওয়ার পথে বাধাও বিস্তর।

প্রথমত, পাঁচটি রাজ্যের যে ষোলটি জেলা নিয়ে 'ঝাড়খণ্ড' রাজ্য গঠনের প্রস্তাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে দেওয়া হয়েছে সেখানে উপজাতিরাই (সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু একাধিক উপজাতির সমন্বয়ে প্রস্তাবিত 'ঝাড়খণ্ড' রাজ্য গঠিত হওয়ার কথা, তখন স্বাভাবিকভাবেই সরকারী ভাষা, শিক্ষার মাধ্যম, সর্বসম্মত হরফ প্রভৃতি প্রশ্নে সমস্যা দেখা দেবে।

তৃতীয়ত, উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে ইতঃস্তত ছড়ানো থাকার ফলে সেগুলিকে একত্রিত করে একটি পৃথক রাজ্য গঠনের বাস্তব অসুবিধে রয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত, অতি সম্প্রতি ছোটনাগপুর ও সিংভূম জেলার অনুপজাতীয় সমতলবাসী মানুষেরাও আঞ্চলিক বৈষম্য ও সরকারী ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলনের সঙ্গে রাখী-বন্ধন করতে এগিয়ে আসছেন। এর ফলে যদি একটি সাধারণ ঝাড়খণ্ডী জাতিসত্তা গড়ে ওঠে তাহলে উপজাতি-প্রধান রাঁচি, সিংভূম, ছোটনাগপুর প্রমুখ অঞ্চলকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করে উপজাতীয় জনসমাজকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

এতক্ষণ আমরা যেসব অঞ্চলের কথা আলোচনা করলাম তাদের থেকে পাঞ্জাবের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কারণ জাতিসত্তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে আজ পাঞ্জাবে যা ঘটে চলেছে তা নির্ভেজাল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আকালী দল ও 'খলিস্তান'পন্থীরা শিখ 'জাতির' আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করছে। কিন্তু অনেক আগেই একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ধর্ম কখনো জাতি গঠনের বিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তি হতে পারে না। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সেকথাটাই আবার প্রমাণ করেছে। তবুও অকালী দল সেই ১৯৪৬ সালে যে 'শিখ জাতির' স্বাধিকার ঘোষণা করেছিল, সাম্প্রতিক আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবেই তার পুনরুক্তি করেছে। শিখ ধর্মগুরুরাও পাঞ্জাবী ভাষাকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুমুখী ভাষাকেই 'শিখ জাতির' ভাষা হিসেবে প্রচার করে চলেছেন। এর ফলে পাঞ্জাবী ভাষাকে অবলম্বন করে যে ধর্মনিরপেক্ষ অখণ্ড পাঞ্জাবী জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারত তা তো হলই না, উল্টে হিন্দু পাঞ্জাবী ও শিখ পাঞ্জাবীদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বাড়তে থাকে। এমন এক বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবে 'সবুজ বিপ্লবে'র সাফল্য এক নতুন পুঁজিবাদী

জমিদার ও কুলাক শ্রেণীর জন্ম দেয় যারা জাতিতে জাঠ, কিন্তু ধর্মে শিখ। সর্ব-ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে তারা ধর্মীয় মোড়কে জাতিসত্তার প্রশ্নকে তুলে ধরে নিজস্ব শ্রেণীগত স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ব্রতী হয়। শিখ উগ্রপন্থা ও খালিস্তানী বিচ্ছিন্নতাবাদ এই ধর্ম ও রাজনীতির জারজ সন্তান।

সুতরাং পাঞ্জাব সমস্যার বর্তমান রূপে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কোন স্থান নেই। বরং প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ দল ও গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বপ্রকার ধর্মোন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই সংগ্রামে যদি শিখ ও হিন্দু, উভয় প্রকার মৌলবাদীদের অপাংক্তেয় করে তোলা যায় তবেই হয়ত উদ্দেশ্যহীন উগ্রপন্থাকে প্রশমিত করা যাবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে আকালী দলকে নিয়ে। কারণ শিখ স্বার্থের সবচেয়ে বড় প্রতিভূ এই দল কংগ্রেসবিরোধী সম্মিলিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সহযোদ্ধা বলে পরিচিত হলেও স্পষ্টতই সে শিখ সাম্প্রদায়িকতাকে বর্জন করে নি, বরং তাকেই মূলধন করে গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থেরই সেবা করে এসেছে। বিরোধী দলগুলির এখানে একটি বড় ভূমিকা আছে। হয় তাদের চাপ সৃষ্টি করে আকালী দলকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পথে নিয়ে আসতে হবে, নয়তো প্রয়োজন হলে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ অংশের সঙ্গে একযোগে ধর্ম ও রাজনীতির অশুভ আঁতাতের বিপক্ষে লড়াই করতে হবে। এর বিকল্প নেই, কেননা ভারতীয় উপমহাদেশে তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অন্যতম গ্রন্থি হল খালিস্তানপন্থী আন্দোলন। তবে শিখ মৌলবাদীদের কুপ্রভাব মনে হয় শিখ সমাজে অনেক দূর ছড়িয়েছে; সেক্ষেত্রে উগ্রপন্থী দমনে যাই ব্যবস্থা নেওয়া হোক না কেন, শিখধর্মের স্বাতন্ত্র্যকে কোনও না কোনও ভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি হয়ত দিতে হবে।

৪

তবে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে যেমন, অন্যান্য জাতিসত্তার ক্ষেত্রেও তেমনি সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক সংস্কার কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাই হতে পারে। জাতিসমস্যার কোন দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এর মাধ্যমে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে পথে আমাদের দেশে অগ্রসর হচ্ছে

ফলে ভবিষ্যতে আরো অনেক নতুন নতুন জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটবে যারা আজকের মতই তাদের স্বাধিকারের দাবিতে মুখর হবে। যে কোন জাতিসত্তার আত্মস্ফুরণের মাধ্যম হল তার ভাষা ও সংস্কৃতি। সুতরাং অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে যখনই যে জাতিসত্তার মধ্যে জাগরণ ঘটবে তখনই সে ভাষার স্বীকৃতি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার হবে। অথচ আমাদের সংবিধানে মাত্র পনেরটি ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, বহুজাতিক দেশে কোন একটি বা দুটি ভাষাকেই সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়। কারণ তার ফলে বিভিন্ন ভাষার সমানাধিকারের নীতি যেমন ব্যাহত হয় তেমনি অনুন্নত ভাষার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসও বাধা পায়। লেনিনেরও এই মত ছিল। এদেশে কিন্তু বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত থেকেছে। নেপালী ভাষাকে অষ্টম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি মাঝে মাঝে উত্থাপন করা ছাড়া ব্যাপক কোন গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতিও নেওয়া হয় নি। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি একটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন যার সমাধানের উপর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই প্রতিটি মার্কসবাদী দল ও সংগঠনকে ভাষা নীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং এই নীতির মর্মবাণী হবে উন্নত-অনুন্নত প্রতিটি ভাষার সমানাধিকার। এরই সঙ্গে প্রতিটি অনুন্নত ও অর্ধোন্নত ভাষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থাও যাতে করা হয় সেজন্য ব্যাপক আন্দোলন করতে হবে।

ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে জাতিসত্তার সমস্যা সত্যই একটি চ্যালেঞ্জের মতো। কারণ শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্করহিত জাতিসত্তার আন্দোলন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কানাগলিতেই আবর্তিত হবে। অন্যদিকে বুর্জোয়া জাতিসত্তার আন্দোলন যত শক্তিশালী হতে থাকবে সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামেরও ততই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে। অতএব, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করা ও শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করা ছাড়া জাতি-সত্তার সমস্যা সমাধানের স্থায়ী কোন বিকল্প নেই।

কমিউনিস্টদের কাছে সমস্যাটি জটিল এইজন্য যে তারা সর্বতোভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী এবং সেই কারণেই যে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতিগর্বিতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শকে তাদের ঊর্ধ্বে তুলে

ধরতে হয়। সুতরাং শ্রেণীগ্রামের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার না দিয়ে উপায় নেই। বস্তুতপক্ষে, সামুদ্রিক ঢেউয়ের মতো শ্রেণীসংগ্রামের ঢেউ যদি গোটা ভারতবর্ষে অবিরাম আছড়ে পড়ত তাহলে জাতিসমস্যার প্রশ্ন নিয়ে আজ এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হত না। এভাবে বিচার করলে জাতি সমস্যাজনিত সঙ্কটের দায় কমিউনিস্টদের উপরেও বর্তায়। আমাদের প্রত্যেককেই আজ বুকে হাত দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে ষাট বৎসরাধিক কমিউনিস্ট কর্মধারা কেন শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে জাতপাতের সংঘাত, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা জাতিগর্বী আন্দোলনের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না?

আসলে কমিউনিস্টরা শ্রেণীসংগ্রামের কথা মুখে যতটা বলেছেন কাজে ততটা রূপায়ণ করতে পারেন নি। এখানে অবশ্য একটি তাত্ত্বিক প্রশ্নও জড়িত। সেটি হল শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে জাতিসত্তার প্রশ্নের সম্পর্ক। এক্ষেত্রে একটি দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যের ব্যাপার আছে। কারণ শ্রেণীসংগ্রামের উপর অধিক গুরুত্ব দিলে জাতিসত্তার মধ্যে সামাজিক বিভাজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। বিপরীতপক্ষে, জাতীয় সমস্যার উপর অধিক গুরুত্ব দিলে সামাজিক সমসত্ততার উপরে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। আমাদের দেশে কমিউনিস্টদের তরফে প্রধানত প্রথমটির উপরেই নির্ভরতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। আর তা করতে গিয়ে দ্বিতীয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের বর্তমান স্তরে উভয়ের দ্বান্দ্বিক সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী। কারণ জাতিসত্তার প্রশ্ন ভারতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ। এবং শ্রমিকশ্রেণীকেই এই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে, যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে আজকের যুগে আর নতুন করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জাতিসত্তার ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক দাবিগুলিকে সমর্থন জানানো এবং সেগুলিকে পূরণ করার পথে পরিচালিত করা আজ শ্রমিকশ্রেণীর এক গুরুদায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সার্থকভাবে এ কাজ করতে পারলেই, অর্থাৎ জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারলেই অথবা নিদেনপক্ষে তার প্রতি যথার্থ সমবেদনা দেখাতে পারলেই শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক দল নিপীড়িত বা অবহেলিত জাতিসত্তার অন্তর্গত শোষিত শ্রেণীসমূহের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হবে। সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে, কিন্তু জাতিসত্তার স্বার্থের বিনিময়ে নয়। তাকে সঙ্গে নিয়েই শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে একাজ বিসদৃশ মনে হলেও ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে

সেটাই স্বাভাবিক হবে। কেননা বহুক্ষেত্রেই জাতিসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রায় শ্রেণীসংগ্রামেরই নামান্তর। বিশেষ করে আদিম উপজাতিদের মধ্যে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছে তার বাহ্যিক প্রকাশ জাতীয়তাবাদী আবরণে হলেও তার চরিত্র শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক। এদের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্মই হয় নি। সামান্য কিছু পেটিবুর্জোয়ার আবির্ভাব ঘটেছে। তাছাড়া ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল হয় দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক নয় নিঃসম্বল দিনমজুর। সুতরাং তারা যখন নিজস্ব ভাষা লিপি বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য স্বশাসিত অঞ্চল বা রাজ্য দাবি করে তখন আসলে তারা সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ায়। তাই এদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা কমিউনিস্টদের পবিত্র কর্তব্য।

অতএব, জাতিসত্তার প্রশ্নে ভারতীয় কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

প্রথমত, যে কোন জাতিসত্তার আন্দোলনকেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বলে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত জাতিসত্তার আন্দোলন অর্থনৈতিক অনুন্নয়নঘটিত সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত উন্নয়নের বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনকেও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি, লিপি বা ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই অংশরূপে গণ্য করে রাজনৈতিক সমর্থন জানাতে হবে। কেননা এর মাধ্যমেই সামন্ততান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে জাতিসত্তার মুক্তি ত্বরান্বিত করা যাবে।

চতুর্থত, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত মানুষের শ্রেণীসংগ্রামকে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই শ্রেণীসংগ্রামই হবে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি। শক্তিশালী বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনই হবে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদী, সম্প্রদায়িক ও জাতিগর্বী রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রকৃত রক্ষাকবচ।

পঞ্চমত, জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন জানালেও তাদের বিচ্ছিন্নতার অধিকারকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। বরং সকল জাতি-

সত্তার নিপীড়িত অংশের সমবায়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

পরিশেষে একথা উপলব্ধির বিশেষ প্রয়োজন আজে যে, কেবলমাত্র সংসদীয় রাজনীতির আবর্তে ঘুরপাক খেলে জাতিসত্তার সমস্যা কোনদিনই মিটবে না। কারণ যে ধরনের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হলে প্রতিটি জাতিসত্তা সমানাধিকারের ভিত্তিতে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে বাঁধা সংসদীয় ব্যবস্থা তার উপযুক্ত স্থান নয়। সংসদ-বহির্ভূত গণ-আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামই পারে সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজ পরিবর্তন আনতে।

জাতীয় সংহতি ও আদিবাসী সমাজ

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আজ বিপন্ন। ভীষণভাবেই বিপন্ন। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, জাতি বিদ্বেষ, ভাষাগত বিরোধ আজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ সমস্ত সমস্যা আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে ফেলছে। অবশ্য, অস্বীকার করা যায় না নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ নিয়েই এদেশ গড়ে উঠেছে এবং সমগ্র দেশের সকল মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এক স্তরের নয়। এ অবস্থার মধ্যে এক ভারতীয় জাতি গড়ে ওঠা কঠিন। তবুও ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, জাতি, ধর্ম ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও ভারত এক মহাজাতি। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সবাই একাত্মবোধে আবদ্ধ হয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছে। সবাই একযোগে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই যে সংহতি ও ঐক্য গড়ে উঠেছিল, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তার উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে কেন? ইদানিংকালে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' কথাটি খুব বেশী শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এবং বলতে বাধা নেই এই বিচ্ছিন্নতাসুলভ মনোভাব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেওয়ায় অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কাজেই এরকম একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আসমুদ্র হিমালয়, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবাসীরই মিলিতভাবে এগিয়ে আসা উচিত। সম্মিলিতভাবে সবাই চেষ্টা করলে এই নিন্দনীয় মনোভাব নির্মূল হতে বাধ্য। অবশ্য এটা ঠিক যে, একদিনে এ কাজ সম্ভব নয়; কারণ একদিনে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। এর পিছনে কাজ করেছে বহুদিনের বহুরকমের মন্ত্রণা আর প্ররোচনা। দেশের ভিতরের ও বাইরের বিভেদকামী শক্তিগুলি পারস্পরিক যোগসাজসে দেশের ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল ধরিয়েছে। তাছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ, নিপীড়ন, অবহেলা, সামাজিক

সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করেছে বা এর জমি তৈরী করে দিয়েছে। ফলে, বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো একটা অবাঞ্ছিত এবং মারাত্মক মনোভাব নির্বিচারে প্রশ্রয় পাচ্ছে।

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে ভাষা, ধর্ম, গোষ্ঠী, জাতি, অঞ্চল ইত্যাদিকে ভিত্তি করেই বিচ্ছিন্নতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসাম, উত্তর-পূর্ব ভারত, পাঞ্জাব এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি বিশেষভাবে নজর দিয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। নানা রকমের ছল-চাতুরী করে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মেহনতী মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। তারা মনে করে যে, এসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন একবার ছড়িয়ে দিতে পারলে অনায়াসে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে। অর্থাৎ, সংকীর্ণ আঞ্চলিক স্বার্থের ঘৃণ্য মোহে দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করতে তাদের এতটুকু বাধে না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় পুঁজিবাদের সমর্থনপুষ্ট এইসব বিভেদকামী শক্তি জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং তারই রক্তক্ষয়ী তাণ্ডব ও আক্রমণ আমরা উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ডে এবং পাঞ্জাবে দেখতে পাই। হ্যাঁ--বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ চায় ভারতের মাটিতে নতুনভাবে নতুনরূপে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে আর দেশীয় পুঁজিবাদের সমর্থনকারীরা চায় নৈতিক বলে বলীয়ান মেহনতী মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে। মোটকথা, কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা নতুন রূপে নতুন কায়দায় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্ম, ভাষা, জাতি, গোষ্ঠী, ও অঞ্চলকে ভিত্তি করেই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদই হল শোষকশ্রেণীর হাতিয়ার। এরই সাহায্যে তারা মেহনতী মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরায়। যুগে যুগে শোষকশ্রেণী মেহনতী মানুষকে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্নে বিভক্ত করে রেখেছে এবং শোষণ-শাসন করেছে।

আমরা জানি, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ গড়ে তোলার পিছনে শ্রমজীবী আদিবাসী সমাজের দান অপরিসীম। আর্যভাষাভাষীদের কাছে পরাজিত হয়ে তারা পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে এতদিন প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে হারায় নি। পরাধীন ভারতে ইংরাজ সরকার নিজ স্বার্থে আদিবাসী সমাজকে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ

থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, যেন তারা একজোট হয়ে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়। ইংরাজ সরকারের এই নীতির ফলেই আদিবাসী সমাজ সাধারণ ভারতীয় সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একই দেশের অধিবাসী হয়েও একে অপরের কাছে রয়ে যায় অপরিচিত। এই ইংরাজ শাসনেই দেখা গেছে জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী পুলিস ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসীদের শোষণ করা হয় বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায়। তার ফলে আদিবাসী সমাজ ও অন্যান্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বৈষম্যের প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠেছে।

যাই হোক—স্বাধীনতা লাভের পর সমাজের দুর্বলতম অংশ অর্থাৎ আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়ের লোকেদের সাধারণ ভারতবাসীর সমকক্ষ করে তোলার জন্য ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ ধারা সংযোজিত হয়। সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঘোষণা করা হয়—

> "রাষ্ট্র বিশেষ যত্নের সঙ্গে দেশের দুর্বলতর অংশের বিশেষত তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও অর্থনীতিগত স্বার্থপূরণ এবং তাদের সর্বপ্রকার সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে তাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাও হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্যে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা এখন অবধি চলছে। উদ্দেশ্য হল—আদিবাসী সমাজ ও অন্যান্যদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনা। সঙ্গে সঙ্গে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। দুঃখের বিষয়, উদ্দেশ্য যত ভালোই হোক না কেন কাজে-কর্মে গাফিলতি থাকার দরুন আদিবাসী সমাজ বৃহত্তর সমাজ থেকে বহুলাংশে পিছিয়ে পড়ে আছে। সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। যদিও দেখা যায় যে, মুষ্টিমেয় কিছু আদিবাসী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আদিবাসী সমাজের বিরাট অংশ আজও দারিদ্র্যসীমার বহু নীচে পড়ে আছে। এইসব আদিবাসীদেরই বোঝানো হচ্ছে—তোমরা আদিবাসী। তোমরা যদি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ না হও, তবে তোমাদের আর আদিবাসী বলে গণ্য করা হবে না। তোমরা সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এরকম একটা ভয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সাধারণ দেশ-

বাসীকে বোকানো হচ্ছে যে, এসব আদিবাসীদের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অন্যান্য শ্রেণীর অগ্রসরতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ সব ভ্রান্ত প্রচারের ফলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। আদিবাসী সমাজ ও অন্যান্যদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ক্রমেই মজবুত হয়ে উঠছে। বলা যায় – ইংরাজ সরকার যে বিভেদনীতির মাধ্যমে রাজত্ব করে গেছে বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি তারই নব রূপায়ণ। কোথাও ধর্মের ধুয়া তুলে, কোথাও ভাষার প্রশ্ন, কোথাও বা বিদেশী আখ্যা দিয়ে হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর রক্তক্ষয়ী তাণ্ডব আক্রমণ চালিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করে তুলেছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে এই গণ-নির্যাতন ও ব্যাপক গণহত্যা বিভিন্নভাবে সংঘটিত হলেও তা একই পর্যায়ভুক্ত এবং সুপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে এ কথা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায়। এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে শুধু যে এ দেশের বৃহৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীরই যোগাযোগ আছে তা নয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদেরও পরোক্ষ উস্কানি আছে।

আদিবাসী সমাজ আজ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, জমি, বাসস্থান ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্ত সমস্যাকে আরো জটিল করে দিয়েই তো শোষকশ্রেণী শোষণ-উৎপীড়নের সুযোগ নেয়। আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আজ তারা বুঝতে পেরেছে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ অসম্ভব। তারা নিজ নিজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে আছে। আজ তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে— এ নিশ্চয় তারা সইবে না। আদিবাসী সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকলেও তা আদিবাসী সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষ বা পরিবারকে ক্বচিৎ সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারে কিন্তু সমগ্র আদিবাসী সমাজকে কখনও নয়। সমগ্র আদিবাসী সমাজকে আর্থিক, সামাজিক নিরাপত্তা না দিতে পারলে কোনক্রমেই আদিবাসী সমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হওয়া থেকে নিরস্ত করা যাবে না।

স্বাধীন ভারতে আদিবাসীরা আজও তাদের ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও নীতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দেখা যাক। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গেছে। এ সময়ের মধ্যে

তাদের ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য কতটুকু করা হয়েছে? স'াওতালী, মুণ্ডারী ও ওর'াও ভাষায় বহু আদিবাসী কথা বলে থাকেন। রাজ্য সরকার এ তিনটি প্রধান আদিবাসী ভাষায় মূল্যবান কোন কাজ করেছেন কি? প্রতি বছর রবীন্দ্র জন্মোৎসব ঘটা করে রাজ্যে পালন হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ভারত তীর্থ' কবিতাটি কি আজও এ তিনটি ভাষায় অনুদিত করে তাদের দিতে পেরেছে? তাদের ভাষায় তাঁদেরকে কি বলতে পেরেছে—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুণ-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

কিংবা তাদের ভাষায় কি তাদের আহ্বান করতে পেরেছে—

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ নীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

এ কথাগুলি যদি তাদের ভাষায় তাদের না বলতে পারা যায় তবে 'জাতীয় সংহতি দিবস' পালন বা এ নিয়ে ঘটা করে 'সেমিনার' করার সার্থকতা কোথায়? এ তো 'জাতীয় সংহতির' নামাবলী গায়ে দিয়ে তাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদেরও ভুলিয়ে রাখার চক্রান্ত। এ করে কোন লাভ নেই।

ইদানিংকালে আদিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী তুলেছে। অনেক সময় শোষক সমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রাম বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে প্রচার করে এবং অতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক-ভাবে দমন করতে চায়। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কোন নিপীড়িত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না—কারণ এ দুই আন্দোলন মূলগতভাবেই দুটি পৃথক বিষয়, কাজেই এদের চিনতে হয় একমাত্র শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে। যে কোন নিপীড়িত জাতিরই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সেই জাতিরই মেহনতী মানুষের অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এবং এটা থাকে বলেই সেই জাতির মেহনতী মানুষ সেই আন্দোলনে সামিল হয় এবং নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই নেতৃত্বদানকারী অংশ কোনক্রমেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মতো অন্য ভাষাভাষী বা ধর্মাবলম্বী মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে নিজ জাতির মেহনতী অংশকে ক্ষেপিয়ে তোলে না। কাজেই বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারবাদকে আলাদা করে চেনার একমাত্র উপায় হল শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্ত বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা। আজ তাদের ভাষাসংস্কৃতি বিপন্ন। এটা আজ তারা বুঝতে পেরেছে। তাই তারা যদি সবাই একজোট হয়ে তাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে বাঁচাতে চায়, তবে দোষ কোথায়? স্বাধীনভাবে নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে কেন? এটা এক মৌলিক অধিকার, শাশ্বত মানবিক অধিকার। এটা তাদের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম। ব্রিটিশ সরকার আদিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নি। তাদের দমন করে রেখেছিল। পরবর্তী-কালেও স্বাধীন ভারতে তাদের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে জাতি সমস্যার মত একটা গুরুতর সমস্যা আজ সারা দেশে তীব্র আকার ধারণ করেছে। কেউই আজ পর্যন্ত এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেনি। এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের মত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও এ সমস্যাটি এড়িয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রই এই সমস্যাটি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারে। আমরা জানি, মার্কসবাদ হল মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক মতবাদ এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই পিছিয়ে পড়া মানুষের সর্বক্ষেত্রে বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতি সমস্যার যে ভাবে সমাধান করেছে পৃথিবীতে তার তুলনা পাওয়া ভার। সেখানে শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণসম্পন্ন ভাষাভিত্তিক রাজ্যই গঠিত হয় নি, কিন্তু স্বতন্ত্র আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে নিজ নিজ শিল্প সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে উন্নত ও সমান করে তোলা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের আদিবাসীরা কি তা আশা করতে পারে না? আদিবাসী সমাজ অনুগ্রহ চায় না। চায় ন্যায় বিচার, চায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার। চায় রুজি-রোজগার ও বাসস্থানের মানবিক অধিকার। চায় আদিবাসী সত্তা থেকে জাতীয় সত্তায় বিকশিত হওয়ার সাংবিধানিক ব্যবস্থা। সুতরাং প্রগতিশীলতার ভেক ধরে নয়,—লোকদেখানো শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনগণের গোঁজামিলের ঐক্য দিয়ে নয়, কিন্তু প্রকৃত মার্কসীয় চিন্তাধারায় জাতীয় সংহতির স্বার্থে এই জাতি সমস্যার মতো একটা গুরুতর বিষয়কে সমাধান করতে হবে।

শেষে এ কথাই বলি, আদিবাসী মানসিকতার সঙ্গে অন্যান্য সমাজের সমন্বয় আজও ঘটে নি। আদিবাসী জীবন-সংস্কৃতি, মানসিকতাকে ঠিকমত বুঝতে না পারায় তাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। আদিবাসী জীবন-সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের কাছে আজও অপরিচিত। মানসিক সংহতির অভাবই পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মানসিক সংহতির অভাবের সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি খেলছেন। আদিবাসী সমাজ বৃহত্তর ভারতীয় সমাজেরই এক অংশ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম, লোকাচার ইত্যাদির পার্থক্য থাকলেও আমরা সবাই মনে-প্রাণে এক। আমরা সবাই এক ও অখণ্ড ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উত্তরাধিকারী এবং সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। প্রকৃত জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠা সম্ভব যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সচেতনতায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়।

জাতীয় সংহতি ও জনজাতি

এন. জি. বসু

ভারতে স্বাধীনোত্তর কালে বিশেষ করে বিগত দশকে জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ করবার চক্রান্ত নিয়ে বিশেষ আলোচনা চলছে ও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশের জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হলে প্রগতি বাধা পায়, দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, বৈরী বৈদেশিক চক্রান্তের শিকার হতে পারে। সকল রাজ্যের সকল স্তরের মানুষ এই সহজ কথাটা অনায়াসে বুঝতে পারে ও বিশ্বাস করে। স্ব-শাসনের জন্য সব রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই কি বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন বলে দোষারোপ করা চলে? পাঞ্জাবে 'খালিস্থান' আন্দোলন দার্জিলিং-এ 'গোর্খাল্যাণ্ড' আন্দোলন, আসামে 'বোরোল্যাণ্ড আন্দোলন, পূর্ব সীমান্তে 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলন, সবই কি সমপর্যায়ভুক্ত?

ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি (nationality and sub nationality) নিজ নিজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য উপেক্ষা করে জাতীয় স্বাধীনতার সামগ্রিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এবং জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশী শাসকের মোকাবিলা করেছিল। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সামগ্রিক ভারতীয় ঐক্যের ফলে সমগ্র ভারতবাসীকে একটি মাত্র জাতি হিসাবে প্রচার ও বিশ্বাস করানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছু দিন পরেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী সোচ্চার হতে থাকে। সেই সময়েও ভারতীয় জাতিসমস্যা (Nationality Question) সম্পর্কে গভীর ভাবনা-চিন্তা করা হয় না। ফলে প্রকৃত ভাষাভিত্তিক অথবা জাতিভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন হল না। জাতি-সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের পরিবর্তে সংগঠিত সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক শক্তির ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হল—কিন্তু জাতিসমস্যার প্রকৃত সমাধান হল না।

সাম্প্রতিক জনজাতি বা 'আদিবাসী' আন্দোলন জাতিসমস্যার একটি আঙ্গিক হিসাবেই দেখা উচিত। আমি আদিবাসীর বদলে জনজাতি শব্দটি ব্যবহার করছি এই কারণেই যে আদিবাসী কথাটিতে অন্য সম্প্রদায়ের মান-

সিকতায় জনজাতি সম্পর্কে একটু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ এই জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে পাহাড়ী ও বনাঞ্চলে জনজাতি সম্প্রদায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। জনজাতি সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক পরিবারকে কিছু ভূস্বামী সমতল ভূমিতে নিয়ে আসে তাদের জমিচাষের মজুর হিসাবে। বর্তমানে এরা সাধারণভাবে পাহাড়ী ও জঙ্গল এলাকায় বাস করলেও অতি প্রাচীনকালে এরা নদীর অববাহিকার সমতল ভূমাঞ্চলেই বাস করত। কিন্তু উন্নত কৃষি-কাজে অভিজ্ঞ সম্প্রদায় জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের উর্বর জমি দখল করে নেয়—আর জনজাতি লোকেরা দুর্গম পাহাড়ী বনাঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করতে শুরু করে। পাহাড় জঙ্গলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জনজাতির সামাজিক রীতিনীতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম। বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তারা এই বনাঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করত। পাহাড়ী বনাঞ্চলের উপর তারা সামাজিক ও গোষ্ঠী অধিকার বিনা বাধায় ভোগ করত। সহজ যাতায়াতের সুযোগ না থাকায় সমতল অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে এই সব জনজাতির বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। বনের সন্তানসন্ততি হিসাবে তারা গড়ে তোলে নিজস্ব সমাজ এবং সমাজ পরিচালনা ও অনুশাসনের জন্য গড়ে তোলে নিজেদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। তাদের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকেই বলা যেতে পারে আদি গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালন ব্যবস্থা।

দুর্গম অঞ্চল বলেই হোক অথবা এই সব অঞ্চলের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে অজ্ঞানতাবশই হোক সমতলভূমিতে প্রাচীন শাসকেরা জনজাতি অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তারের খুব সামান্যই চেষ্টা করেছে। মুঘলশাসন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে জনজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসন পরিচালন ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ও বাইরের হস্তক্ষেপ মুক্ত। অতীতে মুঘলেরা কখনও কখনও রাজ্য বিস্তারের জন্য সহজ পথের আশায় কোন কোন জনজাতি অঞ্চলে ঢুকবার চেষ্টা করে কিন্তু জনজাতি সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে এই প্রচেষ্টায় বাধা দেয়—গড়ে তোলে বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট জনজাতি দুর্গ। অবশেষে মুঘলরাও জনজাতি অঞ্চলে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা ত্যাগ করে। জনজাতি সম্প্রদায় একটি স্বাধীন সমাজগোষ্ঠী হিসাবে পাহাড়ী বনাঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। বাসস্থান বনাঞ্চলের (পাহাড়ী

বনজঙ্গল ও সংলগ্ন সমতল ভূমি) উপর সামাজিক ও গোষ্ঠী অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তাদের সামাজিক ও অঞ্চল প্রশাসনের পরিকাঠামো। বনাঞ্চলের উপর সামুদায়িক অধিকার (Community right) তাদের সামাজিক ব্যবস্থার ছিল মূল ভিত্তি। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার সীমানার ধা[illegible] ধারণা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে একটু একটু সৃষ্টি করা হয়। ভাষার সামান্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বসবাসকারী জনজাতির মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নিজস্ব জাতিসত্তা বোধ।

সমতল ভূমির জনসমষ্টির সঙ্গে সু-সংযোগ না থাকায় জনজাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি অন্যদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে উন্নত না হয়ে অনেক পিছিয়ে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের পর থেকে শুরু হয় সমতল ভূমির লোকেদের জনজাতি অঞ্চলে ধারাবাহিক অনুপ্রবেশ। বনাঞ্চলের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের (নদী, খনি, বনের গাছ-গাছড়া ও চাষযোগ্য জমি) গুরুত্ব ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকে। জনজাতি গোষ্ঠীর প্রয়োজনের তুলনায় এই সব অঞ্চলে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল পর্যাপ্ত—ফলে বাইরের লোকের অনুপ্রবেশের প্রাথমিক অবস্থায় উভয়ের মধ্যে আর্থিক সংঘাতের অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় সমতল ভূমির কিছু গোষ্ঠী সুচতুরভাবে প্রচেষ্টা শুরু করে জনজাতি অঞ্চলকে তাদের উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করতে। সেই সময় থেকেই শুরু হয় জনজাতির বঞ্চনা, শোষণ ও নিষ্পেষণের দ্বিতীয় যুগ। যে ব্রিটিশেরা ছিল পর্দার অন্তরালে তারা ধীরে ধীরে জনজাতি অঞ্চলের সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিল মুখ্য ভূমিকা। শুরু হল জনজাতির উপর ধারাবাহিক শোষণ ও নিষ্পেষণ। ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বহুবার জনজাতি প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করেছে। অন্যান্য ভারতবাসী যখন স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করতেও ভয় পেত তখনও এই জনজাতি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই করেছে। এই সমস্ত লড়াইকে আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

দেশ স্বাধীন হবার ৪০ বছর পরেও এই ভারতের যে ভৌগোলিক ৬ কোটি জনজাতি বাস করে—তাদের আর্থিক সামাজিক ও সংস্কৃতির সমগ্রিক বিকাশ অন্যান্য জন-সমষ্টির তুলনায় খুবই সামান্য। সমগ্র ভারতের বর্তমানে শিক্ষার হার যখন ৩০%—৩৩%, সেখানে জনজাতির শিক্ষার হার ৮%—১%। জনজাতি

মহিলা শিক্ষার হার ২%—৩%। সংঘঠিত শিল্পে সরকারী অথবা আধা সরকারী সংস্থানে জনজাতির মানুষ কাজ করে কেবলমাত্র ২% তাও মূলত, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী অথবা খনি অঞ্চলে খনি শ্রমিক হিসাবে। জনজাতির ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষণের কোন সংগঠিত সরকারী প্রচেষ্টা আজও নেই, অপরদিকে তাদের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বনজ ভূমির ঐতিহাসিক অধিকার ভোগ করে এসেছে এই জনজাতি গোষ্ঠীগতভাবে—সেই বনভূমির অধিকার থেকে তারা আজ বঞ্চিত। বনাঞ্চলের খনিজ-সম্পদ সংগ্রহের নামে জনজাতি নিজভূমিতে উদ্বাস্তু। বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য পাহাড়ী নদীতে বাঁধ তৈরীর ফলে জনজাতি ক্রমাগত ছিন্নমূল হয়ে চলেছে। জনজাতিকে উদ্বাস্তু করে যে খনিজ-সম্পদ ও বিদ্যুতের সাহায্যে গড়ে উঠছে বড় বড় শিল্প কারখানা সেখানে জনজাতির কর্মসংস্থান হয় না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনজাতিকে ব্যবহার করা হয় কায়িক শ্রমিকের মজুত বাহিনী হিসাবে—যাদের সাময়িক প্রয়োজন মতো কাজে ব্যবহার করা যায় আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছড়িয়ে দেওয়া যায় (Hire and fire)। বিগত ৪০ বছরের ঐ অভিজ্ঞতা থেকে জনজাতি যদি মনে করে যে অন্য সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক প্রশাসনের মধ্যে তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়, যদি মনে করে তারা শোষণের শিকার হচ্ছে, উপনিবেশের মতো তাদের অঞ্চলের সম্পদে ধনী হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়—তবেকি কিছু অন্যায় হবে ?

যে জনজাতির একটা জাতিসত্তা আছে, যাদের স্বতন্ত্রকৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষা আছে—যাদের সামাজিক অনুশাসনের একটা পরিকাঠামো আছে (পরিকাঠামোর গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে) সর্বপরি গোষ্ঠীবদ্ধ বাস করবার যাদের একটা ভৌগোলিক সীমা আছে—তাদের জাতিসত্তা বোধকে অস্বীকার করে, নিজ নিজ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির নিজস্ব বাসনাকে অস্বীকার করে ভারতীয় সংহতি শক্ত করা কী সম্ভব ? যারা জনজাতির স্ব-শাসনের অধিকার অস্বীকার করেন তারা প্রকৃতপক্ষে সঙ্কীর্ণ জাতাভিমানের বশবর্তী হয়েই তা করে থাকেন। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদকেই প্রকারান্তরে উস্কে দিচ্ছেন, এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তারা উপনিবেশবাদের শিকার হয়ে পড়ছেন। বাংলা-বিহার-মধ্যপ্রদেশ-ও উড়িষ্যার সংলগ্ন যে সব অঞ্চলে এই জনজাতিরা সংঘবদ্ধভাবে বাস করেন, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজেদের

একজন বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন কি যেমন গ্রহণ করেন তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের একজন কে? প্রকৃতপক্ষে আমরা জাত্যাভিমানে অন্য সম্প্রদায়ের উপর অধিকার ছাড়তে চাই না। স্বতন্ত্র উপজাতি ভারতেরই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে স্বশাসিত রাজ্য দাবী করলেই বিচ্ছিন্নতা বাদ হবে কেন?. ভাষা ভিত্তিক আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে—তাতে কি বিচ্ছিন্নতাবাদ শক্তিশালী হয়েছে, না ভারতীয় সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে?

জনজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিকাশ ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকলে কালক্রমে এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ সত্যি জন্ম নিতে পারে। বৈরী বৈদেশিক শক্তি ভারতকে দুর্বল করতে চায়। অস্ত্রবল বা ধনবল দিয়ে ভারতবর্ষকে কোন শক্তির পক্ষেই কুক্ষিগত করা সম্ভব নয়। ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি-ধর্মের সংহতি নষ্ট করেই ভারতকে দুর্বল করা ও কুক্ষিগত করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি সুযোগ বৈরী বৈদেশিক শক্তি ব্যবহার করে ও করবে। আমরা কি জাত্যাভিমান বশে বৈদেশিক সেই শক্তির শিকার হব? বিহার রাজ্য ছোট হয়ে গেল কিনা অথবা পশ্চিম বাংলার বা উড়িষ্যার দুটো জেলা অন্য রাজ্যভুক্ত হল কিনা সেইটাই বড় হয়ে দেখা দেবে না ছোট ছোট রাজ্য হলেও ভারতীয় সংহতি বজায় রেখে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক রেখে সামগ্রিক বিকাশের চেষ্টা করব? উন্নত সম্প্রদায় সচেতনভাবে যদি অনুন্নত জনজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সশ্রদ্ধ না হয় তাদের জাতিসত্তাকে স্বীকার না করে তাহলে জনজাতির সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের সু-সম্পর্ক বহুদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। সারা ভারতে গরীব খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্য বিশেষ ব্যাহত হবে। জনজাতির প্রতি অন্যের অবজ্ঞা অবহেলা তখনই দূর হবে যখন দেখা যাবে জনজাতি অন্যান্যদের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি করেছে। অন্যের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর না করে তারা নিজ প্রচেষ্টায় উন্নতি করতে চায়। অন্যেরা তাদের এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করলে ভারতীয় সংহতি দৃঢ় হবে, পরস্পরের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। বহু ভাষাভাষী জনজাতিকে নিয়ে অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড মেঘালয় প্রভৃতি পৃথক রাজ্য হওয়াতে ভারতীয় সংহতি ক্ষুন্ন না হয়ে আরও দৃঢ় হয়েছে।

সময় থাকতে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অংশ ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, জনজাতির ক্রমাগত বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে, তাদের রাজনৈতিক পরিকাঠামো গঠনে অগ্রণী-ভূমিকা না নিলে, অতীতের বহু ভুলের সঙ্গে আর একটি ভুল সংযোজন হবে।

দ্বান্দ্বিক প্রবাহে প্রাচীন মনীষা

দীপক ভট্টাচার্য

১

ইতিহাস চর্চায় ভারতের চিরায়ত দুর্বলতা যে এখনও কাটে নি তা প্রমাণ করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু এই দুর্বলতা অন্যান্য বহুবিধ পশ্চাৎপদতার সমপর্যায়ী নয়। কারণ ইতিহাস চেতনার অগ্রগতির বাধাগুলি স্পষ্ট। যেমন, ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস অনড় অচলায়তনে বাঁধা ছিল, (সম্ভবত হেগেলের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় প্রথম প্রচারিত) এই ধারণার প্রভাব এত ব্যাপক এবং গভীর যে ইতিহাস চেতনার বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। যদিও এগিয়ে যাওয়ার তাগিদে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই মতের পক্ষে উৎসাহ তুলনামূলকভাবে কম, তবু চিন্তার ইতিহাসের প্রসঙ্গেই হোক বা সমাজের ইতিহাসের প্রসঙ্গেই হোক বামপন্থী ও অবামপন্থী উভয়বিধ চিন্তাবিদকেই অনড়তার ঐ ধারণার মোহের পাকে পড়তে দেখা গেছে। রীতিমতো শৌভিনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী লেখক কার্ল হ্বিটফোগেল যেমন সচেতনভাবে স্বার্থান্বেষে এই মতের পক্ষে কলম ধরেছেন, ভারতীয় শোভিনিস্টরাও চির উজ্জ্বল, চির সুন্দর ভারতবর্ষের চিত্রণ করতে গিয়ে কার্যত ঐ মতকেই সমর্থন করেন। আবার রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও কুমারস্বামীর পাশে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বহু আয়োজনের মধ্যেও অনড়তার তত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট। অতি আধুনিক ঐতিহাসিকরা তেমন মাথা না ঘামালেও প্রায় অজ্ঞাতসারে অনুসৃত সর্বব্যাপী তত্ত্বটি ভারতে ইতিহাস চেতনার সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষতি করে চলেছে।

মার্কসবাদীদের পক্ষে ঐ মতের প্রভাব সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়েছে। আর্থনীতিক ও আনুষঙ্গিক বিকাশের বিরোধী মত হওয়ায় অনড় ইতিহাসের তত্ত্বের প্রভাব রাষ্ট্র ও সামাজিক শ্রেণীগুলির সম্বন্ধের স্পষ্ট ধারণার উদয়ের ব্যাঘাত করেছে।

চিন্তার বিকাশের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ—'প্রোগ্রেস্ অ্যাণ্ড কনজার্ভেটিজম্ ইন্ এনশেন্ট ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের রচয়িতা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সুপরিচিত

নেতা এস. জি. সরদেশাইকে সচেতনভাবে উক্ত তত্ত্বের উর্ধ্বে ওঠার জন্যই প্রথমত ধন্যবাদ জানানো উচিত। একথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন, কারণ শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গের 'আদিম সাম্যবাদ থেকে দাসপ্রথায় উত্তরণে ভারত' গ্রন্থে আপাতদৃষ্টিতে সংঘাতমূলক ইতিহাস দেখানোর চেষ্টা থাকলেও ভারতে ইউরোপের ইতিহাসের কল্পনাসৃষ্ট স্থূল অনুরূপ আরোপের বেশি কিছু নেই।

সরদেশাইয়ের কাজ ডাঙ্গের কাজের চেয়ে অনেক বেশি বিষয়ানুগ। মূলত চিন্তার ইতিহাস হলেও মার্কসীয় রীতি অনুসারে সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামো ও শক্তিকে পরিষ্কার করে বলে, তার ভিত্তিতে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার সংঘাতগুলির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সময়সীমা কমবেশি ২৫০০ বছর—ঋগ্বেদ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। "লেখকের মতে এই দীর্ঘ সময় ধরে সমাজজীবন ও চিন্তার সমস্ত স্তরে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল শক্তিগুলির মধ্যে একটা নিরন্তর সংঘাত চলেছিল। এর প্রকাশ ঘটেছিল, আমাদের অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সামাজিক তথা ধর্মীয় জীবনে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিকাশে এবং আরো অনেক কিছুতে। বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐ সংঘাতটি খুঁজে বার করে আনা।"

নীচে প্রথমে সরদেশাইয়ের মত তাঁর বক্তব্য অনুসারেই (কোথাও কোথাও মন্তব্য সহ) দেওয়া হবে। আমার নিজের সমালোচনা শেষ অংশে দেব।

২

বৈশিষ্ট্য অনুসারে যুগগুলিকে ভাগ, সাবেকি ভারতীয় গ্রামের বৈশিষ্ট্য, চাতুর্বর্ণ্য ও শ্রেণীশাসন ইত্যাদি পশ্চাৎপটের উপর দুই অধ্যায়ে আলোচনার পর শিরোনামার বিষয়ের সরাসরি আলোচনা বইয়ের ½ অংশ জোড়া চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে আছে—৪. বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার, ৫. দর্শনে সংঘাত ও তার সামাজিক তাৎপর্য। বাকি অংশে বেদান্ত ও কর্মমুখীনতা (৩) বিষয়ে এবং ভারতের অলৌকিক বোধির অপতত্ত্ব ও অতীতকে পুনরুজ্জীবনের নানা চেষ্টার (৬) বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এছাড়া, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রয়োজনে লেখা গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। 'রহস্যময়' ভারতের তথাকথিত দৈবীসম্পদের প্রচারের ফাঁকে তার প্রকৃত ঐশ্বর্যসহ অতল দারিদ্র্যের বাস্তব ছবিটি

হারিয়ে যায়। "বিক্রমাদিত্যের রাজসভার ঝলমলে আলোর নীচে, অনড় সমাজ ও ভাগ্যকে অসহায়ভাবে মেনে নেওয়া ক্ষুধার্ত, দীন, হতভাগ্য মানুষেরাও ছিল।" ১৫০০ বছরের ঝড় জল সওয়া লৌহস্তম্ভটি কি ভাবে তৈরি হয়েছিল তার সত্য তোহিনীটি নেই, কিন্তু ভারতের অলৌকিক বোধির গল্পেরও অন্ত নেই।

প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথা স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুষ্ট করলেও, এখন এমনকি উদারপন্থী সন্তদের বাণীও বিপ্লবী ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরং আত্মাভিমুখী জাতীয়তাবাদ, ও রহস্যবাদের সংকীর্ণতাকে আক্রমণ করে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, আধুনিক বিশ্ববীক্ষা ও দর্শন গড়ে তোলা প্রয়োজনীয়। সরদেশাইয়ের বিশ্বাস আমাদের ইতিহাসে এই কাজ করার যোগ্য মালমশলা আছে। আমাদের ঐতিহ্যে কোনটি মহান ও কোনটি বর্জনীয়, যা মহান তার ধারক কে, বর্জনীয় বস্তুগুলির বাহকই বা কে এই নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় লেখকের নিজের উক্তিগুলির উপরিউক্ত সারসংক্ষেপ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে পাঠককে এগোতে হবে।

ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য (অ. ২) বুঝতে লেখককে দুটি ভুল সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়েছে। এশিয় উৎপাদন পদ্ধতির (২১) তত্ত্ব, যার রাজনৈতিক রূপ এশিয় স্বৈরাচারবাদ (৪১), অথবা দাস-ভূমিদাস-মজুর-শ্রমিক ক্রমে উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তনের তত্ত্ব কোনটাই ভারত সম্বন্ধে খাটে না। "দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ঐ দু'রকম তত্ত্বের দোষই মার্কসবাদীদের মধ্যে দেখা যায়। কঠোরভাবে এর প্রভাব কাটানোর চেষ্টা না করলে এই মিথ্যা বৈজ্ঞানিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হলেও সেগুলির রেশ থেকে যায়।"(২২)

সরদেশাইএর তোলা সমস্যাটির সর্বজনস্বীকৃত সমাধান এখনও পাওয়া যায় নি। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের কাল বিভাজনের জন্য মূল উৎপাদিকা শক্তিগুলির সম্পর্কের উপর নির্ভর করে মার্কস-এঙ্গেলস ভাবী সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী চারটি স্তর লক্ষ্য করেছিলেন। 'এশিয় উৎপাদন পদ্ধতিসহ 'প্রাচ্য' স্বৈরাচারবাদ, দাসতন্ত্র, ভূমিদাস-সামন্ততন্ত্র ও আধুনিক পুঁজিবাদ। তৎকালিক লভ্য তথ্যের উপর নির্ভর করে মার্কস-এঙ্গেলস ইউরোপ বহির্ভূত জগতে তথা ইউরোপের কোন কোন অংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্তঃসংঘাতবিহীন গ্রাম সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত প্রাচ্য স্বৈরাবাদের কথা বলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন প্রাচ্য স্বৈরাচারবাদ মার্কস-এঙ্গেলসের আবিষ্কার নয়। হেগেল, মিল প্রভৃতি চিন্তাবিদরা এই তত্ত্ব প্রচার করেন। কিন্তু তখন অবধি প্রাচ্যের নানা দেশের পার্থক্য এবং

ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুতপক্ষে ইউরোপ কিছুই জানত না। যে গ্রামসমাজ ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষীয়মাণ হতে শুরু করেছিল তার নিরীক্ষণ মার্কসকে ঐ সমাজের অচলায়তন দশা সম্বন্ধে অবহিত করে। অনড় ও স্বৈরাচারের অনুকূল হওয়ায় ঐ গ্রামসমাজই প্রাচ্য স্বৈরাচারের ভিত্তি বলে মার্কস মন্তব্য করেন। তখন যা জানা ছিল না, ভারতসহ প্রাচ্যের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ আলোচনার বিষয় হয় এবং কালক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচ্য স্বৈরাচার তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক বিবেচনায় বর্জিত হয়।

দুঃখের বিষয় এই মতের বদলে নতুন আরেকটি ভ্রান্ত মত তৎকালীন রুশ ও চীনা নেতৃত্বের প্রভাবে সমস্ত মার্কসবাদীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে দাস-ভূমিদাস সামন্ততন্ত্র ক্রমে যে বিকাশ হয়েছিল তা সারা পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের পক্ষেই প্রযোজ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

সরদেশাই অবৈজ্ঞানিকতার বেড়াজাল বলতে ঐ দুই মতের প্রভাবকে বুঝিয়েছেন।

তিনি দুভাবে বেড়াজাল অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয়—হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগই আর্থনীতিক শ্রেণীবিভাগ এই সহজ সত্যটিকে মেনে নিয়েছেন। দাস বা ভূমিদাস প্রথা থেকে এটি স্বতন্ত্র। শূদ্রবর্ণ দাস নয়, তিন উচ্চবর্ণের সমষ্টিগত হেলট্। সবর্ণ বিবাহ এই প্রথার অপর বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় শ্রেণীশাসন থেকে স্বতন্ত্র হলেও এতে যে শ্রেণীশাসন ও নিপীড়ন ভয়ঙ্করভাবে ছিল তা সরদেশাই প্রতিপাদন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সরদেশাইও আরো বহু লেখকের মতো অনড়, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের অনন্য বর্ণনামূলক মার্কসের ক্যাপিটালের অতি প্রসিদ্ধ অনুচ্ছেদটি পুরো উদ্ধৃত করেছেন। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে এই বহু আলোচিত অনুচ্ছেদের যোজনা কারো কারোর অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরদেশাইএর বেশ স্বাতন্ত্র্য থাকায় একঘেয়েমি হয় নি। সমাজের যে আর্থনীতিক উপাদানের কাঠামো "রাজনৈতিক আকাশের ঝোড়ো মেঘের স্পর্শের আওতায় আসে না" সেই অপরিবর্তনীয় গ্রামসমাজকে সরদেশাই চিরন্তন বলে মেনে নেন নি। তাঁর মতে (১২৫) গুপ্ত যুগেই বর্ণভিত্তিক এই গ্রামসমাজ পুরো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময় পর্যন্ত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলি থাকা সত্ত্বেও [illegible] সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয়রা চরিষ্ণু ছিল।

এখানে দুটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। প্রথমত, উক্ত স্বীকারের মধ্যে ভারত

ইতিহাসের গতির সমঝদার হিসাবে সরদেশাই প্রায় কোসম্বির সমমতাবলম্বী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গ্রন্থে কোসম্বির নাম নেই। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তন স্বীকার করা সত্ত্বেও ভারত ইতিহাসের ধারাবাহিকতার উপর সরদেশাই খুব জোর দিয়েছেন। এই দুটি বিষয় সমালোচনা অংশে আমরা আবার তুলব।

সরদেশাইএর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব মধ্যযুগীয় গ্রামসমাজ কেন অপরিবর্তনীয় ছিল এ বিষয়ে মার্কসের মত পরিবর্তন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্তত ১৮৫৩ পর্যন্ত মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন যে কৃত্রিম সেচব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া ও সমাজ বা সরকারের হাতে সেচব্যবস্থার ভার থাকাই প্রাচ্যে ফিউডাল ধাঁচের জমির মালিকানা না গড়ে ওঠা, বিশিষ্ট স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা তথা সামূহিক অপরিবর্তনীয়তার কারণ। কিন্তু ১৮৬৭তে প্রকাশিত **ডাস্ ক্যাপিটাল** ১ম খণ্ডের ঐ অনুচ্ছেদে অপরিবর্তনীয়তার গোপন সূত্র হিসেবে গ্রামের সরল শ্রম-বিভাগ, যা গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলেও আবার অবিকল প্রবর্তন করা সম্ভব তাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটা দেখিয়ে সরদেশাই প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত 'হাইড্রলিক সমাজ' তত্ত্বের উপর আঘাত হানা সম্ভব করেছেন।

কিন্তু স্বয়ং নবীকরণ যোগ্য শ্রম বিভাগ বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট করে বললে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হত। জাতি বিভাগ প্রথার ভয়ঙ্কর নমনীয়তা—বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা—সুবিদিত। স্বয়ং নবীকরণযোগ্য সরল উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে নাম না উল্লেখ করে বংশগত বৃত্তি ও সবর্ণবিবাহমূলক জাতিব্যবস্থাকেই মার্কস বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার না করলেও কাস্টিজম্‌কেই মার্কস প্রাচ্য স্বৈরাচারবাদের ভিত্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

জাতিবিভাগভিত্তিক স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অনড় গ্রামসমাজ গুপ্ত যুগ থেকে সর্ব ব্যাপী শিকড় গেড়ে ভারতীয় মধ্যযুগীয় অচলায়তন গড়ে তোলে। সরদেশাইএর মতে ঐ সাবেকি ভারতীয় গ্রাম সমাজ পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রথম বিকাশলাভ করে। (হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশ অর্থাৎ কুরুপঞ্চাল দেশ বললে আরো সঠিক হত। অধিকাংশ বৈদিক সাহিত্য, মনুসংহিতা ও মহাভারত হরিয়ানা সহ হিন্দী খড়িবোলি অঞ্চলে রচিত হয়।) শুধু অনড়ই নয় এই সমাজ ভীষণভাবে শ্রেণী নিপীড়নভিত্তিকও ছিল। "এই পুরো তন্ত্রটিই নিঃসন্দেহে স্বৈরাচারতন্ত্র ছিল। কিন্তু চূড়ার উপর রাজা নামে কেবল একজন

স্বৈরাচারীর ব্যাপার নয়। গোটা সমাজকাঠামোটাই ছিল উপর থেকে নীচ অবধি স্বৈরাচারের এক স্তরীভূত পিরামিড যার চূড়ায় রয়েছেন রাজা। জাতি-ভিত্তিক গ্রামসমাজের অর্থনীতি ভারতীয় সমাজের শোষকস্তরের সামাজিক, আর্থনীতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এক গ্র্যানাইট পাথরে জমিয়ে দিয়েছিল। এই হল 'এশিয়' স্বৈরাচার।" (৪১)

এই সমাজ প্রতিষ্ঠার ফল কি হয়েছিল? "অপ্রতিরোধ্য আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রাবির এদিকে এগোতে পারে নি। চোদ্দশ' বছর পর গজনীর মামুদ মাথনে ছুরির মতো ভারতবর্ষের বুক ভেদ করে গেছিল—পঁচিশ বছরে চোদ্দ বার। কোন অধিপতিই নিজের রাজ্য তো নয়ই, পবিত্র মন্দিরগুলিও রক্ষা করতে পারে নি। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র, জাতিভিত্তিক গ্রামসমাজ ও মায়াবাদ দেশকে এই পরিণতিতেই টেনে এনেছিল।" (১২-১৩)

এই সমাজ আবির্ভাবের পূর্ববর্তী অবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার অনেক তথ্যই সুবিদিত। পরবর্তী সমাজের বীজ ছিল উত্তর বৈদিক যুগের চাতুর্বর্ণ্য বিধিতে। ঋগ্বেদের পশুপালনভিত্তিক ট্রাইবাল সমাজ উপনিষদের যুগে ভেঙে গিয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এই দুই শাসক জাতি ও বহিষ্কৃত শূদ্রদের সঙ্গে বৈশ্য এই শাসিত গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। শাসক জাতির দর্শন হিসাবে আত্মব্রহ্ম তত্ত্বভিত্তিক বেদান্ত মতের আবির্ভাব ঘটে। বৈদান্তিক বিশুদ্ধ চৈতন্যের মতের হাত ধরে ব্রহ্মা কর্তৃক চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি ও নীচুশ্রেণীর ভাগ্য পূর্বজন্মের কর্মের ফলে এসেছে ও জাতিকর্মের দ্বারা তাদের আত্মা মোক্ষ পাবে এই মতও এসেছে।

পূর্বভারতে মগধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে লোহা আবিষ্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, অসংখ্য শ্রম বিভাগ, জমিতে ক্ষীণস্বত্ব প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও কৃষকের শোষণ, বাণিজ্য প্রভৃতির উল্লেখ করে, ক্রমবর্ধমান নিপীড়নই বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের কারণ রূপে বলা হয়েছে।

বর্ণনা ও আলোচনার মধ্যে অনেক মূল্যবান প্রশ্নও এসেছে।

ট্রাইবাল সমাজব্যবস্থার জায়গায় উঁচুনীচু ভেদবিশিষ্ট, নিপীড়নকারী জাতিব্যবস্থার সমাজ কেন এল? এর দুটি উত্তর সরদেশাই দিয়েছেন। এঙ্গেলস ও গর্ডন চাইল্ড যেভাবে ট্রাইবের শ্রমজীবীর থেকে দাসতন্ত্রের শ্রমজীবীর উন্নততর জীবনমান ও দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির অধিক উৎপাদনশীলতা দেখিয়েছেন, সেই প্রথাতেই সরদেশাই বলেছেন—চাতুর্বর্ণ্য ছাড়া ইন্দো-আর্য ট্রাইবগুলির

উন্নতি সম্ভব ছিল না। প্রাচীন বৈদিক সমাজ শুধু নিজেই ভেঙে যায় নি, বাইরের ট্রাইবগুলিকেও উন্নততর ব্যবস্থার আওতায় এনেছে। হিন্দুসমাজের সত্যকারের কৃতিত্ব শিকারি ও খাদ্যসংগ্রাহী স্তরের অগণিত আদিম ট্রাইবকে হিন্দুত্বের আওতায় জাতি হিসেবে এনে উৎপাদন কৌশলে উন্নতির সাহায্য করে কৃষিমূলক স্থির বসতি ও হস্তশিল্প উৎপাদনের স্তরে আনা।

এই শেষ মতটি এখন বহুল প্রচারিত। কিছু ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ, কোসম্বি, নির্মলচন্দ্র বসু ইত্যাদি নানা পণ্ডিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বর্ণহিন্দুদের যদি কোনও সক্রিয় ভূমিকা থেকেও থাকে নির্দিষ্ট তথ্য সহ তার বিবরণী কেউ তৈরি করেছেন বলে আমার জানা নেই। ট্রাইবগুলি হিন্দুসমাজে এসেছে একথা একশ'বার সত্য। তাদের বিগণীকরণে কাস্টিজমের অনন্য ভূমিকাও সন্দেহাতীত। কিন্তু কোন্ কাস্ট্ এই প্রক্রিয়ায় কি ভূমিকা নিয়েছে তার সঠিক অনুসন্ধান না করলে সত্য ইতিহাসটি কোন দিন জানা যাবে না।

৩

বারবার একটা কথা বলা হয়েছে—বেদান্ত দর্শন চাতুর্বর্ণ্য শাসিত সমাজের শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার। এই মত থেকে বিচ্যুত না হয়েও সরদেশাই (অ.৩) স্বাস্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেদান্তের সঙ্গে কর্ম ও প্রগতির সম্পর্ক বিচার করেছেন। মধ্যযুগের উদারপন্থী ভক্তিবাদী সন্তরা, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ আদি সংস্কারকরাও গান্ধী ও টিলকের মতো নেতারা বেদান্ত থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ক'দশকের ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নায়কদের পক্ষে অত্যাচারীর বিনাশকারী দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতির উপাসনা যে স্বাভাবিক ছিল তাও সরদেশাইএর দৃষ্টি এড়ায় নি। "বেদান্তের এ ভূমিকা কোন মতেই শেষ হয় নি।" সুতরাং ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ায় শান্তি ও প্রগতির জন্য কোন কোন খ্রীষ্টান যাজক ও মৌলবীদের সঙ্গে সহযোগিতার মতো প্রগতিশীল লক্ষ্যে যাঁরা বেদান্ত ও হিন্দুধর্মের উপযোগ করেন, তাঁদের দিকেও মার্কসবাদীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে (১৪৬)।

এত বলে সরদেশাই ভক্তি আন্দোলন ও বেদান্তের প্রগতিশীলতার সীমা তথা অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াশীল পরিণতির ছবিটিও তুলে ধরেছেন।

৪

বইয়ের শিরোনামার বিষয়ের সরাসরি আলোচনা দুটি অধ্যায়ে আছে। দুটি প্রচলিত ধারণার উপরেও কঠোর আক্রমণ এই অংশে আছে।

একটা প্রচলিত বিশ্বাস এই যে ইউরোপে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে রক্তাক্ত সংঘাত আধুনিক যুগের গোড়ায় (কিছু পরিমাণে প্রাচীন গ্রীসে) হয়েছিল, ভারতে তা হয়নি।

দ্বিতীয় যে ধারণার উপর আঘাত হানা হয়েছে তা এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছু প্রগতি হয়েছিল তা ঋষিদের অলৌকিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত।

[ত্রিকালজ্ঞ মুনিরা সর্বদ্রষ্টা ছিলেন এই বিশ্বাস পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের নতুন স্কুল-কলেজের শিক্ষানীতির প্রতি আগ্রহের একটা বড় কারণই ছিল "তাহাদের বিশ্বাস সর্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে অতএব শাস্ত্রসমূহ অভ্রান্ত।" নবজাগরণে ও আধুনিক শিক্ষায় ঐ স্থূল বিশ্বাস অনেকাংশে ভেঙে গেলেও কিছু 'আধুনিক' দর্শনে বিজ্ঞানীর বুদ্ধি ও শ্রমপূর্বক বিচারের বিরুদ্ধেও ঊর্ধ্বে অতিমানবসুলভ বোধির তত্ত্বকে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাঁদের পৌরাণিক ধর্মে বিশ্বাস নেই, আধুনিক শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা সর্বজ্ঞ ঋষির ধারণাটিকে হয়ত গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট বিবেচনায় বর্জন করেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের মধ্যেই অতিমানববাদ, বোধিবাদ (ইন্টুইশন) ও আই. কিউ. তত্ত্ব স্থান পূরণ করে নিয়েছে দেখা যায়।

সরদেশাই এই দুইএর মধ্যে স্পষ্ট রেখা টানেন নি। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক বিজ্ঞান-বিরোধিতার মতো, আধুনিক বোধিবাদই আক্রমণের বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য এও স্বীকার করা খুব প্রয়োজন যে, যে দেশে শতকরা ৬৪ জন মানুষকে স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় নি, সেখানে প্রাচীন বিশ্বাসটির ভারও বড় সমস্যা।

সরদেশাইএর মতে রহস্যবাদ ও বোধিবাদ প্রত্যাখ্যান ছাড়া বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। শুধু তাত্ত্বিক লড়াইই নয় শক্তিশালী ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তন্ত্র আমাদের বৈজ্ঞানিকদের জীবনে সর্বেভাবে যে পার্থিব চাপ সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই এগোতে হয়েছিল।(১৫২)

আর্যভট (খ্রী ৪৯৯) বরাহমিহির (মৃত্যু ৫৮৭) ও ব্রহ্মগুপ্ত (খ্রী. ৬২৮) প্রমুখ প্রাচীন জ্যোতির্বিদের মধ্যে ক্রমেই পার্থক্য গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই বিকাশ

প্রগতির বদলে অধোগতি ক্রমে হয়েছিল। আর্যভট্ট চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঠিক কারণটি নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। এখন বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতে রাহু-রাক্ষসের গ্রাসে চন্দ্র সূর্যগ্রহণ হয়। আর্যভটের মতো বরাহমিহিরও ঠিক কারণটি বললেও, রাহুতত্ত্বটির অবতারণা তিনি করেন এবং সমালোচনা অতি ক্ষীণ। ব্রহ্মগুপ্ত আরো পিছিয়ে আসেন, বেশ আত্ম-বিরোধিতা করেই তিনি বহু অন্য কুসংস্কারের সঙ্গে রাহু তত্ত্বেরও সমর্থন করেন। ১২৯ বছরের ব্যবধানেই এই পশ্চাৎগতি থেকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্রুত বর্ধমান তীব্র চাপ অনুমান করা যায়। অনুমানের সমর্থনে সরদেশাই অল্ বিরুণির একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন যাতে ব্রহ্মগুপ্তের দ্বৈত আচরণ থেকে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে তাঁরও সক্রেটিসের মতো কোন দুর্ভাগ্য হয়েছিল।

অবশ্য পৌরাণিক মতে অবিশ্বাসী হলে মৃত্যুবরণ করতে হবে এমন ভয় ভারতবর্ষে ছিল না। সক্রেটিস্ বা ইন্‌কুইজিশনের বলিদের মতো ভাগ্য আমাদের বৈজ্ঞানিকদের হয়নি। কিন্তু শারীরিক নির্যাতন না হলেও, নিজের বৈজ্ঞানিক মত পরিত্যাগ অন্যথায় সমাজ থেকে বহিষ্কারের জীবন্ত নির্যাতন এই দুয়ের মধ্যে তাঁদের বেছে নিতে হয়েছিল।

সবচেয়ে তীব্র সংঘাত ঘটেছিল আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে। 'আতুরের ব্যাধি দূর করা এবং সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা করা' এই উদ্দেশ্যে রচিত আয়ুর্বেদকে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আয়ুর্বেদের মূলনীতি তিনটি—ব্যাধি আছে, তার কারণ আছে, দূরীকরণের উপায়ও আছে। রোগ দূরীকরণের জন্য দুরকম ভেষজ স্বীকার করা হয়েছে—দৈব-আশ্রিত ও যুক্তি-আশ্রিত। এর মধ্যে যুক্তি-আশ্রিত ভেষজই প্রধান বলে স্বীকার করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে জীবকে চৈতন্যময় জড় (ভূত) বলা হয়েছে। এতে দেহের অতিরিক্ত চৈতন্যকে স্বীকার করা হয় নি। আয়ুর্বেদে কার্যকারণবাদ এবং পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সব মিলে আয়ুর্বেদের জড়বাদী উৎস অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে।

এভাবে চরককে আত্মতত্ত্ববিরোধী প্রতিপন্ন করে চরকসংহিতায় আত্মতত্ত্বের পক্ষে যে উক্তিগুলি পাওয়া যায় সরদেশাই তারও ব্যাখ্যা করেছেন। এই উক্ত জড়বাদী মতে জীবকে জড় বলা হয়েছে তবু চৈতন্যবাদী দার্শনিকরা এই প্রবক্তাদের শাস্তি দেন নি। কিন্তু উক্ত জড়বাদী তত্ত্বের সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ

উক্তি দেখে বোঝা যায় যে চরকসংহিতায় পরবর্তীকালে বহু নতুন অংশ যোগকরা হয়েছে। "সৌভাগ্য বশতঃ প্রতিক্রিয়া এখনকার মত তখনও শুধু প্রতিক্রিযাশীলই নয় নির্বোধও ছিল···পুরো বইয়ে অনুস্যূত মূল তত্ত্বের সঙ্গে হাস্যকরভাবে অসঙ্গত কয়েকটি বিকট মত ঢুকিয়ে দেওয়া—এটুকুনই তারা করেছিল।"

উদাহরণস্বরূপ, একই চরকসংহিতায় গরুর মাংসকে খাদ্য রূপেও বলা হয়েছে, আবার গরু উপাসনার কথাও বলা হয়েছে। দৈব আশ্রিত ওষুধের তুচ্ছতা প্রতিপাদন করেও দেবতার নিন্দা, পাপ ইত্যাদিকে কুষ্ঠের কারণ বলা হয়েছে।

প্রথম চিকিৎসাবিদ ভরদ্বাজ ও আত্মবাদী আত্রেয়ের মধ্যে একটি কথোপকথনের প্রতিও সরদেশাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভরদ্বাজ একটি আপষ্ট চরিত্র, কিন্তু প্রচলিত মতের বিরোধী। সরদেশাই ভরদ্বাজকে স্বভাববাদী মনে করেন। আত্রেয়ের বহু উপদেশ সত্ত্বেও ঐ কথোপকথনে ভরদ্বাজের নিজ মত পরিত্যাগের কোন লক্ষণ নেই। সরদেশাই প্রশ্ন করেছেন ভরদ্বাজের উক্তি থেকে গ্যালিলিও ও কোপার্নিকাসের কথা মনে পড়ে কি না।

চিকিৎসকদের প্রতি শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও উক্ত সংঘাতের পরিচায়ক। যেখানে ঋগ্বেদে সপ্রশংস শ্রদ্ধার পরিচয় মেলে, সেখানে স্মৃতিশাস্ত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষ স্থান পেয়েছে। সামাজিক মূল্যায়নের এই বিপরীত পরিণাম শ্রেণীবিভাগ-উদ্ভবকালে শ্রমের প্রতি শাসক শ্রেণীর ঘৃণা জন্মের নিদর্শন এবং চৈতন্য যে অবস্থানির্ভর এই মার্কসবাদী মতের প্রমাণ।

লেখকের বক্তব্য অনুসারে এবং অতিরিক্ত মন্তব্য ছাড়াই উপরের বিবরণীটি দেওয়া হল। এ কথা সত্য যে আয়ুর্বেদের গ্রন্থে অসঙ্গত মত প্রক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা প্রচুর। আর্যভটের পরিণতি (সমালোচনা অংশে দ্রষ্টব্য) ঐ সম্ভাবনাই ইঙ্গিত করে। কিন্তু সরদেশাইয়ের দেখানো সবকটি অসঙ্গতিই হয়ত সংঘাতের পরিচায়ক নয়। জড়বাদী ও চৈতন্যবাদী—দুই সত্তার বৈজ্ঞানিক এখনও পাশ্চাত্য দেশে চোখে পড়ে। প্রাচীন সমাজ বিবর্তনের প্রথম গবেষক মর্গ্যানও ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান এবং 'পরম বুদ্ধিমানের বশ্য থেকে বর্বরের বিকাশের পরিকল্পনার কথা' বলেছেন। ল্যাবরেটরির বাইরে যে বৈজ্ঞানিক 'মহাজাগতিক চৈতন্যের' কথা বলেন তাঁর সমস্যাও তুলনীয়।

দর্শনের ক্ষেত্রে সংঘাত দেখানোর কাজটা আরো সহজ হয়েছে। প্রায় দর্শনের গ্রন্থগুলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মা, পুনর্জন্ম, বেদের অভ্রান্ততা ইত্যাদি

নিয়ে বিবাদের চিহ্ন এত স্পষ্ট রয়ে গেছে যে প্রমাণের জন্য বেশি হাতড়ানো বা দুরকল্পনার দরকার হয় নি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এদের বিকাশের পশ্চাৎপটের পরিচয় সহ সরদেশাই ষড়দর্শন ও তথাকথিত নাস্তিক দর্শনগুলির মূল কথাবোর (প্রমাণ ও তত্ত্ব) বিশ্বাসযোগ্য প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন।

লোকায়ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শনে তো বটেই এমনকি সম্পূর্ণ বর্ণাশ্রমবাদী বেদপন্থী মীমাংসা দর্শনেও ঈশ্বরতত্ত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। "মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্ট যে ভাবে ঈশ্বরের ধারণাকে ব্যঙ্গ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছেন তা ভারতের কোন জড়বাদী দার্শনিক করেন নি।"(২২২) রাধাকৃষ্ণণ সহ বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ধারণা ভারতীয় চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ ঐ ধারণা সমর্থন করে না।

মতবাদের এই বৈচিত্র্য সংঘাতকে এড়িয়ে হয় নি। অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গে লোকায়তের, মীমাংসার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের ও শঙ্কর দর্শনের সঙ্গে সাংখ্যের জড়পরিণামবাদের সংঘাতই এর প্রমাণ।

প্রাচীন সংঘাতের পরিচয় পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত। কিন্তু সংঘাত থেমে থাকে নি, আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে জাজ্বল্যমান সমস্যা হয়ে বিরাজ করছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক রহস্যবাদকে দাঁড় করিয়ে প্রাচীন প্রতিক্রিয়া কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। বিজ্ঞানই যে শেষ কথা নয় এই মত নানা আয়োজনে ছড়ানো হচ্ছে। বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণিত না করে এই পথে এগোন যায় না। সেই কাজে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। সরদেশাই যে সংঘাতের চিত্রণ এঁকেছেন তার একটা উদ্দেশ্য আধুনিক যুবশক্তির হাতে সর্বনাশা পুনরুজ্জীবনবাদের বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার তুলে দেওয়া।

গ্রন্থের শেষ অংশে সংস্কৃতের উপর একটি চমৎকার রচনা যোজিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা তার সৌন্দর্য ও সাহিত্য বৈচিত্র্যের জন্যই আকর্ষণীয় ও পড়ার যোগ্য। একে সরদেশাই মৃত ভাষা বলেও স্বীকার করেন নি। কিন্তু এক জাতীয় সংস্কৃত ভক্ত, যারা প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার শত্রু, এই ভাষাকে হিন্দুধর্ম ও রহস্যবাদের সঙ্গে না জড়িয়ে পারে না। কিন্তু যেমন ল্যাটিন শেখা মানেই খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মেনে নেওয়া নয়, তেমনই সংস্কৃত শেখা মানেই হিন্দুধর্মকে স্বীকার করা নয়। এই সহজ সত্যটি প্রতিষ্ঠার জন্য সরদেশাইএর যুক্তি দেখে স্বভাবতই

জর্জ টমসনের খেদোক্তির কথা মনে পড়ে, "আমাদের হেলেনীয় ঐতিহ্যকে মান্দারিনদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে, নচেৎ সে তার ভক্তদের হাতেই ধ্বংস হবে।"

৫

স্বৈরাচারের অনড় রথের চির অচলায়তন ও প্রতিবাদ হীন যে ভারতবর্ষের ছবি হেগেল থেকে স্পেংলার পর্যন্ত পাশ্চাত্য শোভিনিস্টরা ও সাম্রাজ্যবাদীরা এঁকেছেন, অথবা সংখ্যাতীত বর্ষপূর্বের অতীতেই জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম সত্য দ্রষ্টা ঋষিদের ভারতবর্ষের যে ছবি ভারতীয় শোভিনিস্টরা আঁকেন, দুটোকেই ধাক্কা দিয়ে সরদেশাই সংঘাতময় পরিবর্তনশীল ভারতের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই এ চেষ্টাকে স্বাগত জানানো উচিত। বইটি ভাষার গুণে সহজ পাঠ্যও বটে। দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা ও নির্ঘণ্ট থাকায় পড়া সুবিধাজনক। শুধু সক্রিয় মার্কসবাদীরাই নয় অমার্কসবাদী যুক্তিপন্থী পাঠকও এ গ্রন্থে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। সবচেয়ে বড় কথা পুনরুজ্জীবনবাদের বিপক্ষে ছাড়াও ভারতের বুকে সেঁটে থাকা বহু বর্বর মধ্য-যুগীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও এটি উপযোগী হতে পারে।

এ সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন যে এই চেষ্টা প্রায় প্রথম পর্যায়ের। একটি পথ সরদেশাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। অনেক জঞ্জাল পরিষ্কার করে সেই পথে এগোনো সম্ভব।

এই গ্রন্থের সমীক্ষায় আরো দুজন লেখকের নাম মনে পড়া অনিবার্য—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বি।

চট্টোপাধ্যায়ের ইদানীংকালে প্রকাশিত **সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া** (১৯৭৭) গ্রন্থটির কাছে সরদেশাই অকুণ্ঠভাবে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। আয়ুর্বেদ ও জ্যোতির্বিদ্যার তথ্যগুলি এই বই থেকেই নেওয়া। চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি মূল্যবান হলেও তথ্যের ব্যাপারে সব জায়গায় নির্ভরযোগ্য নয়। ফলে যে তথ্য বিশ্বাসযোগ্য এবং অকাট্য প্রমাণ-সহযোগে উপস্থাপন করা সম্ভব, তা চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থের উপর অতিরিক্ত নির্ভরের ফলে স্থানে স্থানে অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়েছে। এতে মূল বক্তব্যের তেমন ক্ষতি না হলেও মার্কসবাদ বিরোধীদের সমালোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

যেমন, চরকের মত বলে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যার বক্তব্য [illegible] প্রতি মুহূর্তেই নবীকৃত হচ্ছে। পুরোন দেহের উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,

নতুন উপাদান জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু পুরোন দেহের সঙ্গে নতুন দেহের সাদৃশ্যবশত মনে হয় এক দেহই থেকে গেছে (পৃঃ ১৬৭)। চরকসংহিতার ৪. ১. ৪৬ শ্লোকে এই বক্তব্য রয়েছে। চট্টোপাধ্যায়ের বইএ এটি চরকের মত বলা হয়েছে। কিন্তু চরকসংহিতায় থাকলেও এটি বিপক্ষের মত হিসাবে উপস্থাপিত। শ্লোকটি দেখলে এবং টীকা পড়লেও কোনও সন্দেহ থাকে না যে এটি বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদের মত। কিছু পরেই চরকসংহিতায় এটি প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে। তা ছাড়া চরক সাংখ্যকারের মতোই সৎকার্যবাদী। দেহ পরিবর্তনশীল মানলেও পুরোন ও নতুন দেহকে কখনই স্বতন্ত্র মানেন না। এটি লক্ষ্য না করে চট্টোপাধ্যায় মরাত্মক ভুল করেছেন। সেই ভুল সরদেশাইয়ের গ্রন্থেও বর্তেছে।

চট্টোপোধ্যায়ের তথ্যোপস্থাপনে একটা অবাঞ্ছিত শিথিলতার ঝোঁক আছে। সরদেশাই নিজের চেষ্টায় যে তথ্য হাজির করেছেন ও বিচার করেছেন (ভূমিকা, ১, ২, ৩, ৬ অধ্যায়) সেখানে তিনি ঐ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তথ্যসমৃদ্ধ আন্তরিক বৈজ্ঞানিক গবেষক। কিন্তু **সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটির** প্রভাবে একাধিক স্থানে এড়ানো যেত এমন খুঁৎ আবিভূ'ত হয়েছে।

যুক্তি ও দৈবের বিরোধিতার প্রসঙ্গটি (১৬০) আর একটি নিদর্শন। উভয় গ্রন্থেই 'যুক্তি'কে বিবেচনাপূর্ণ বা যুক্তিপূর্ণ প্রয়োগ বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু চরকসংহিতায় 'যুক্তি'র অর্থ বাংলায় যুক্তি বলতে যা বোঝায় তা নয়। এ বিষয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু 'যুক্তি'র স্থান আয়ুর্বেদে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুই লেখকই এর উপর খুব জোর দেওয়ায় একটু আলোচনা করতে হচ্ছে।

চরক সংহিতায় (১।১১।৩০)' দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয় এবং সত্ত্বাবজয় এই তিন রকম ওষুধের কথা বলা হয়েছে। সত্ত্বাবজয় মানসিক সংযম। দৈবব্যপাশ্রয় ওষুধ—দৈব ওষুধ, মন্ত্র, মণি ইত্যাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয় ওষুধই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার উপাদান। চরকের মতে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কাজ ও দ্রব্যের সংযোগে যে বিশেষ ফল হয় এই সামূহিক জ্ঞান যুক্তি। অথাৎ নানা কারণের 'যুক্তি' বা সংযোগে যে ফল পাওয়া যায় তার নিরীক্ষণ যুক্তি। পাশ্চাত্য দর্শনে ইণ্ডাক্শন্ বলতে যা বোঝায় যুক্তি তার নিকটতম একটি প্রতিশব্দ। যুক্তিতেও বিশেষ জ্ঞান থেকে সাধারণ জ্ঞানে পৌঁছনো হয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ন্যায় দর্শন তার প্রমাণ পদ্ধতির

(epistemology) অন্য আয়ুর্বেদের প্রমাণ-পদ্ধতির কাছে ঋণী বলে চট্টোপাধ্যায় মনে করেন। এই অনুমানের সঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু ন্যায়-দর্শনে আয়ুর্বেদের যুক্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয় নি, অনুমানের (inference) অন্তর্গত করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের 'যুক্তি'র বদলে ন্যায়দর্শনে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে একটি বিষয় স্বীকৃত। কিন্তু আয়ুর্বেদে অনুমান ও যুক্তি স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা পেয়েছে। এ থেকে মনে হয় ইণ্ডাক্‌শন্ নামক জ্ঞান আহরণের উপায়টির চর্চার সম্ভবনা থাকলেও, সম্ভবত ন্যায়দর্শন বিষয় নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় বেশি ঝোঁকায় 'যুক্তি' তত্ত্ব ন্যায় দর্শনে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা পায় নি।

'যুক্তি'র আশ্রয় নেওয়া যে আয়ুর্বেদের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চরকসংহিতার যুক্তিকে বাংলায় যুক্তি বলতে যা বোঝায় প্রায় সেই অর্থে প্রয়োগ কি বিষয়টির যথার্থ উপস্থাপনে সহায়ক হয়েছে ?

দেবতাদের পরোক্ষপ্রিয়তা এবং প্রত্যক্ষপ্রিয়তার প্রসঙ্গটিও (১৮২) অনুরূপ। বেদের ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রায়ই একটি উক্তি মেলে, "দেবতারা পরোক্ষপ্রিয়, প্রত্যক্ষবিদ্বেষী।" চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে সরদেশাইয়ের মতে এই ঝোঁক বৈজ্ঞানিকতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের বিরুদ্ধে অলৌকিক অজ্ঞেয়তা-বাদী, অধ্যাত্মিক রহস্যবাদের আক্রমণের সূচক। কিন্তু চট্টোপাধ্যায়ের মতের বিরুদ্ধে অনেক সাক্ষ্য আছে।

এই মতটি শব্দের নিরুক্তি অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রসঙ্গেই এসেছে। উদাহরণস্বরূপ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৩.১) মানুষ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে প্রজাপতি মনুষ্য জাতির বীজ সৃষ্টি করে বলেছিলেন 'মা দুষৎ' 'এ যেন দূষিত না হয়।' সেই থেকেই মানুষ নাম হয়েছে। কিন্তু মাদুষ নাম হল না কেন ? উত্তরে বলা হয়েছে দেবতারা নামের ব্যুৎপত্তি লুকিয়ে রাখতে ভালবাসেন তাই এরকম হয়েছে।

এই কথা বহু নিরুক্তির ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে। কিন্তু নিরুক্তি ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গেই ঐ মত আসে নি। নিরুক্তি ভারতের অতি প্রাচীন কর্ম-যজ্ঞবাদীরা প্রথম এর ব্যবহার করেন। পরে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগেও কোন কোন লোকায়ত রহস্যবাদী (সহজিয়া) ও ভক্তিবাদী সন্তও নিজ মত

স্থাপনের জন্য নানা শব্দের নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনে নতুন নতুন নিরুক্তি করতেন। রামকৃষ্ণও মানুষ শব্দের ব্যাখ্যায় 'মান আছে আর হুঁশ আছে যার' তাকেই মানুষ বলেছেন।[৮] সম্মান বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানের গুরুত্ব বোঝাতেই রামকৃষ্ণ ঐ নিরুক্তি ব্যবহার করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আদর্শ মানুষের দোষহীনতার উপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনে 'মা দ্বষৎ' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাগুলি অবৈজ্ঞানিক, ব্যাকরণসম্মত নয়। সেই দোষ লুকোতে দেবতাদের লুকোনোর প্রবৃত্তির মিথটি সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কিন্তু এই মিথটি প্রাচীন চৈতন্যবাদীরা চৈতন্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি কখনও ব্যবহার করেন নি। যাজ্ঞিকরা, যাঁরা আলোচ্য লেখকদ্বয়ের মতে প্রথমত চৈতন্যবাদবিরোধী ছিলেন, তাঁরাই যজ্ঞের স্থূল প্রয়োজনে মিথটির সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালেও লোকপ্রিয় (লোকায়ত শব্দ যদি আপত্তিকর মনে হয়) রহস্যবাদীরাই বেশি করে নিরুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। মিথটি অবশ্য তখন হারিয়ে গেছে। নিরুক্তি নামক লোকপ্রিয় শব্দকলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মিথটিকে চৈতন্যবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়ানো ঠিক নয়।

উক্ত খুঁৎগুলি অবশ্য মূল বক্তব্যের খুব ক্ষতি করেনি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা হেঁয়ালিতে পড়তে পারেন বলে এগুলি বলা হল। কিন্তু গুরুতর ত্রুটিও এসেছে। তার সঙ্গেও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক গ্রন্থটির যোগ আছে বলে এখানেই বলছি।

একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন: উক্ত প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল মতগুলির পোষক কোন শ্রেণী ছিল? সরদেশাইয়ের দ্বিধাহীন মত বেদান্ত শাসক বর্ণশ্রেণী-গুলির মত। কিন্তু আয়ুর্বেদের জড়বাদের উৎস কোন শ্রেণী? মধ্যযুগের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল কি?

এর উৎপত্তি যে বৈদান্তিক চিন্তার স্রোতের বাইরে এ কথা মানলেও এর প্রকৃত উৎপত্তিস্থল বিষয়ে সরদেশাই খুব স্পষ্ট নন। তাঁর বলা অথর্ববেদের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্পর্ক বা বুদ্ধদেবের আয়ুর্বেদ বিষয়ে আগ্রহ থেকে আয়ুর্বেদীয় জড়বাদের উৎস পরিষ্কার হয় না। সাবেকি মতে অথর্ববেদ আয়ুর্বেদের উৎস হলেও এই মতের বিরুদ্ধে কিছু সাক্ষ্য রয়েছে। অথর্ববেদের ও আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। অথর্ববেদে একটি কৃমিতত্ত্ব আছে। দুরকম কৃমির অস্তিত্ব স্বীকৃত—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দুই কৃমিই

রোগ করতে পারে। অদৃষ্ট কৃমির ধারণায় আধুনিককালের জীবাণু তত্ত্বের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যদি আয়ুর্বেদ অথর্ববেদ থেকেই উদ্ভূত হত তাহলে জীবাণুতত্ত্বের সদৃশ কোন মত আয়ুর্বেদেও পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।, তা ঘটে নি। বরং রোগের কারণ বিষয়ে আয়ুর্বেদের মত স্বতন্ত্র। এতে বায়ু, পিত্ত ও কফ তিন দোষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এদের মধ্যে কোনোটি বেড়ে গেলে রোগ হয়। আয়ুর্বেদের এই তত্ত্বের সংগে সাংখ্যের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুনতত্ত্বের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। সাংখ্যযোগ দর্শন অনুসারেও জড় প্রকৃতির মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে। এগুলি সুষম অবস্থায় থাকলে জড়ের পরিণাম অর্থাৎ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু নিরন্তর ঐ তিনগুণের মধ্যে বৈষম্য ঘটে চলেছে। তাই জড় পরিণামশীল।

শুধু তিন দোষের সঙ্গে সাংখ্য-যোগের তিন গুণের তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে তাই নয়, সাংখ্যের প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, জড় পরিণামবাদ, সৎকার্যবাদ সমস্ত মূল মতগুলি চরকসংহিতার মতবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সাংখ্যদর্শন ও আয়ুর্বেদের এই তাত্ত্বিক অভিন্নতার তাৎপর্য কি? অন্তত এটুকু বলা যায় না কি যে সাংখ্যদর্শন ও আয়ুর্বেদ একই উৎস থেকে প্রবাহিত হয়েছে?

এখন প্রায় তিরিশ বছর আগে **লোকায়ত দর্শন** এবং ইংরেজি **লোকায়ত** গ্রন্থে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নানা যুক্তি দিয়ে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রের ধারা ও লোকায়ত ধারার মূলগত অভিন্নতা প্রমাণ করার জন্য বহু পরিশ্রম করেছিলেন। তার তখনকার মতে লোকায়ত ধারা ভারতের ইতিহাসের একটি অন্তঃস্রোত; এই স্রোত বেদবিরোধী এবং বহু প্রাচীন। এই স্রোতেই তন্ত্র, সাংখ্য ও যোগের জন্ম। বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই নামেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান দুটি স্রোতকে চিহ্নিত করা যায়। লোকায়ত ধারাটি এসেছে কেন্দ্রীয় সমাজে যে অর্ধ-বিপরিণত মাতৃতান্ত্রিক ট্রাইব্‌গুলি এসেছে তাদের আদিম জড়বাদ থেকে। বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধির আকর্ষণে সমাজ সীমান্তের ট্রাইব্‌গুলি লেনদেনের অলক্ষিত প্রক্রিয়ায় সমাজের মধ্যে নতুন জাতি হিসেবে স্থান নিয়েছে। ধর্মশাস্ত্রকারদের লক্ষ্যে পড়ুক না পড়ুক, এটি মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের ও হিন্দু সমাজ সৃষ্টির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাতৃতান্ত্রিক ট্রাইব্‌গুলি থেকেই মধ্যযুগীয় ভারতের শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তম অংশ এইভাবে

এসেছে। এদের জীবনবীক্ষার প্রভাবের ফল সাংখ্য যোগ তন্ত্রের ধারা, যার অনুমেয় মূল রূপকে চট্টোপাধ্যায় লোকায়ত দর্শন বলে মনে করেছিলেন।

এই ধারাটির সঙ্গে বৈদিক ধারার যে সংঘর্ষ আসে তার প্রচ্ছন্ন রূপ শাঙ্কর বেদান্ত ও সাংখ্যের সংঘাতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদের সঙ্গে ঐ ধারার অনস্বীকার্য যোগ রয়েছে। তাহলে তিরিশ বছর আগে চট্টোপাধ্যায় যে মত প্রকাশ করেছিলেন তদনুসারে আয়ুর্বেদের মূলও মাতৃতান্ত্রিক ট্রাইবাল্ সমাজের অন্তর্ভুক্তির প্রবাহের মধ্যে খোঁজা উচিত।

চট্টোপাধ্যায়ের নতুন গ্রন্থে লোকায়তের স্বভাববাদ ও আয়ুর্বেদের স্বভাববাদের কথা বলা হলেও তাঁর পুরোন গবেষণার আলোকে এগোনোর কোন চেষ্টা নেই। কিন্তু তা থাকলে এটাও বলতে হত যে বৈদিক ধারা ও লোকায়ত ধারার স্বাতন্ত্র্য ও বিরোধিতা যেমন অর্ধবিগণীকৃত ট্রাইবাল্ থেকে আসা শ্রমজীবী মানুষের চাতুর্বর্ণ্য শাসিত মধ্যযুগীয় সমাজের শাসকবর্গের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ, আয়ুর্বেদের গ্রন্থগুলির অন্তঃসাক্ষ্য থেকে পরিশ্রম করে যে সংঘাতের চিত্র আঁকতে চেষ্টা করা হয়েছে, তাও ঐ সংগ্রামেরই বহিঃপ্রকাশ।

অবশ্য এই সংগ্রাম শ্রমজীবী মানুষের পরাজয়ের সংগ্রাম। সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন এবং পরোক্ষ রূপেই হয়েছে। সমাজও পরিবর্তন করা যায় নি। প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বেশি করে শেকড় গেড়েছে। তাই সাংখ্য তো বটেই, তন্ত্রও বেদান্তের আত্মসাৎ হয়ে গেছে। আয়ুর্বেদের মূল চরিত্র হারিয়ে যাওয়ার যে কথা চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে সরদেশাই বলেছেন তাও ঐ অধোগতির ইতিহাসের অঙ্গ।

চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত গ্রন্থের মতবাদ যদি ঠিক হয় তা হলে উপরে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে যা বলা হল তাও ঠিক। তাই তাঁর পক্ষে মার্কসবাদী হিসাবে ঐ তত্ত্ব এড়িয়ে যাওয়ায় একটা নৈতিক দোষ আছে। দুঃখের বিষয় সরদেশাই অজ্ঞাতে এই উপেক্ষার দোষে দায়ী হতে পারেন।

চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কারণ জানি না। কোসম্বির একটি উক্তি বিষয়ে তাঁর অনাগ্রহ এ বিষয়ে লক্ষণীয়। কোসম্বির উক্তিটি এ রকম: "ভারতের প্রাচীন ঔষধ পদ্ধতিতে বহু উপযোগী চিকিৎসার সংগ্রহ আছে—কখনও কখনও জঙ্গলবাসীদের কাছ থেকে শেখা।"

জঙ্গলবাসী না বলে আদিবাসী বলা উচিত ছিল। কোসম্বির উক্তির

উপেক্ষার ধ্বনিটি প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু তথ্যটি উপেক্ষণীয় নয়। চট্টোপাধ্যায় (সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি, পৃঃ ১৬) পাদটীকায় দেওয়া এই তথ্যে খানিকটা বিরক্তই মনে হয়। কিন্তু তিরিশ বছর আগে হলে তিনি এর অন্য তাৎপর্য পেতেন।

সরদেশাই যেহেতু আয়ুর্বেদের তথ্যের ব্যাপারে চট্টোপাধ্যায়ের উপর সর্বৈব ভাবে নির্ভরশীল তাই এত কথা বলতে হল। বেদান্ত প্রভাবিত চিন্তাধারার বাইরে আয়ুর্বেদের উৎসের কথা বললেও, চট্টোপাধ্যায়ের পুরোন লেখাগুলিকে উপেক্ষা করায়, তার নতুন ও পুরোন মতের অসঙ্গতির কথা সরদেশাই বলেন নি।

প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে গ্রন্থ পরিবর্তিত হওয়ার কথা সরদেশাই বলেছেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের উপর নির্ভরশীলতার জন্য কোন নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া যায় নি। দ্বিতীয়ত সরদেশাইয়ের মতে জাতিবাদভিত্তিক গ্রামসমাজের পরিবর্তন এত অসম্ভব ছিল যে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘোরে বললেও বেদান্তের বা শাসকগোষ্ঠীর খুব কিছু এসে যেত না।

কিছু সাক্ষ্য আছে যা দিয়ে গ্রন্থ পরিবর্তনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় এবং পৌরানিক ধারণার বিরোধী বৈজ্ঞানিক মত বেদান্তের পক্ষে কত বিরক্তিকর তাও দেখানো যায়।

আর্যভট (খ্রী. ৪৯৯) সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কথা না বললেও আপন কক্ষে পৃথিবীর আহ্নিকগতির সত্যতা আবিষ্কার করেছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত (খ্রী. ৬২৮) আর্যভটের পৃথিবীর নিজ কক্ষে ভ্রমণের তত্ত্বটি আক্রমণ করায় এই তত্ত্ব যে আর্যভট সত্যই আবিষ্কার করেছিলেন তা সংশয়াতীত হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রথম ভাস্করাচার্য (খ্রী. ৬২৯) প্রভৃতি তাঁর অনুগামীরাই আর্যভটের গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক কটি শব্দ এমনভাবে বদলে দিয়েছিলেন যে আর্যভটের গ্রন্থে এই তত্ত্বটির সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। চরকের ক্ষেত্রে যে ব্যাপার চট্টোপাধ্যায় ও সরদেশাই দূর-অনুমান ও আন্দাজ করে বলেছেন আর্যভটের ক্ষেত্রে তা অনস্বীকার্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। নীচের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক একটি বাক্য, **প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ** (আর্যভটীয়ম্ ১/৬) 'চার সেকেণ্ডে পৃথিবী এক মিনিট কোণ ঘোরে।' কিন্তু সমস্ত পুঁথিতেই **ভূঃ** শব্দের বদলে **ভং** অর্থাৎ 'মহাকাশগোলক' শব্দটি পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনের ফলে

বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় মহাকাশগোলকই পৃথিবীকে ঘুরে ঘিরছে। অনুরূপভাবে ক্বাবর্তাঃ (৩।৫) 'পৃথিবীর আবর্তন' শব্দটির জায়গায় ভাবর্তাঃ 'মহাকাশ-গোলকের আবর্তন' শব্দটিই পাওয়া যায়। প্রথম ভাস্করাচার্যের টীকাতেও পরিবর্তিত শব্দগুলিই আছে। তিনি ব্রহ্মগুপ্তের সমসাময়িক। মনে হয় ব্রহ্ম-গুপ্তের আক্রমণেই এই পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য যেখানে আর্যভট নানা যুক্তিতে পৃথিবীর গতি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন বা পৃথিবীর গতি পূর্ব-দিকে বলেছেন সেখানে পাঠ পরিবর্তন করা যায় নি।

প্রথম ভাস্করাচার্য অতি দুঃখেই এই কাজ করেছিলেন তারও সাক্ষ্য রয়ে গেছে। সরদেশাই এক জায়গায় বলেছেন যে পুড়িয়ে মারা না হলেও সমাজ-চ্যুতির জীবন্ত-মৃত্যুর শঙ্কা বৈজ্ঞানিকদের তাড়িত করত। এই কথা প্রথম ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে কত সত্য তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন পৃথূদকস্বামী (আ. ৮৬৪ খ্রীঃ)। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের গোলাধ্যায়ের ৩০শ আর্যার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন "আচার্য আর্যভট পৃথিবীর ভ্রমণ মানতেন···কিন্তু লোকভয়ে ভাস্কর প্রভৃতি এই আর্যার অন্য রকম ব্যাখ্যা করেছেন।"

ব্রহ্মগুপ্তের প্রতি যে সহানুভূতি সরদেশাই দেখিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে প্রথম ভাস্করাচার্যের প্রাপ্য। কারণ আক্রমণটা ব্রহ্মগুপ্তই করেছিলেন। তাঁর আগে বরাহমিহিরও।

অন্তত দুজন জ্যোতির্বিদ এত আক্রমণ সত্ত্বেও আর্যভটকে সমর্থন করে গেছিলেন। একজন উক্ত পৃথূদক স্বামী। দ্বিতীয় জন, আরো সাহসী, তাঁর নাম মল্লীভট্ট (খ্রী. ১৩৭৭)। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর মহাবৈদান্তিক অপ্পয় দীক্ষিত (১৫২০-১৫৯২) ঐ বেদবিরোধী মতটির উপর বর্ণাশ্রমবাদীদের পক্ষ থেকে শেষ কথা বলেন, "আর্যভট প্রভৃতির স্বীকৃত পৃথিবীর ভ্রমণাদি মত বেদ ও ন্যায়ের বিরুদ্ধতার কারণে অবহেলার যোগ্য হওয়ায়···।"[৩] ঐ অবহেলিতদের নাম যেন বইয়ের পরের সংস্করণে অবশ্যই থাকে।

৬

আলোচনায় দ্বিতীয় যে চিন্তাবিদের নাম এসে পড়ে তিনি ধামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বি। চিন্তার ইতিহাস চর্চায় মার্কসবাদীদের পক্ষে সামাজিক ইতিহাসের

কাঠামোকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। সেইজন্যই সরদেশাইকে ভারত ইতিহাসের কাঠামো সম্বন্ধে তাঁর মত পরিষ্কার করে বলতে হয়েছে এবং সেই কাঠামোর সঙ্গে মতবাদগুলির বিকাশের সঙ্গতিও স্থাপন করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে কোসম্বি[৪] ভারতের ইতিহাসের কাঠামোকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সরদেশাই যেন অনেকটা তার অনুগামী। গুপ্তযুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারত চরিষ্ণু ছিল এবং অনড় গ্রামসমাজ যে তত প্রাচীন নয় এই তথ্য প্রথম কোসম্বিই দ্বান্দ্বিক জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠা করেন। শূদ্রদের গ্রীক্ রোমান্ দাস ও সার্ফ থেকে স্বতন্ত্র হেলটদের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথাও কোসম্বি বলেন। কিন্তু সরদেশাই কোসম্বির নাম উল্লেখ করেন নি কেন?

সরদেশাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা না বললে এই সমস্যার সমাধান হত না। কোসম্বির লেখা কিছু কিছু পড়লেও সরদেশাই কোসম্বির পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশ সন্দেহ পোষণ করেন। নিজে গভীর সংস্কৃতজ্ঞ। বিপ্লবী জীবনের হাতে-কলমের অভিজ্ঞতায় এবং অবসরে পড়াশুনো করে ইউরোপ ও ভারতের সমাজ ও সমাজ ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেছেন। অবশ্য পেশাদার গবেষক না হওয়ায় সাধারণ ঐতিহাসিকদের ঢঙে লেখেন নি। কাঠামোর কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারলেও পেশাদারী পদ্ধতি ও সুযোগের অভাবে সংলগ্ন ছবি তৈরি হয় নি, যা কোসম্বির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সরদেশাইএর খাড়া করা ভারত ইতিহাসের কাঠামো উপেক্ষণীয় নয় কিন্তু আংশিক। বিশেষত মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলেও পতন সম্বন্ধে কোন বিশ্লেষণ নেই। সাতবাহন সাম্রাজ্যও উপেক্ষিত। বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় পুরো বিশ্লেষিত হয় নি, পতনের কারণও নয়। অথচ এটা খুব প্রাসঙ্গিক ছিল। গ্রামসমাজের আবির্ভাবের বীজ গুপ্তযুগের পূর্বেই উপ্ত হয়েছিল এ কথা স্বীকার করলেও ব্যাখ্যা করেন নি। আমার ধারণা, কোসম্বির যুগান্তকারী গবেষণার ফলে এর প্রত্যেকটির উত্তর কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে অন্তত সেটি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কোসম্বির সব মতই যে গ্রহণযোগ্য তা বলা হচ্ছে না। কিন্তু এখনও তাঁর গবেষণা অনন্য এবং কোন ভালো ঐতিহাসিকেরই তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। পরবর্তী সংস্করণে মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় থেকে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন (খ্রী. ২৩০) অবধি সময়ের বিশ্লেষণে কোসম্বির বিশ্লেষণকে কাজে লাগালে

সরদেশাইএর গ্রন্থের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। ভারত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসটিও বদলাতে হতে পারে।

৭

এই সমালোচনা যে গ্রন্থের মূল বক্তব্যের বিরোধিতা করার জন্য নয় বোধহয় তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। সত্যের জন্য লড়াইয়ে যারা অসহায়-ভাবে হেরে গেছিল তাদের কাহিনী বলে তরুণদের সামনে আদর্শ স্থাপনের যে যুগোপযোগী কাজ সরদেশাই করেছেন তার আরও সুষ্ঠু সম্পাদনের কথা মনে রেখেই উপরের আলোচনাগুলি করা হয়েছে। গ্রন্থটির তথ্যসমৃদ্ধতা একাধিক মৌলিক বিচার ও উদ্দেশ্যের মহত্বের কোন অস্বীকৃতি এই প্রবন্ধে নেই।

পাদটীকা

১ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে (পৃঃ ৪) দৈবব্যপাশ্রয় ও যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজেরই উল্লেখ আছে। চরকসংহিতার স্থান নির্দেশও নেই। তাঁর নির্দিষ্ট প্রকাশনটি আমার কাছে না থাকায় এই মতের ব্যাপারে স্থান নির্দেশের জন্য নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সম্পাদিত (কলকাতা, ১৮৪৯ শকাব্দ—খ্রীঃ ১৯২৭) চরকসংহিতার আশ্রয় নিয়েছি। অন্য স্থানগুলি চট্টোপাধ্যায় অনুসারে নির্দেশিত।

২ দ্রঃ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা, কলকাতা। ১৯৬১, পৃঃ ২২৬।

৩ দ্রঃ রামনিবাস রায়, আর্যভটকৃত আর্যভটীয় (হিন্দী), নতুন দিল্লী, ১৯৭৬ ; পৃঃ ১৪-১৫।

৪ অ্যান্ ইন্‌ট্রোডাক্‌শন্ টু দ স্টাডি অব্ ইণ্ডিয়ন্ হিষ্ট্রি. বোম্বাই. ১৯৫৬। সব মতগুলিই এতে পাওয়া যাবে। ভারত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা শব্দের কিছু তথ্য 'দ টেক্সট্ অব্ দ অর্থশাস্ত্র', আচার্য কৌটল্যকৃত অর্থশাস্ত্র—অপরনাম রাজসিদ্ধান্ত, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই, ১৯৪৯, পৃঃ ১-৮ প্রবন্ধেও আছে।

আয়ুর্বেদের দর্শন ব্যাপারে কিছু তথ্যের জন্য আমি রাঁচী গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে ঋণী।

—লেখক

প্রসঙ্গ গ্রামশচি

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রসারণ ও ব্যাপ্তিকরণের ক্ষেত্রে যাঁর ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হলেন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আন্তোনিও গ্রামশচি (১৮৯১-১৯৩৭)। জীবিতকালে তাঁর পরিচয় ছিল মূলত একজন সংগ্রামী, একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসেবে। ১৯২৬ সালে মুসোলিনির কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বকাল পর্যন্তও তিনি ছিলেন ইতালিতে শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় একচ্ছত্র নেতা ও সংগঠক। কারারুদ্ধ হবার পরে ১৯২৬-১৯৩৭ এই দশ বছরে, অর্থাৎ, তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবর্ণনীয় প্রতিকূল পরিবেশে ও ফাসিস্ত পুলিসের ভ্রূকুটিকে আগ্রাহ্য করে তিনি লিখে রেখে যান কয়েক হাজার পৃষ্ঠার "কারাগারের পাণ্ডুলিপি" (Prison Notebooks)। গ্রামশচির মৃত্যুর পরে এই সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপিকে বিশেষ গোপনীয়তার সঙ্গে মস্কোতে নিয়ে আসা হয় এবং যুদ্ধ শেষ হবার পরে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়। গ্রামশচির এই পাণ্ডুলিপির নির্বাচিত অংশ ও তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ ধীরে ধীরে ইংরেজি ভাষাতে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও মার্কসবাদীরা গ্রামশচির চিন্তার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বলতে দ্বিধা নেই ভারতবর্ষে গ্রামশচি চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার এবং বলা যেতে পারে গ্রামশচি সম্পর্কে এ দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে তিনিই প্রথম আগ্রহ সঞ্চার করেন। গত কয়েক বছরে গ্রামশচির চিন্তা ও মার্কসীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে কেন্দ্র করে অসংখ্য আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে একাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে গ্রামশচি সম্পর্কে এই

আগ্রহের কারণ কি ? মার্কসীয় তত্ত্বের প্রসারণের ক্ষেত্রে তাঁর বৈপ্লবিক অবদানই বা কি ছিল ? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশের সামগ্রিক ধারাটির সঙ্গে গ্রামশচির চিন্তার সম্পর্কটিই বা কি ধরনের ?

এই ধরনের একাধিক প্রশ্নের প্রতি সুবিচার করতে হলে গ্রামশচির সামগ্রিক চিন্তার দু-একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত বিপ্লবের রণকৌশল প্রসঙ্গে গ্রামশচি যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, তার প্রাসঙ্গিকতা মূলতঃ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—সম্ভবত এই ধারণার ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্বগত বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এখনও তেমনভাবে স্বীকৃত নয়। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের (ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স) কমিউনিস্ট পার্টি এবং নয়া-বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যেই গ্রামশচির প্রভাব এখনও পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। গ্রামশচির চিন্তা সর্বজনীন নয়,— তাঁর তত্ত্বের সীমারেখা উন্নত ধনবাদী দেশকেই কেবলমাত্র স্পর্শ করে— বলা বাহুল্য এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর চিন্তার সার্বিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। দ্বিতীয়ত, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে চিরায়ত মার্কসবাদের অনেকগুলি ধারনাই গ্রামশচির চিন্তায় কখনও বা প্রায় অনুচ্চারিত অথবা হয়ত নতুনভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংসসাধন, পার্টি সংগঠনের নীতিসমূহ, শ্রেণীর গঠন ও বিন্যাস প্রভৃতি প্রশ্নে গ্রামশচির বক্তব্য সাবেকী মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেকটাই ভিন্ন। আরও স্পষ্ট করে বলতে হয় যে গ্রামশচির কাছে মূল প্রশ্নটি ছিল এই যে শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা, মুক্তি, ধ্যানধারণার স্তরে বিপ্লব ঘটাতে না পারলে রাষ্ট্রশক্তিকে শোষিত শ্রেণীর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করা সম্ভব নয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই ধরনের বিষয় মূলত মার্কসীয় তত্ত্বের উপরিকাঠামোগত আলোচনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। গ্রামশচির চিন্তাতেও এই দিকটিই আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় গ্রামশচিকে সেই কারণে উপরিসৌধের তাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়াও হয়ে থাকে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে গ্রামশচির এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রথাগত মার্কসবাদের সঙ্গে তুলনা করলে অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির। সেই সঙ্গে এ কথাও অনস্বীকার্য যে গ্রামশচির চিন্তার এই স্বকীয়তাই মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজনরূপে বুদ্ধিজীবী মহলে স্বীকৃতিলাভ

করেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে গ্রামশচির কাছে এই প্রশ্নটি এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে তাঁর সামগ্রিক চিন্তাকে দুটি পর্বে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

২

আন্তোনিও গ্রামশচির রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বের সময়কাল মোটামুটিভাবে ১৯১০ থেকে ১৯২০। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল তুরিনে প্রায় রুশ বিপ্লবের মডেলে সোভিয়েত ধাঁচের ফ্যাক্টরী কাউন্সিল আন্দোলনের সংগঠন এবং গ্রামশচির সক্রিয় নেতৃত্বদান। পুঁজিবাদী মালিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে ইতালীর শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও গণমুখী। এই পর্বে গ্রামশচি তাঁর একাধিক রচনায় তুরিনের শ্রমিকশ্রেণীর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এমন ধারণাও পোষণ করতেন যে এই স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনই ইতালিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠা করবে। বলা বাহুল্য, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যাতিরেকে যে এই ধরনের আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য, গ্রামশচির নিজের কাছে এই ধারনা তখনও খুব স্পষ্ট ছিল না। পার্টির প্রশ্নটিকে এই পর্বে উপেক্ষা করে যে একটি মারাত্মক ভুল করা হয়েছিল, গ্রামশচি নিজেও সে কথা পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই সময়টি ছিল একদিক থেকে বিচার করলে অত্যন্ত জটিল। রুশ বিপ্লবের সাফল্যের তাৎক্ষণিক প্রভাব, ইতালিতে শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগঠিত রাজনৈতিক দল সোস্যালিস্ট পার্টির শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নে দোদুল্যমানতা, শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যের স্বার্থে সেই মুহূর্তে গ্রামশচি প্রমুখের সোস্যালিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিকল্প নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করার সমস্যা, ফ্যাক্টরী কাউন্সিল আন্দোলনের প্রারম্ভিক সাফল্য, সর্বোপরি ইতালীতে মার্কসবাদ সম্পর্কে অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট ধারণা প্রভৃতি কারণে শেষ পর্যন্ত ফ্যাক্টরী কাউন্সিল আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

শ্রমিক আন্দোলনের এই পরাজয় এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে মুসোলিনির উত্থান ও সেইসঙ্গে ইতালির জনমানসে ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাবের দ্রুত প্রসার, ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ও তার ক্রমবর্ধমান সাফল্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে

শ্রমিকশ্রেণীর ব্যর্থতা, সোস্যালিস্ট পার্টিকে ভেঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পরেও শ্রমিকশ্রেণীকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রভৃতি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গ্রামশচি প্রবেশ করেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্বে। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে এই সময়ে (১৯২১-২৬) তিনি যে জটিল রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার তীক্ষ্ণ, সুচিন্তিত ও আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে এই সময়ে রচিত গ্রামশচির একাধিক প্রবন্ধে। ১৯২৬ সালে গ্রেপ্তার হবার পরে জেলে অবস্থান-কালীন সময়ে তিনি যে "কারাগারের পাণ্ডুলিপি" রচনা করেন, সেখানে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার বিশ্লেষণ বহুলাংশেই ছিল তত্ত্বগত স্তরে গ্রেপ্তার হবার পূর্ববর্তী সময়ে তাঁর চিন্তার প্রতিফলন। এই রকম একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে কয়েদখানায় গ্রামশচি যে "পাণ্ডুলিপি" রচনা করেছিলেন, সেটি ছিল মূলত গ্রামশচির একগুচ্ছ নৈর্ব্যক্তিক ও বিমূর্ত চিন্তার ফলশ্রুতি, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্পর্কটা ছিল অনেকটাই দূরের। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই গ্রামশচির এই রচনাকে রাজনীতি নিরপেক্ষ-ভাবে, অনেক সময় ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করতে সচেষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে "কারাগারের পণ্ডুলিপি" ছিল গ্রামশচির সামগ্রিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যে জটিল রাজনৈতিক সমস্যা ও প্রশ্নাবলীর মীমাংসা রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় থাকাকালে তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয় নি, সেইসব প্রশ্নেরই সমাধান সূত্র তিনি খুঁজেছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অন্তরীণ অবস্থায়।

ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান, দ্রুতলয়ে তার বিকাশ ও প্রভাব বৃদ্ধি, এবং সেই সঙ্গে এই বর্বর শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নিষ্ক্রিয়তা ও কমিউনিস্ট পার্টির অক্ষমতা গ্রামশচিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ১৯২৬ সালে গ্রেপ্তার হবার কিছু আগে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির লিঁয় কংগ্রেসে গ্রামশচি প্রায় দ্বিধাহীনভাবেই বলেছিলেন যে ১৯২২ সালে ইতালিতে ফ্যাসি-বাদের আবির্ভাবের মূল অন্যতম কারণ ছিল ফ্যাসিবাদের পরাক্রম নয়, বিপ্লবী শক্তিগুলির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। গ্রামশচির মনে ক্রমশই এই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় যে বিপ্লবী মতাদর্শের মাধ্যমে সঠিক উপায়ে শোষিত মানুষের চিন্তার কাঠামোর রূপান্তর ঘটাতে ব্যর্থতার কারণেই ফ্যাসিবাদের মত বিপজ্জনক শক্তি

প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল শ্রমজীবী মানুষের চেতনার স্তরে ফ্যাসিবাদের বিকল্প চিন্তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করতে না পারলে নিছক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আহ্বান নিরর্থক। ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানপর্বে গ্রামশচিকে আরও যে প্রশ্নটি ভাবিয়ে তুলেছিল সেটি হল শ্রমিকশ্রেণীকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল করতে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতা। ফাক্টরী কাউন্সিল আন্দোলনের পরাজয় একথা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সুযোগ্য রাজনৈতিক ও আদর্শগত নেতৃত্ব ছাড়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগ্রাম জয়লাভ করতে পারে না। ১৯২১-১৯২৬ পর্বে গ্রামশচি তাই বারে বারেই এই প্রশ্নের বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর কাছে এই কথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে নবজাত ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম দুর্বলতা ছিল নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা এবং এই কারণেই পার্টির আমূল সংগঠনের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্পর্কটি ছিল বহুলাংশেই গতিহীন ও যান্ত্রিক। ১৯২৪ সালে 'গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ' প্রবন্ধে তাই গ্রামশচি লিখেছিলেন যে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের কৃতিত্ব ছিল এখানেই যে এই শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর মূল ভিত্তিভূমিকে অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রামীণ কেন্দ্র ও কারখানার সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে লিঁয় থিসিসে (১৯২৬) গ্রামশচি বলেন যে পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর শুধুমাত্র বাহন হলে চলবে না ; তাকে হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। গ্রামশচির এই বক্তব্যের মূল তাৎপর্যটি হল এই যে পার্টি-নেতৃত্বের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের ঘনিষ্ঠতম সংযোগকে সুনিশ্চিত করতে না পারলে গভীর সংকটের মুখে পার্টির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। এমনই কয়েকটি প্রশ্নের অসাধারণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচয় আমরা পাই গ্রামশচি রচিত 'কারাগারের পাণ্ডুলিপিতে"।

৩

শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গ্রামশচির কাছে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় সেটি হল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটি সংগঠিত পুরসমাজের (civil society)

উপস্থিতি। রাশিয়ার মত অনুন্নত দেশে ইতিহাসগত কারণে পুঁজিবাদের আর্থ সামাজিক বিকাশ প্রাক্-বিপ্লবপর্বে কখনই সুবিন্যস্ত ছিল না এবং তার ফলে পুঁজিবাদের সামগ্রিক প্রভাব থেকে রুশ সমাজব্যবস্থার কাঠামো ছিল আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশী মুক্ত। গ্রামশির ভাষায়, রাশিয়াতে এর ফলে কোন পুরসমাজের অস্তিত্বই কার্যত ছিল না; যা ছিল সেটি হল এক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রযন্ত্র। এই সূত্রকে অনুসরণ করে গ্রামশি তাঁর "পাণ্ডুলিপিতে" একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর মতে, রাশিয়ার মতো অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত করা ও তাকে দখল করা সম্ভব, কারণ সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজদেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মাত্র। অপরদিকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সমাজ-দেহের বিভিন্ন অংশে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ফলে সেখানে গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী পুরসমাজ এবং এই পুরসামাজিক কাঠামো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিখার মতো বেষ্টন করে রাখতে সক্ষম হয়। এক কথায়, এই পুরসামাজিক প্রভাবে জনমানসে গড়ে ওঠে পুঁজিবাদের সম্পর্কে এক ধরনের সহিষ্ণুতা এবং তার ফলে এই সব দেশে পুরসমাজ রাষ্ট্রশক্তির রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই গ্রামশির মতে, এই সব দেশে পুরসমাজের রক্ষাব্যূহকে ভেদ না করে সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্রকে আঘাত করা সম্ভব নয় এবং সেই কারণে এই সব ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ও মুখ্য কাজটি হল পুরসমাজের বিভিন্ন স্তরে নিজস্ব আধিপত্য সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করে ধনতন্ত্রের সঠিক আধিপত্যের সঙ্কোচন ঘটানকে সুনিশ্চিত করা। পুরসমাজের বিভিন্ন স্তর বলতে গ্রামশি চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন সামাজিক পরিমণ্ডলের সেই ক্ষেত্রগুলিকে, যা ব্যক্তির জীবনে অপরিহার্য এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি প্রভাব থেকে আপেক্ষিকভাবে মুক্ত। অর্থাৎ, শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে মানুষের মনন ও চিন্তাকে প্রভাবিত করে এমন অসংখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে গড়ে ওঠে যে পুরসমাজ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই পুরসামাজিক কাঠামোই প্রকৃত অর্থে আপামর জনসাধারণের সামগ্রিক চেতনার নিয়ন্ত্রণ কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। তাই গ্রামশি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে রাশিয়ার মতো অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হানার রণকৌশলকে অনুসরণ করে উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সাফল্য আসতে পারে না। এই সব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর স্ট্র্যাটেজির মূল

বৈশিষ্ট্য হবে পুরসামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে করায়ত্ত করে জনসাধারণের মনন ও চিন্তার স্তরে পুঁজিবাদের বিকল্প মতাদর্শের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান রক্ষাবলয়কে দখল করা।

সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটির সঙ্গে চিন্তা ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আধিপত্য সুনিশ্চিত করার বিষয়টি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এ কথা লেনিনও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন। গ্রামশচি নিজেও এ কথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই ধারণাটিকে তত্ত্বগত স্তরে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত লেনিনকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে গ্রামশচি এই প্রশ্নটিকে যে অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, তা এক কথায় চমকপ্রদ ও অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে গ্রামশচির চিন্তার এই বিশেষ দিকটিকে কেন্দ্র করে সাধারণভাবে দুটি ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। ইউরোকমিউনিজমের প্রবক্তাদের অনেকেই গ্রামশচির এই চিন্তাকে তাঁদের নিজস্ব সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বলার চেষ্টা করেন যে তিনি বুর্জোয়া ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে প্রকারান্তরে সংসদীয় ও শান্তিপূর্ণ পথে শ্রমিকশ্রেণীর রণকৌশলকে উদ্ভাবন করার পরামর্শ দিয়েছেন। অপরদিকে ট্রটস্কিপন্থী অনেক বুদ্ধিজীবী, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্রিটেনের খ্যাতনামা তাত্ত্বিক পেরী আণ্ডারসন, মনে করেন যে গ্রামশচির এই অবস্থান কার্যত মার্কসবাদের সনাতন বিপ্লবী চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং রাষ্ট্রশক্তি দখলের প্রশ্নে হিংসা ও বলপ্রয়োগের প্রশ্নটিকে যথার্থ মর্যাদা না দিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী রণকৌশলের প্রশ্নটি বিচারের ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। উপরোক্ত দুটি দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তার আঙ্গিকের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও কার্যত উভয় ধারাই গ্রামশচিকে সংশোধনবাদীরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। ইউরোকমিউনিজমের প্রবক্তাগণ এই 'সংশোধনবাদকে' সমর্থন করেন এবং তার যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হন। অপরদিকে উগ্র বামপন্থীরা গ্রামশচির এই তথাকথিত 'সংশোধনবাদী' দৃষ্টিভঙ্গীকে বিপ্লববিরোধী আখ্যা দেন।

গ্রামশচির চিন্তা সম্পর্কে এই জাতীয় ব্যাখ্যা শুধু ভুল নয়, বিভ্রান্তিকর

বটে। গ্রামশ্চি তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে রাষ্ট্রশক্তি দখলের প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত জটিলতাকেই মূলত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ফ্যাক্টরী কাউন্সিল আন্দোলনের পর্যায়ে এবং পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদী চিন্তার প্রবল প্রকোপ বারে বারেই তাঁকে একটি মৌলিক প্রশ্নের প্রতি ধাবিত করেছিল: ইতালি ও রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ভিন্ন হতে বাধ্য, কারণ ইতালিতে পুরসামাজিক কাঠামোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও সাফল্যের অন্যতম কারণটি ছিল অত্যন্ত কৌশলে পুরসামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের সফলতা। পুরসমাজের পরিমণ্ডলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটির গুরুত্বকে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময়ে উপলব্ধি করতে পারে নি বলেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পার্টির ব্যর্থতাও ছিল প্রায় অনিবার্য। এই সঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। গ্রামশ্চি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রশক্তির চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি হিংসা বা বলপ্রয়োগের বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। "কারাগারের পাণ্ডুলিপিতে" তিনি খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্র হল প্রকৃতপক্ষে পুরসমাজ ও রাষ্ট্রীয় সমাজের একটি যোগফল, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি হল শাসকশ্রেণীর আধিপত্য ও পশুশক্তির সমন্বয় মাত্র।

৪

গ্রামশ্চির তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী সনাতন মার্কবাদের বিকাশের সঙ্গে যে কতটা গভীরভাবে সম্পৃক্ত, সেটি বিশেষভাবে বোঝা যায় "কারাগারের পাণ্ডুলিপিতে" পার্টি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকে। তাঁর কাছে পার্টি শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী ও বিপ্লবের চালিকাশক্তি নয়। গ্রামশ্চির মতে, পার্টিকে হতে হবে গোটা সমাজজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার এমনই এক জীবন্ত ও সার্বিক প্রতীক, যার ফলে জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক হবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে তিনি অসাধারণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেন ইতালির নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মাকিয়াভেলি সৃষ্ট 'দ্য প্রিন্স' বা দলপতির চরিত্রকে। তিনি একথা

বলতে দ্বিধা করেন না যে মাকিয়াভেলি যেমন এই রূপকল্পের মাধ্যমে ইতালির জাতীয় জীবনের সামগ্রিকতার প্রতীকরূপে 'দলপতি'কে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টিকেও হতে হবে বর্তমান সমাজে দলপতির আধুনিক সংস্করণ। মাকিয়াভেলির 'দলপতির' মতো পার্টিকেও হতে হবে সমগ্র জনগণের চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, চেতনা ও উপলব্ধির এই স্তরে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন হল পার্টির সঙ্গে জনগণের সাংগঠনিক ও বৌদ্ধিক স্তরে নিবিড়তম সংযোগ স্থাপন করা ও সেই সংযোগসেতুকে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করা। তার জন্য প্রয়োজন হল, গ্রামশচির মতে, পার্টিতে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ঝোঁককে সম্পূর্ণ পরিহার করে যথার্থ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, মধ্যস্থলে আসীন সক্রিয় কর্মী এবং তৃণমূলে অবস্থানকারী জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। সেই সঙ্গে গ্রামশচি বিশেষ গুরুত্ব দেন পার্টিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার প্রশ্নটিকে। তথাকথিত পোশাকি বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির আশা-আকাঙ্ক্ষার শরিক হওয়া সম্ভব নয়, এবং গ্রামশচির মতে, তার প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন হল শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব বুদ্ধিজীবীকে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং গ্রামশচির মতে, সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তবে সম্ভবপরও, কারণ প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেই রয়েছে বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক হবার বিরাট সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে।

৫

একটি প্রবন্ধের পরিসরে গ্রামশচির চিন্তার সমস্ত দিক ও উপাদান নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। গ্রামশচির চিন্তার মৌলিকত্বকে প্রতিষ্ঠা করা ও আজকের দিনে তাঁর তত্ত্বের ক্রমবর্ধমান প্রাসঙ্গিকতাকে চিহ্নিত করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রামশচির দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর চিন্তার তাত্ত্বিক বিন্যাস, সর্বোপরি তাঁর রচনাশৈলী সবই এক কথায় অভিনব ও সনাতন মার্কসবাদের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে চিরায়ত মার্কসবাদের বিশেষত লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে গ্রামশচির চিন্তার কোন মৌলিক

বিরোধ ছিল। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামশচির চিন্তা ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিপূরক এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃজনশীল মার্কসবাদের ব্যাপ্তি ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করতেই সাহায্য করেছে।

গ্রামশচির মৃত্যুর পরে পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশে-বিদেশে গ্রামশচি আজ সমাদৃত হচ্ছেন মূলত একজন অনন্যসাধারণ মার্কসীয় তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী রূপে। এই সমাদর নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের গ্রামশচির প্রতি আরও একটা বাড়তি দায়িত্ব আছে। গ্রামশচিকে সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন মূলত একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে নয়। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই ব্যক্তিটির প্রধান পরিচয় তিনি ছিলেন আজীবন একজন কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের চিরন্তর সাথী ও নেতা। একাধারে বুদ্ধিজীবী ও সংগঠক এই মানুষটির মুসোলিনির কারাগারে মৃত্যু হয় একজন কমিউনিস্ট বন্দী হিসেবে। এই কমিউনিস্ট সত্তাই আন্তোনিও গ্রামশচির সবচেয়ে বড় এবং শেষ পরিচয়।

প্রসঙ্গ ঃ দি ন্যাশানাল পেপার

অমর দত্ত

১

১৮৬৫ খ্রী: রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাদেশিকের সভা স্থাপন করেন। রাজনারায়ণের বুর্জোয়া ভাবাদর্শজাত স্বাদেশিকতার চিন্তায় (ইউরোপের পাঠশালায় পড়ে আমাদের মনে প্রথম স্বদেশ নামক শব্দটি রেখাপাত করে এবং ইংরেজ বুর্জোয়াদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতি আমাদের রাজা-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবতে শিখিয়েছে বলে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জনক রাজনারায়ণ নিজে উল্লেখ করেছেন।) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র (১৮৪০ ?—১৮৯৪) প্রভাবিত হন। বেশভূষায়, কাব্যে, গানে, নাট্যে, ধর্মে এবং অন্যান্য আচার-আচরণে জাতীয়তাবোধের চেতনা মুকুলিত ও বিকশিত হতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু বলেছেন যে তাঁর লেখা **'Prospectus of a Society for the promotion of National Feelings among the Educated Natives of Bengal (জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা)'** পড়ে নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপন করেন।[১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকতার ভাবকে জাগিয়ে তুলতে ১৮৬৫ খ্রী: ২রা আগস্ট নবগোপাল **'The National Paper'** নামে এক ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন।[২] পত্রিকাটির প্রকাশ গত শতাব্দীর সাতের দশকের কোন সময়ে রহিত হয়। পত্রিকাটি ১০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমান বিধান সরণি) থেকে প্রকাশিত হত। নবগোপাল মিত্র **'National School', 'National Press', 'National Gymnasium'** প্রভৃতি স্থাপন করায় তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'ন্যাশানাল মিত্র।' ১৮৬৭ খ্রী:—৭১ খ্রী পর্যন্ত **'The National Paper'** বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

২

The National Paper-এ প্রকাশিত 'A National Gathering'[৩] শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতীচ্যানুরাগী ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের দেশীয় রীতিনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিন্দা করা হয় এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ডিবেটিং ক্লাব বা অনুরূপ সংগঠনগুলির আনুষ্ঠানিক রূপ জনিত সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রবন্ধে উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণী হিন্দুর মিলনভূমি হিসাবে একটি জাতীয় সংগঠনের প্রস্তাব করে শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, উৎসব প্রভৃতি সেলজ ভিত্তিক করার পরিকল্পনার কথা বলা হয়।

হিন্দু কলেজের শিক্ষক শ্রীভোলানাথ পাল এম.এ অধ্যাত্মবাদের সমালোচনা করে বলেন যে অধ্যাত্ম-বাদ বিজ্ঞানভিত্তিক নয় এবং অনুমান (hypothesis)ও মতবাদ হিসাবে ক্ষতিকারক। 'A discourse on Spiritualism'[৪] শীর্ষক প্রবন্ধে ভোলানাথ পালের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে বলা হয় যে অধ্যাত্মবাদের বস্তুগত ভিত্তি আছে এবং মেস্‌মেরিজম্, হিপ্নোটিজম্ প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদের বস্তুগত ভিত্তি প্রমাণ করে— উক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় যে জীববিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বে একই সঙ্গে পারদর্শিতা আছে এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অবরোহী ও আরোহী পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালালে অধ্যাত্মবাদের বস্তুগত ভিত্তি খুঁজে পেতে পারেন।

The National Paper এ সংরক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে হিন্দুনারীর স্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। Zenanah Reform নামক প্রবন্ধে বলা হয়, সমাজে হিন্দুনারীর স্থান ক্রীতদাসীর মত একথা ঠিক নয়, কেননা আত্মীয়স্বজন বা আত্মীয়স্বজনদের বন্ধু-বান্ধব বা পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে তাদের মেলামেশার অধিকার আছে। প্রবন্ধটিতে ইউরোপীয় ও দেশীয় খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীদের দিয়ে হিন্দুনারীকে ইংরাজী শিক্ষাদান অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত নিজ স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকজন মহিলাকে সুশিক্ষিতা করে তুললে শিক্ষয়িত্রীর সমস্যা মিটবে বলে মন্তব্য করা হয়। সন্তানকে সাহসী ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হিন্দুনারীর কর্তব্য হওয়ায় হিন্দুনারীকে কেবল সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলে প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয়েছে।

'Women Worth and the Zenana'[৮] শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, নারীকে পুরুষের মত সর্ববিষয়ে শিক্ষিত করলে অথবা পুরুষের মত বহির্জগতের কাজের সঙ্গে যুক্ত করলে সমাজ নারীর অন্তর্জগতের সৌন্দর্য ও শ্রী থেকে বঞ্চিত হবে এবং গৃহের শান্তি ও মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হবে।

'Mission of English Women'[৯] শীর্ষক প্রবন্ধে ইংরাজ মহিলাদের সঙ্গে দেশীয় মহিলাদের অবাধ মেলামেশার সমালোচনা করে বলা হয় যে ইউরোপীয় ও দেশীয় সমাজের পার্থক্যজনিত কারণেই ইংরাজ মহিলারা দেশীয় মহিলাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করার অধিকার অর্জন করেন নি।

'Women is made for Home'[১০] নামক আর একটি প্রবন্ধে নারী সম্পর্কে National Paper-এর সীমায়িত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধে সমকালীন প্রতীচ্যানুরাগীদের নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের প্রবণতার সমালোচনা করে বলা হয় যে নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার সমর্থকরা লক্ষ্যাভিমুখীন নন এবং তাঁরা ইংরাজ মহিলাদের চপলতা ও অন্যান্য ত্রুটিসমূহকে দেশীয় মহিলাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাতে চলেছেন। হিন্দু নারী গৃহের শান্তির জন্য এবং নারীকে গৃহকর্মে সুশিক্ষিত করে তোলাই দেশীয় সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদেশী শাসনে আয়ারল্যাণ্ডের সর্ববিধ বিকাশ ও উন্নতি রুদ্ধ হয়েছে বিবেচনা করে 'The Grievances of Ireland'[১১] শীর্ষক এক সংবাদে বলা হয়েছে যে পুরাতন ধর্মমতে (ক্যাথলিক মতবাদে) বিশ্বাসী আইরিশ জনগণের সর্ববিধ জীবিকার পথ আইন প্রণয়ন করে বন্ধ করা হয়েছে—আইরিশ জনগণ জমির মালিকানার অধিকার হারিয়েছে ; সর্ববিধ শিল্পকর্ম আইনের সাহায্যে বন্ধ করা হয়েছে। সংবাদটিতে আয়ারল্যাণ্ডের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের জন্য, জাতীয় সম্পদের বিনষ্টির জন্য ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টকে দায়ী করা হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডের লর্ডস ও কমন্সদের সার্বভৌমত্ব অর্জন ব্যতিরেকে আইরিশ জনগণের দারিদ্র্যের অবসান হতে পারে না বলে প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয়েছে।

'Kobirajes'[১২] নামক প্রবন্ধে উদারনীতিবাদের মুখোশ ঢাকা সংকীর্ণতা-বাদী ব্রিটিশ প্রশাসনের নিন্দা করে মন্তব্য করা হয়েছে যে মেডিক্যেল কলেজের certificate ব্যতিরেকে কবিরাজদের চিকিৎসা ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ

অযৌক্তিক এবং জনগণের, বিশেষ করে মহিলাদের দুঃখ দুর্দশাকে সম্প্রসারিত করবে। মেডিকেল কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে প্রবন্ধটিতে বলা হয় যে কমিটির সদস্যগণ দেশীয় কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন, সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিনষ্ট হবে এবং উক্ত কবিরাজী ব্যবস্থায় বিশ্বাসী জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের জমিদার-শ্রেণী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যের সমালোচনা করে 'The Bengal Zemindars'[১১] নামক প্রবন্ধে বলা হয় যে অনেক জমিদার রায়তদের উপর অত্যাচার করলেও সমগ্র শ্রেণী হিসেবে জমিদারদের উপর দোষারোপ করা উচিত নয়—কেননা জমিদার-শ্রেণী স্কুল-কলেজ- চিকিৎসালয়-রাস্তা-ঘাট-পুষ্করিনী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও নির্মাণে প্রচুর অর্থদান করে থাকেন; মফঃস্বলের ইউরোপীয় জমিদারগণও জলাশয়, রাস্তাঘাট প্রভৃতির নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু এই-গুলির সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের যোগ আছে—ইউরোপীয় জমিদারদের বাগিচায় জলের প্রয়োজন—নীল, চা, তুলা প্রভৃতির বাজারে প্রেরণের জন্য উপযুক্ত রাস্তার প্রয়োজন—দেশীয় জমিদার-শ্রেণী কৃষিজীবী নয়, সুতরাং তাঁদের প্রচেষ্টা ও অবদান নিছকই সেবামূলক ও জনহিতকর।

উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার রাজা রাজকিষেণ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ ককরেলকে এক পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে সরকারের শিক্ষাসেচ গ্রহণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলা হয় যে শিক্ষাসেচ আসলে উচ্চ শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় করমাত্র—কেননা বাংলাদেশের গ্রামের পাঠশালায় অঙ্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে—কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর সংখ্যা বিরল—সুতরাং শিক্ষাসেচের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থেই ব্যয়িত হওয়া উচিত এবং উচ্চশ্রেণীই নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষিত করবে। The National paper এ প্রকাশিত 'The Educational Cess'[১২] প্রবন্ধে রাজা রাজকিষেণের বক্তব্য সমর্থন করা হয়।

The National paper-এ প্রকাশিত 'Primary Education in Bengal'[১৩] শীর্ষক এক প্রবন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র প্রস্তাবিত প্রাথমিক

শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিম্ন বঙ্গের আনুমানিক জনসংখ্যা ৭০,০০০,০০০ ধরে লালবিহারী দে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৬০ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর হিসাব নিম্নরূপ :

৪০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যয়—	৪৮ লক্ষ টাকা
পরিদর্শনের জন্য ব্যয়—	৩ লক্ষ টাকা
৮০ নর্মাল স্কুলের ব্যয়—	৩ লক্ষ টাকা
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যয়—	৩ লক্ষ টাকা
অন্যান্য—	৩ লক্ষ টাকা
মোট ব্যয়	৬০ লক্ষ টাকা

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে উক্ত অর্থ সংগ্রহের উপায়ও নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে ৩৮ লক্ষ টাকা জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং সরকার ২২ লক্ষ টাকা দেবেন।

'Primary Education in Bengal' নামক প্রবন্ধটি National Paper-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে[১৪] বলা হয়েছে যে গ্রামের পাঠশালায় রায়তদের সন্তানেরা শিক্ষালাভ করতে পারে এবং গুরু মহাশয়দের পরিচালিত পাঠশালা যথোপযুক্ত—সমস্ত রায়তেরা সন্তানদের সুশিক্ষিত করতে চাইলে পাঠশালাগুলির মান উন্নত হত—গ্রামাঞ্চলে জমিদার শ্রেণীর আর্থিক সাহায্যে অথবা সরকার ও জমিদার শ্রেণীর যৌথ সাহায্যে উচ্চ বাংলা ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে—বর্তমানে অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে শিক্ষাকে যেভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে অনুরূপভাবে রেভারেণ্ড দে এ দেশে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছেন, কিন্তু এ দেশের পটভূমিকায় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার চিন্তা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর এবং সরকারের বৈধ কার্যাবলী সম্বন্ধে রেভারেণ্ড দে মহাশয়ের অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রবন্ধটিতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের দায়িত্ব বিষয়ে মন্তব্য করে বলা হয়েছে যে রায়তদের শিক্ষালাভের চাহিদা অনুযায়ী সরকারের সাহায্যদান বিধেয়, কিন্তু রায়তেরা সন্তানদের শিক্ষাদানের চেয়ে কৃষিক্ষেত্রের কাজ-কর্মকে অধিকতর পছন্দ করে। প্রবন্ধটিতে আরো বলা হয়েছে, একথা সত্য যে বাংলাদেশের জমিদারেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় সরকারকে কম কর দিয়ে

থাকেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে ও রায়তদের ঘামে জমিদার শ্রেণীর সম্পদের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, কিন্তু শিক্ষার জন্য জমিদার শ্রেণীর নিকট হতে বাধ্যতামূলক কর আদায় অবৈধ—কেননা জমিদার শ্রেণীর নিকট হতে অনুরূপ কল্যাণমূলক কর্মের প্রত্যাশার শেষ নেই। অবশ্য রায়তশ্রেণীকে সুশিক্ষিত করার জন্য জমিদারদের আর্থিক সাহায্যের নৈতিক দিকটিকে একেবারে অস্বীকার করা হয় নি।

The Indian Economist পত্রিকায় বলা হয় যে সরকার রাজস্বের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং দেশের উন্নতিরও ব্যাহত হয়েছে। **The National Paper**[১৪]-এ এর প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে যে বিজিত দেশের উন্নতির জন্য সমাজের উচ্চশ্রেণীর আর্থিক সমৃদ্ধি প্রয়োজন—উচ্চশ্রেণীর সামাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার স্বাভাবিক অধিকার প্রয়োগের ব্যর্থতাই ভারতবর্ষকে বিজিত দেশে পরিণত করেছে—সমাজের অর্থনীতিতে উচ্চশ্রেণীর স্বাভাবিক অধিকার স্বীকৃত হলেই সমাজের মঙ্গল—লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

'What Impedes our National Growth'[১৬] শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হিসাবে স্ব-নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে ইংরাজ জাতির বহুগুণের আমরা সমাদর ও অনুকরণ করি, কিন্তু তাদের স্ব-নির্ভরতা ও আত্ম-বিশ্বাস আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—ফলে এদেশীয়রা জাতীয়তাবোধের চিন্তাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাণিজ্যকর্মে সাফল্য অর্জন করে নি, নিছক সরকারী অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেছে।

চিন্তা ও অনুভূতির স্বাধীনতাকে জাতীয়তার সংজ্ঞা হিসাবে উল্লেখ করে **'Our Ideal of Nationality'**[১৭] শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ব্রিটিশের অধীনতা আমাদের জাতীয়তাবোধের অন্তরায় নয়, কেননা আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে এবং আমাদের সামাজিক অনুশাসন ও বিধিসমূহের আমরা ইচ্ছানুরূপ রূপ দিতে পারি। উক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যে হিন্দুর আচার-আচরণ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, আহার-বিহার, সুকুমার শিল্প, জীবিকা প্রভৃতির একটা নিজস্বতা আছে এবং হিন্দুর সেই নিজস্বতাই ভারতীয় জাতীয়তা।

The National Paper[১৮]-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, যে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা নিয়ে আমরা বড়াই করে থাকি সেই শিক্ষা আসলে আমাদের মধ্যে কতকগুলি বাচাল ও ঝটতলার উকিলের জন্ম দিয়েছে—এই শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি সৃষ্টি হয়নি, অথচ একটা জাতি মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গর্ব করতে পারে। নিবন্ধটিতে আরো বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নয়, জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে যথার্থ জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করলেই আমাদের উন্নতি হবে।

হিন্দু জাতীয়তার স্বরূপ নির্ণয় করে 'Hindoo Nationality'[১৯] শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে এই হিন্দু জাতীয়তা নিজের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে চায়—অন্যকে ধর্মান্তরিত করে নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চায় না এবং বিদেশীদের প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণা পোষণ করে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রয়ের দশকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীরা অসবর্ণ বিবাহের সপক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন এবং সরকারকে উক্ত বিবাহের অনুমোদক একটি বিল পাশ করার অনুরোধ জানান। এই বিল সর্বজনীন বিবাহ বিল বা সাধারণভাবে ব্রাহ্ম বিবাহ বিল নামে পরিচিত (১৮৭২ খ্রীঃ উক্ত বিল পাশ হয়)। National Paper-এ The Native Marriage Law (Oct 26, 1870), The Marriage Bill (April 19, 1871) এবং ঐ জাতীয় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধসমূহে সরকারের সাহায্যে বিবাহ বিল প্রণয়ন প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সরকারকে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

পাথুরিয়া ঘাটায় খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ধর্ম-রক্ষিণ সভায় হিন্দু পুরুষের বহুগামিতার নিন্দা করে প্রতিকারের চিন্তা করা হয়। এই প্রসঙ্গে The National Paper[২০]-এ মন্তব্য করা হয় যে উক্ত সভা বহুগামিতা-রূপ সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে যেন সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা না করে—হিন্দুর সামাজিক ত্রুটি হিন্দুকেই দূর করতে হবে।

The National Paper-এ বাৎসরিক চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশিত হত। ১৮৬৭ খ্রীঃ চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখে The National Paper[২১] এ-বলা হয়,

উৎসবের সাফল্যে উদ্যোক্তাদের আত্মহারা হওয়া উচিত নয় বা আত্মতৃপ্তি লাভ করা উচিত নয়—তাঁরা নিছক একটি আন্দোলনের শুরু করেছেন—যথার্থ আন্তরিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা থাকলে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা একটি জাতীয় উদ্যোগে পরিণত হতে পারে এবং সর্বশ্রেণীর হিন্দুর একটি মিলন-ভূমি গড়ে উঠতে পারে. সরকারও কোন বিষয় সম্বন্ধে সমগ্র জাতির মতামত জানতে পারেন, ফলে সরকারেরও উপকার হয়।

The National Paper সাধারণভাবে হিন্দুদের এবং বিশেষভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র হলেও অসম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান সমাজের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী অবহেলার নিন্দা করেছে। **'The Education of the Mahomedans'**[২২] শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে এবং পূর্বনির্দিষ্ট কোন সংস্কার অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে সরকার এই অবহেলা প্রদর্শন করেছে। প্রবন্ধটিতে আরো বলা হয়েছে যে হিন্দুদের জন্য সরকারী বাংলা বা দেশীয় বিদ্যালয় অথবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলা বা দেশীয় বিদ্যালয় রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের জন্য অনুরূপ বিদ্যালয় বিরল—সরকারের উচিত মুসলমানদের জন্য সমস্ত দেশ জুড়ে অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করা, বিশেষ করে যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যা বেশি সেই সব অঞ্চলে অবশ্যই অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ফারসী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয়।

১৮৭০ খ্রীঃ ৯ই জুনের **Englishman** পত্রিকা থেকে জানা যায় যে সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। ১৮৭০খ্রীঃ ১৫ই জুনের **The National Paper**-এ বলা হয়, আসল সমস্যা হল শিল্প-বাণিজ্যের--সরকার এদেশের শিল্প বাণিজ্যের উপর থেকে অযৌক্তিক বিধি নিষেধ তুলে নিলে দেশের যথার্থ মঙ্গল হবে।

৩

রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধের আদর্শ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঠাকুরবাড়ীর যুবকদের অর্থানুকূল্য নবগোপাল মিত্রের জীবন ও কর্মকে প্রভাবিত করেছে। রাজনারায়ণের চিন্তায় স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবোধ প্রায় প্রতিশব্দ

তুলা। তাঁর প্রেরণা থেকেই হিন্দুমেলার জন্ম। নবগোপাল মিত্র এই মেলার সহকারী সম্পাদক ও একনিষ্ঠ কর্মী। নবগোপালের বস্তু জীবনের মাধ্যম হিন্দুমেলা এবং জীবনের মাধ্যম The National Paper--একটি অন্যটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই জন্য মেলার কিঞ্চিৎ আলোচনা ব্যতিরেকে The National Poper এর আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

শুধু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা নন, রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর, দেবেন্দ্র মল্লিক প্রমুখ কলকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি হিন্দুমেলার সঙ্গে জড়িত হন। বেনিয়ানগিরি, মুৎসুদ্দীগিরি বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে এঁরা অনেকেই ধনাঢ্য হয়ে উঠেছিলেন—শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য এঁদের বুর্জোয়া ভাবাদর্শে সামন্ততান্ত্রিক নির্যাস যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সংস্কারবাদী ধারার পুষ্টিসাধনে এঁদের প্রভাব অনস্বীকার্য। হিন্দুমেলার সমাজ সংস্কার চিন্তাকেন্দ্রিক কর্মে (বিশেষ করে সমাজে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের রক্ষণশীল সংস্কারবাদী ধারাটি বহুক্ষেত্রেই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ১৮৭০ খ্রীঃ হিন্দুমেলার চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ১০০ টাকা মূল্যের একটি পুরস্কারের বিষয় ছিল—**'How a Hindoo widow in the present state of Society can obtain livelihood without fringing its rules and usages'** পুরস্কারটির ঘোষক ছিলেন রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর। বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬ খ্রীঃ) পাশ হওয়ার বহু বৎসর পর হিন্দুমেলা বা জাতীয়মেলার প্রতিযোগিতায় অনুরূপ বিষয় জাতীয়তাবোধের সংস্কারবাদী ঝোঁকটিকে প্রমাণ করে।

হিন্দুমেলা হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মিলনভূমি হওয়ায় সংস্কারবাদী জাতীয়তাবোধের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত মুক্তধারাটিও লক্ষ্য করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ীর কোন কোন যুবকের মধ্যে এই ধারা লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু আমার দেখা ১৮৬৭ খ্রীঃ হতে ১৮৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত The National Paper-এ বুর্জোয়া জাতীয়তাবোধের সংস্কারবাদী ধারাটি মুখ্য হয়ে উঠেছে।

হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার প্রাণপুরুষ রাজনারায়ণ বসুর লেখায় ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মোহভঙ্গের সুর সুস্পষ্ট। তিনি 'একাল সেকাল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষসকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোন কথাই চলে না।'

১৮১৩ খ্রীঃ চার্টারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লোপ করে ইংলণ্ডের শিল্প পুঁজির কাছে ভারতবর্ষের বাজার খুলে দেওয়া হয়। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতা চরমে ওঠে—সর্বাধিক দুর্দশা হয় তাঁতিদের। সমসাময়িক যুগের কবি মনোমোহন বসু আক্ষেপ করে লিখেছেন :

দেশে তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।
....
আমাদের দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে,
খেতে শুতে বসতে প্রদীপ জ্বালাতে—
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে মনোমোহন ঘোষ বলেন যে যে বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হয়েছে তার ফলের নাম স্বাধীনতা এবং অন্যদেশের লোকেরা তার অমৃতস্বাদ ভোগ করে।

স্বাধীনতা লাভের চিন্তা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কল্পনার অতীত হওয়ায় হিন্দু-মেলার কর্ম-কর্তাগণ স্বদেশবাসীদের স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টার উপর জোর দিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে এই স্বাবলম্বন নীতির কথাই আলোচিত হয়েছে—তাঁর শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম এই স্বাবলম্বন নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্ষেত্র। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে এই স্বাবলম্বন নীতির নামান্তর উল্লেখ করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'হিন্দুমেলাকে (চৈত্র মেলা) আমরা জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্পন্দন বলতে পারি।'

হিন্দুমেলায় ব্যায়াম-চর্চা, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা, স্বদেশের পণ্যজাত সামগ্রীর পুনরুদ্ধার প্রভৃতি স্বদেশ পূজার উপকরণ হয়ে উঠল। এই মেলায় নানা প্রকার ফল-মূল, পুষ্প, চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শিত হত। একবার মেলায় একখানি তাঁত আসে—ইংরেজের বাণিজ্য নীতিতে বিপর্যস্ত তাঁতিদের দুর্দশার পটভূমিতে হিন্দুমেলায় তাঁত আনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রায় সমস্ত বিষয়েই পুরস্কার প্রদত্ত হত। সংক্ষেপে বলা যায় Structure-এর ক্ষেত্রে স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে বণিক ইংরেজের স্বার্থকে আঘাত করার প্রবণতা (দুর্বলতম প্রবণতা হলেও) হিন্দুমেলায় দেখা গিয়েছিল। Super-structure এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাব্য-সাহিত্য ও The National Paper-কে কেন্দ্র করে স্বদেশমুখীন মানসিকতা গঠন মেলার কর্মকর্তাগণের লক্ষ্য ছিল। এই মানসিকতা গঠনের ইতিবাচক দিক আছে এবং স্ব-বিরোধজাত রক্ষণশীলতাও অস্পষ্ট থাকে নি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ শুরু হলে সর্বক্ষেত্রে সেই পুঁজিতন্ত্রকে ইংরাজ পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় নি। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বোম্বাই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত কাপড়ের কলগুলিতে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হতে থাকে। ১৮৭২-৭৩ খ্রীঃ ভারতীয়দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ১৮টি কাপড়ের কল বোম্বাই অঞ্চলে এবং ২টি কাপড়ের কল বাংলাদেশে ছিল। কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত সমস্ত চটকলের মালিক ছিল ইংরাজ পুঁজিপতিরা। শতকরা ৮২টি কয়লাখনির মালিক ছিল ইংরাজ। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ইংরাজ পুঁজিপতিরা ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিদে এক ধরনের সীমায়িত শিল্পায়নে বাধ্য হয়েছিল। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশকে কেন্দ্র করে তিনটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল—(১) ভারতীয় পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াশ্রেণী (মূলতঃ বোম্বাই অঞ্চল) (২) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী (৩) শ্রমিকশ্রেণী।

১৮৫৭ খ্রীঃ পূর্বে সরকারী চাকরী বা দালালি ছাড়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সামনে কোন জীবিকা অর্জনের পথ ছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ পরে কিছু কিছু স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন জীবিকার (ওকালতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা ব্যবসা, ছোট-খাট বাণিজ্য ইত্যাদি) সুযোগ হল। উদীয়মান বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী পরাধীন সমাজের বাতাবরণে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পেয়ে বিদেশী শাসনের

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা পেটি-বুর্জোয়াদের সংখ্যা এত বেড়ে উঠল যে তাদের জীবিকার সুযোগ খুব কমে গেল। বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি বুর্জোয়া ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়ে উঠলেও বিনিয়োগের সুযোগ পেল না।—সরকারী কাগজে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করতে বাধ্য হল। একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত পেশাগত আয় থেকে সঞ্চিত অর্থ শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের এই শ্রেণীর জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মিলে হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার প্রবর্তন করেছিলেন।

ভাবধারার দিক দিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকেই রামমোহন ইয়ং বেঙ্গলের উত্তরসাধক হয়েও স্বতন্ত্র মানসিকতার অনুশীলন করলেন। ইউরোপীয় দেশসমূহের সমরলিপ্সা, ভারতীয় মহাবিদ্রোহে ইংরেজ-প্রভুদের অত্যাচার, নীলকরদের অত্যাচার, প্রাত্যহিক জীবনে বর্ণবৈষম্যজনিত অপমান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসনের সভ্যতা বিকিরণকারী ভূমিকা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা (তথা ইউরোপীয় ধনতন্ত্র) সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গের শুরু হয়। **The National Paper**এর পাতায় এই মোহভঙ্গের কথা আছে। এই মোহভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জমিদারশ্রেণীর সমাজের মুক্ত-মতি বা মুক্তজীবন দর্শন সম্পর্কে ভীতি। কেননা সনাতনকে ধর্মের নামে, জাতির নামে জীইয়ে রাখতে পারলে সমাজকে শাসন করা যায়, সমাজের উপর প্রভুত্ব করা যায়। এইজন্য **The National Paper**এ বুর্জোয়া জাতীয়তা-বোধের সংকীর্ণ ধারাটি (সামন্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শ যুক্ত ধারা) তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

একথা সত্য যে ইয়ং বেঙ্গলের অনেকেই উৎকেন্দ্রিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু একথাও সত্য যে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ই বুর্জোয়া জাতীয়তা-বোধের যুক্তিবাদী ধারাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—তাঁরাই এদেশের স্থাবর মানসিকতায় জঙ্গম শক্তি সৃষ্টি করেছেন, কৃষকদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, ইংরেজ শাসনের বাণিজ্যিক স্বার্থকে ধিক্কার জানিয়েছেন, তাঁদের আচার্যগুরু ডিরোজিও প্রথম স্বদেশপ্রেম মূলক কবিতা লিখেছেন—এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। **The National Paper** ইয়ং বেঙ্গলের সেই শিকল ভাঙার দিকটা বিস্মৃত হয়ে কোন কোন ইয়ং বেঙ্গলের আচার-আচরণকে কেন্দ্র

করে উক্ত সম্প্রদায়কে নিন্দা করেছেন এবং নিছক হিন্দুকে নিয়ে একটি মিলন-ভূমি গড়ে তোলার কথা বলেছেন। Secular বা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টির অভাবে এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটি হিন্দু বুদ্ধিজীবী উদ্যোগে গড়ে ওঠায় The National Paper হিন্দুর নিজস্বতাকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ রূপে অভিহিত করেছে (অথচ এই পত্রিকাতেই মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যের সমালোচনা আছে)—এটা পত্রিকাটির স্ব-বিরোধী চরিত্রের প্রকাশক।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ-পূর্ব যুগের ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংকীর্ণতাবাদী অনুশাসনগুলি সম্পর্কে স্বাদেশিকতার নামে মোহ সৃষ্টি করল। হিন্দু বিধবার বৈধব্যের মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার চিত্র অঙ্কিত হল—স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক মনোভাবের প্রকাশ ঘটল—হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যের আদর্শ নতুন করে তুলে ধরা হল—প্রতীচ্যের সভ্যতাকে বিষয়ানুবর্তিতা ও প্রাচ্যের সভ্যতাকে অধ্যাত্মবাদ রূপে চিত্রিত করা হল। ধর্মকে নিয়ে স্বাদেশিকতা প্রচার আপাতদৃষ্টিতে কার্যকরী হলেও আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

একদিকে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে বিনিয়োগ ও জীবিকা অর্জনের প্রবল তাগিদ, অন্যদিকে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সমাজ-মনে মুক্ত জীবন দর্শনের প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে হিন্দুমেলার জমিদার শ্রেণীর উদ্যোক্তরা জর্জরিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লব কাম্য, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রিটিশ পূর্ব-যুগের সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনগুলিও রক্ষিত হওয়া আবশ্যিক—এই সামন্ততান্ত্রিক মর্মবস্তু নিয়ে The National Paper সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলি বিচার করছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের যুক্তিবাদী ধারার প্রবক্তরা—যেমন ইয়ং বেঙ্গলের দক্ষিনারঞ্জন কিংবা ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা পৌত্তলিকতা-বিরোধী মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর নারীকে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু The National Paper-এ নারীকে মানুষ হিসাবে নয়, মেয়েমানুষ হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক মর্মবস্তুসহ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ চিন্তাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় উক্ত পত্রিকা অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছে। ডিরোজিওর শিষ্য

ইয়ং বেঙ্গলের নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'জগদীশ্বর স্ত্রী-পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখনও মনে করেন নাই যে একজন অন্যজনের দাস হইবে। ...মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃঙ্খল হইয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে।'[২৩] অক্ষয়কুমার দত্ত বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, প্রেমঘটিত বিবাহ, নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রভৃতি বেদোক্ত ও মনুসংহিতা প্রোক্ত ধর্মব্যবহার' বলে উল্লেখ করেছিলেন। **The National Paper**-এ **Zenanah Reform, Women Worth and the Zenana, Mission of English Women, Women is made for Home** প্রভৃতি প্রবন্ধে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী ধারার বিপরীত সংকীর্ণ বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে।

A Discourse on Spiritualism প্রবন্ধে প্রতীচ্য সভ্যতার বিষয়ানুবর্তিতার প্রতি কটাক্ষ এবং প্রাচ্যের সভ্যতার অধ্যাত্মবাদকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করার অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভারতীয় উপমহাদেশে Secularism বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির পথে—এখানে প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্বার্থে একদিকে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের প্রবল প্রচেষ্টার পাশাপাশি মৌলবাদীদের অধ্যাত্মবাদকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করে মুক্তমতিকে শৃঙ্খলিত করার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস সুস্পষ্ট।

The Grievances of Ireland শীর্ষক সংবাদে স্বদেশের দুর্দশার চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

Kobirajes নামক প্রবন্ধে লুণ্ঠনাশ্রয়ী অর্থনীতির অঙ্গ হিসাবে বিলিতি ঔষধ বিক্রয়ের জন্য দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

The Bengal Zemindars, The Educational Cess প্রভৃতি প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাত বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছে এবং রক্ষণশীল বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে অনুরূপ যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছে—এই ধারার স্বরূপ (**content**) আজও নিঃশেষ হয়নি এবং অন্য রূপে (form) টিঁকে আছে।

Primary Education in Bengal প্রবন্ধে একদিকে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলে জমিদার

শ্রেণীর সামাজিক প্রভুত্ব হ্রাসের আশঙ্কা ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে কাঙাল হরিনাথ তাঁর সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা' প্রকাশিকা'য় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারীতে স্থাপিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ করে দেবার জন্য মহর্ষির সিদ্ধান্তে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত 'ন্যাশানাল পেপার'এ সমজাতীয় বক্তব্য উল্লেখ করার মত।

The Indian Econmist again শীর্ষক প্রবন্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্ত যে সম্ভাবনাময় শক্তিশালী একটি বণিকগোষ্ঠীকে সুকৌশলে ব্রিটিশ প্রশাসনের সহকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক নেতৃত্ব দেবার যথার্থ যোগ্যতাকে বিনষ্ট করেছে একথা শ্রেণীগত স্বার্থে অনুল্লেখিত থেকেছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে যাঁরা জমিদার হয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কালধর্মানুসারে তাঁরাই সমকালের সামাজিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্য শ্রেণী ছিলেন)।

Our Ideal of Nationality প্রবন্ধে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব এক করে দেখার প্রবণতার মূল উৎস সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসে—সেই ইতিহাসে মুসলমান শাসনের যুগ থেকে ভারতবর্ষকে পরাধীন বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এই চিন্তা অনৈতিহাসিক, কেননা মুসলমান শাসকরা এদেশকে নিজের দেশ হিসাবে মেনে নিয়েছেন এবং এদেশের সম্পদ বিদেশে অর্থাৎ নিজেদের পূর্ববর্তী দেশে প্রেরণ করেন নি। একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। শিক্ষিত হিন্দুর মনে বুর্জোয়া স্বাদেশিকতার ভাবকে দ্রুত সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উক্ত চিন্তা আপাতদৃষ্টিতে সফল হলেও ভবিষ্যতে ভালো হয় নি একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় পুঁজির বিকাশের কথা মনে রেখে **What Impedes our National growth** প্রবন্ধটির মর্মবস্তু অনেকখানি মেনে নিতে হয়। জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সপক্ষে লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই চিন্তার বাস্তব অবয়ব আমরা **National Council of Education** (১৯০৬) স্থাপনের মধ্যে দেখেছি।

The National Paper হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মক্ষেত্রকে সীমিত রাখার চিন্তাদর্শকে প্রচার করে ছিলেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের উপর যে উক্ত পত্রিকার কোন বিরাগ ছিল না তার প্রমাণ 'The Education of the Mohomedans' প্রবন্ধটি খুবই ইতিবাচক।

উপনিবেশের অধিবাসীদের শিল্প-বাণিজ্যের অধিকার অর্জনের দাবী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। এইজন্য এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর থেকে অযৌক্তিক বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার যে দাবী The National Paper করেছে তার ইতিবাচক দিককে অস্বীকার করা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সতীদাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রগতিপন্থী রামমোহন গোষ্ঠী ও সনাতনপন্থী রাজা রাধাকান্ত গোষ্ঠীর যে বিরোধ হয়েছিল সেই বিরোধ সমগ্র শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল। আজও তার স্পন্দন অনুভূত হয়। জনৈক আমেরিকান ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা রহিত করার প্রচেষ্টায় রাজা রাধাকান্তের বিরোধিতার মধ্যে তাঁর দেশপ্রেমিক সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। অন্ধ কুসংস্কারকে শ্রেণীগত স্বার্থে রক্ষা করার প্রচেষ্টা যদি দেশপ্রেমের নামান্তর হয় তবে দেশপ্রেমের নতুন সংজ্ঞা নিয়ে অনৈতিহাসিক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। সাধারণভাবে হিন্দুর এবং বিশেষ করে আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র The National Paper সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রাধাকান্তের ঐতিহ্য বহন করেছে এবং বিদেশী শাসকের সাহায্যে সমাজ-সংস্কার (সর্বস্বারি বিবাহ বা বহুগামিতা নিবারণ) প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেছে। পরবর্তীকালে যোগেশচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গবাসী পত্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অতি উজ্জ্বল ভূমিকা থাকলেও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সনাতনপন্থী অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে—সেইদিক দিয়ে বঙ্গবাসীর সঙ্গে The National Paper-এর কিছু সাদৃশ্য আছে। আসলে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন গঙ্গা-যমুনার যুগ্ম বেণী রূপে প্রবহমান না হলে দেশের যথার্থ মঙ্গল হয় না—The National Paper-এর এই চেতনার অভাবই পত্রিকাটির স্বাদেশিকতার বোধকে খণ্ডিত করেছে।

যুক্তিবাদী ইতিহাস চেতনার আলোকে The National Paper-এর সীমাবদ্ধতা ধরা পড়লেও উক্ত পত্রিকায় প্রচারিত স্বাদেশিকতার আদর্শটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাতীয়তাবাদী ধারাকে কোন না কোনভাবে পুষ্ট

করেছে, অন্তত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির শোষণের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য বিকাশের সপক্ষে শিক্ষিত হিন্দুর চেতনাকে পুষ্ট করেছে। এই জন্য অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ-ইতিহাসে পত্রিকাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

সূত্রনির্দেশ

১। প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া।
২। The National Paper—Ourselves—Aug 2, 1871
৩। The National Paper—March 20, 1867
৪। ,, ,, ,, —March 20, 1867
৫। ,, ,, ,, —March 13, 1867
৬। ,, ,, ,, —Aug. 21, 1867
৭। ,, ,, ,, —Feb. 12, 1868
৮। ,, ,, ,, —May 27, 1868
৯। ,, ,, ,, —Feb 12, 1868
১০। ,, ,, ,, —July 1, 1868
১১। ,, ,, ,, —Jan 1, 1868
১২। ,, ,, ,, —June 24, 1868
১৩। ,, ,, ,, —Jan 6, 1869
১৪। ,, ,, ,, —Jan 27, 1869
১৫। ,, ,, ,, The Indian Economist again —Aug 24, 1870
১৬। ,, ,, ,, —May 26, 1869
১৭। ,, ,, ,, —Aug 25, 1869
১৮। ,, ,, ,, —Jan 5, 1870
১৯। ,, ,, ,, —June 17, 1868
২০। ,, ,, ,, —May 3, 1871
২১। The National Paper—April 17, 1867
২২। ,, ,, ,, —March 18, 1868
২৩। নরহরি কবিরাজ রচিত স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাগ্রন্থে জ্ঞানান্বেষণের উদ্ধৃতি।
২৪। কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত পাক্ষিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা—আগষ্ট ১৮৭২।

প্রসঙ্গ ঃ জাতি ও উপজাতি বিকাশের গোটাকয়েক কথা

মানিক সরকার

''বর্তমান পৃথিবীতে জাতি (নেশান), জাতিসত্তা (ন্যাশনালিটি) এবং উপ-জাতির (ট্রাইব) মোট সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।...এঁদের মধ্যে প্রায় ১৬০০ বাস করেন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে, প্রায় ১০০টি জাতি ও জাতিসত্তার বাসস্থান হল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে এবং প্রায় ২৫০টি জাতি ও জাতিসত্তা বাস করেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। এঁদের মধ্যে ১০০টিরও বেশী জাতি ও জাতিসত্তার বাসস্থান হল সোভিয়েত ইউনিয়নে ('শ্রেণী ও জাতি'—জি. ওয়াই. গ্লেজারম্যান, সমীক্ষা, পৃঃ ৮)।''

ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক একদা পদানত, এখন স্বাধীন এবং নয়া-উপনিবেশবাদ কর্তৃক এখনো শোষিত আফ্রো-শিয়ায় জাতি, জাতিসত্তা এবং উপজাতি নরনারীর সংখ্যাধিক্য রয়েছে, প্রায় দু হাজারের মধ্যে ষোল শতই আফ্রো-শিয়ার সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে রয়েছেন। এই পৃথিবীতে পূর্বোক্ত সংখ্যাগত তথ্য প্রমাণ করে ট্রাইব বা অধিজাতি, ন্যাশানালিটি বা জাতিসত্তা এবং নেশান বা জাতি বিকাশের স্তর অসম। এবং সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক একদা পদানত দেশগুলিতে অসম বিকাশের চিত্রটি অত্যন্ত প্রকট, তার জন্য উপজাতি নরনারীর সংখ্যা সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে অধিক।

এশিয়ার মধ্যেই ভারত, একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত ছিল। স্বাধীন হবার পর এই ভারতে উপজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫৬৩। উল্লেখ্য এখানে উপজাতির সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট নয়, তার জন্য তফসিলী ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এই সংখ্যার হেরফের হতে দেখা গেছে। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন।

ভারতেরই একটি অঙ্গ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে ১৯৭৬ সনে তালিকা-ভুক্ত উপজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৮ প্রকার।

ভারতে উপজাতি নরনারীর সংখ্যাটি এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। ১৯৮১ সনের আদমসুমারীর হিসাব অনুসারে ৫,১৬,২৮,৬৩৮ জন তফসিলী উপজাতির নরনারী ভারতে বাস করেন। মোট ভারতবাসীর ৭'৭৬ উপজাতি নরনারী। অর্থাৎ শতকরা হিসাবে ১০০ জন ভারতবাসীর মধ্যে পৌনে আট জনের একটু বেশী উপজাতি নরনারী।

পশ্চিমবঙ্গে উপজাতি নরনারীর সংখ্যা ৩০,৭০,৬৭২ জন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ-বাসী মোট জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে ৫'৬৩ জন। একশত জন পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর মধ্যে সাড়ে পাঁচজনের কিছু বেশী উপজাতি নরনারী।

ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশে সর্বাধিকসংখ্যক উপজাতি ভারতবাসী রয়েছেন—প্রায় ১১,৮৭,০৩১ জন, দ্বিতীয়স্থানে ওড়িষ্যা (৫৯,১৫,০৬৭ জন), তৃতীয়স্থানে বিহার (৫৮,১০,৮৬৭ জন), উপজাতি ভারতবাসীর জনসংখ্যার দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অষ্টম (৩০,৭০,৬৭২ জন)।

রাজ্যগত মোট জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে প্রথমস্থানে নাগাল্যাণ্ড (৮৩'৯৯), দ্বিতীয় মেঘালয় (৮০'৫৮), তৃতীয় ত্রিপুরা (২৮'৪৪), মধ্যপ্রদেশ (২২'৯৭), ওড়িষ্যা (২২'৪৩), বিহার (৮'৩১) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৫'৬৩) উপজাতি ভারতবাসী বাস করেন।

৫৬৩ প্রকার তফসিলী উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ওড়িষ্যায় ৬২, কর্ণাটকে ৪৯, মহারাষ্ট্রে ৪৭, মধ্যপ্রদেশে ৪৬, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮, বিহারে ৩০ প্রকার রয়েছেন।

১৯৮১'র আদমসুমারীর হিসাবে হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, পাঞ্জাব, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়, দিল্লী এবং পণ্ডিচেরীতে উপজাতি নরনারীর কোন উল্লেখ নেই। অসম রাজ্যে গোলযোগের জন্য হয়তো হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গে ষোলটি জেলায় কলকাতায় (৪,৪২০), ২৪ পরগণায় (১,৮৯,০৪৪), হাওড়ায় (৭,২৮০), হুগলী (১,৪১,০৪৭), নদীয়া (৫৫,৯৮৯) মুর্শিদাবাদ (৪৫,৩০২), বর্ধমানে (২,৭৮,১৯১), বাঁকুড়ায় (২,৫০,৫৯০), বীরভূম (১,৪৫,১৩৩), মেদিনীপুর (৫,৩৮,৮৭৭), পুরুলিয়া (৩,৪৮,৩৭৫), দার্জিলিং (১,৫১,০৭৩), জলপাইগুড়ি (৪,৯১,৭৯১), কোচবিহার (১০,১০৫), মালদহ (১,৫৩,৩০০) এবং পশ্চিম দিনাজপুরে (২,৬০,১৬০) জন উপজাতি নরনারী ১৯৮১ সনের হিসাব

অনুসারে বাস করেন। উপজাতি বসবাসকারীর দিক দিয়ে জেলাগতভাবে প্রথম মেদিনীপুর, দ্বিতীয় জলপাইগুড়ি, তৃতীয় পুরুলিয়া জেলা।

পশ্চিমবঙ্গের ৩৮ প্রকার উপজাতি গোষ্ঠীকে প্রধান চারটি ভাষা গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে (ক) দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী, (খ) অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী, (গ) তিব্বতী চীনা ভাষা গোষ্ঠী এবং (ঘ) ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী ('পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ'—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, পৃঃ ৫-৬)।

পেশা বা জীবিকার দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গোষ্ঠীই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, মাহালি, খাড়িয়া, হো, শবর, রাভা, কোড়া প্রমুখ কৃষিকাজে এখন দক্ষ। ভূমিজ ও সাঁওতালদের মধ্যে মধ্য-কৃষকও দেখা যায়, যদিও সংখ্যায় কম। প্রান্তিক কৃষকও আছেন। কিন্তু ভূমিহীনের সংখ্যাই বেশী। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুর এবং গ্রামীণ জনমজুরের মধ্যে উপজাতিদের সমস্ত গোষ্ঠীর নরনারী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ক্ষেতমজুর জাতি বা উপজাতি ভিত্তিক নয়।

অর্ধ-শিকারী, অর্ধ-অরণ্যচারী এবং আধা-যাযাবরী নরনারীও এখনও এরাজ্যে দেখা যায়, সংখ্যায় কম। পশুপালন এঁরা করে থাকেন। লাঙ্গল, কোদাল, কুড়ুল, দা, কাস্তের ব্যবহার করেন। ধান রোয়ার কাজে উপজাতি নারীদের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। ধান, গম কাটা, ঝাড়াই-মাড়াই করতে এঁদের দক্ষতা কম নয়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকাজে উপজাতি নরনারীরা একটি মূল্যবান স্তম্ভ। সমগ্র কৃষি-সমাজের এঁরা একটি বড় অংশ।

কৃষিকাজ ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের চা বাগিচাগুলিতে বাগিচা শ্রমিকের মধ্যে উপজাতি নরনারী বিশেষ করে ওঁড়াও, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রমুখ নরনারীরা রয়েছেন। বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে উপজাতি পুরুষরা আছেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতিতেও আছেন, সংখ্যায় অবশ্য অত্যন্ত কম। উচ্চহারের বেতনের পেশায় এঁদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। দু' চারজন খুঁজলে এখন পাওয়া যেতে পারে।

একটি তত্ত্ব বহুকাল আগে থেকে প্রচারিত আছে যে, দক্ষ এবং অদক্ষ, উন্নত এবং অনুন্নত জন্মসূত্রে বা বংশগতভাবে প্রাপ্ত। উপরে বর্ণিত তথ্য এই তত্ত্ব [illegible] প্রমাণিত হয় না, সমান সুযোগ পাওয়া গেলে কমবেশী সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ এবং উন্নত হতে পারেন। উপজাতি সমাজেও এর প্রমাণ

রয়েছে. পশ্চিমবঙ্গের রাভা, মেচ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, এবং ওঁড়াও প্রমুখ গোষ্ঠীর নরনারীরা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য গোষ্ঠীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছেন। মানুষের রক্তে. পাকস্থলীতে, হৃদ্‌যন্ত্রে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্মে কোন মৌলিক ভিন্নতা. নেই। সমস্ত মানুষই একই 'অমৃতের সন্তান।"

একটি ঐতিহাসিক তথ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের যাত্রাপথে সকলকেই ট্রাইব-স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। বর্তমানে জাতি বা নেশান পর্যায়ে যাঁরা উন্নীত হয়েছেন, তাঁদেরও এক সময়ে ট্রাইব-স্তরে থাকতে হয়েছিল। সোভিয়েত সমাজ বিজ্ঞানীরা ইতিহাসের পটভূমিতে ট্রাইব স্তর, জাতিসত্তা স্তর, জাতি স্তর ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে একটি-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। ওই মতানুসারে "...tribes, charcteristic of the primitive communal age ; nationality, characteristic of the slavery and feudal eras ; and nations, characteristic of the epoch of capitalism and socialism." (Present-day Ethnic Processes in USSR'—Progress Publishers, Moscow—Page 11)। তাই 'ট্রাইব' বলে কোন গোষ্ঠীকে অবজ্ঞা, অবমাননা করা এবং এ থেকে তাঁদের প্রতি করুণা, দয়া প্রভৃতি বর্ষণের কোন নীতিসম্মত ঐতিহাসিক বাস্তব ভিত্তি নেই। এই সূত্র ধরে ভারতের জাতিসত্তা এবং জাতিগঠনের প্রক্রিয়া বা প্রসেস নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ থেকে যায়, তা করাও প্রয়োজন। প্রয়াত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত প্রাথমিকভাবে আলোচনার সূচনা করেছিলেন পূর্বভারতের পটভূমিতে, কিন্তু সূচনাতেই তার দাড়ি পড়ে যায়। পঞ্চাশের দশকের সেই আলোচনার যদি পরবর্তীকালে ধারাবিহিকতা রাখা যেত এবং গুরুত্বসহকারে করা যেত, তবে আজ এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে হয়তো দাঁড়ান যেত, এমনভাবে দিশেহারা হয়ে পড়তে হত না। জাতি, উপজাতি, ভাষা, উপভাষার যে জটিল সমস্যা এখন উপস্থিত হচ্ছে তার সমাধানও অনেক সহজ হতে পারত। অবশ্য কোন সমস্যাই স্থানু বা গতিহীন নয়, সমস্যার মধ্যে অগ্রগতির অঙ্কুর থাকে, যদি তার সমাধান ঐতিহাসিক সম্মত ও বাস্তবানুগ হয়, তবে সেই অঙ্কুর বিকশিত হয়। সমস্যাকে কখনো ধামাচাপা দেবার, কখনো পুষে রাখার প্রবণতা আমাদের মধ্যে রয়েছে। এতেই অনেক অহিত হয়ে চলেছে।

ভারতে উপজাতি, জাতিসত্তা এবং জাতি বিকাশের বর্তমান স্তর এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা এবং আলোচনান্তে ঐকমত্য সিদ্ধান্তে আসা একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। একাজেও মার্কসবাদীদের অগ্রণীর ভূমিকা পালন করা দরকার। মার্কসবাদী মহলে এ নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, উপজাতি সমস্যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত মনে হয় কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত অজয় ঘোষ চল্লিশের দশকে সূচনা করেছিলেন। ছোট-নাগপুর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তিনি আলোচনা করেছিলেন। উপজাতি নর-নারীদের সমস্যাকে কৃষি সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হিসাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার কর্মীবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূচনা চল্লিশের দশকে করেছিলেন। সেই আন্দোলনের অনেক কেন্দ্রে এখন তাঁরা দুর্বল শোনা যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র কোন আঞ্চলিক পটভূমিতে নয়, সমগ্র ভারতের পটভূমিতে, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা করা দরকার। শুধুমাত্র রাজনীতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, মার্কসীয় নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ভারত একটি বিশাল দেশ। প্রাচীন ঐতিহ্য তার বিরাট। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ভারত বহন করেছে। শুধু বৈদিক সভ্যতা নয়, তারও আগে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ভারত বহন করে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই এদেশের নরনারীর বিকাশের সূত্র সুদূর অতীতের মধ্যে রয়েছে। সূত্র উদ্ধারের সন্ধান চলছে। বহু নতুন নতুন তথ্য উদ্ধার হচ্ছে, তথ্য নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন করছে। ব্রিটিশ প্রদত্ত ঊনবিংশ শতকের ধ্যানধারণাকে পালটে দিচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য এ বিশ্বে তথ্যবিপ্লব ঘটে চলেছে। তা শুধু বৈষয়িক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে না, আত্মীক জীবনকেও প্রভাবিত ও চালিত করছে। ভারত এর বাইরে নয়। এখনকার বিশ্ব যেমন বিশাল, তেমনই ছোট। এই বিশ্বভূমিতে দাঁড়িয়েই ভারতের জাতি এবং উপজাতি সমস্যার সমাধানের পথ বের করা দরকার। সেই সমাধানের পথে মানবসমাজের বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্যের সার্বিক ঐক্য অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—মানব সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের এই মূল সূত্রকে অবলম্বন করেই সমাধানের প্রকৃত পথ খোঁজা যায়, পাওয়া যাবে।

বর্তমান ভারত বর্ণ এবং জাতি বৈষম্যবাদীদের তথ্য তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত;

বহু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। তার জন্য আমাদের ধ্যান-ধারনায় বিভেদ, পৃথকত্বের সুর বেজে চলেছে। আমরা যারা তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ে উন্নত, তাঁদের অধিকাংশই অনুন্নত নরনারীকে অবজ্ঞা, অবহেলা, কখনও কখনও ঘৃণা করে থাকি। বিভিন্ন জাতির নরনারীর কাছে বিভিন্ন উপজাতির নরনারীরা দয়া, করুণার পাত্র পাত্রীরূপেই বিবেচিত হয়ে আসছেন। সংকীর্ণ উচ্চমন্যতা এবং সংকীর্ণ হীনমন্যতার দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত আমাদের সমাজ জীবনে চলেছে। আর্থিক এবং বৈষয়িক বৈষম্য এর একটি মূল উপাদান, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। মানসিক উপাদানের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একমাত্র মানুষের পেট আছে, মনও আছে। মনের শক্তি কম নয়।

ভারতের মতো বিকাশশীল দেশে জাতি এবং উপজাতি সমূহের অবস্থান বিপরীত মেরুতে নয়, একই মেরুতে উভয়ের অবস্থান। সেই মেরুর নাম মনুষ্যে-মানুষে সর্বপ্রকার শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার অবসান; সকলের সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা। এখানেই রয়েছে শ্রেণী বিভাজনগত শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু তাই বলে বিকাশের তারতম্যে জাতি এবং উপজাতি সমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বও উপেক্ষার নয়। যদিও এ দ্বন্দ্ব বৈরিমূলক নয়।এ দ্বন্দ্ব মিত্রসুলভ, তাই সমন্বয়মূলক। এর সমাধান আলোচনা, অভিজ্ঞতা এবং শান্তিপূর্ণ, সংঘর্ষহীন, অহিংসা পথে সমাধান করা যায়, করা দরকার।

কিন্তু সমাধানের সূত্র উদ্ধার করার আগে প্রয়োজন সমস্যার মূল কারণগুলির সন্ধান করা। মূল সূত্রের মধ্যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যাকে গণ্য না করে রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক, আত্মিক বিকাশের সমস্যা-গুলিকেও গণ্য করা দরকার। আর্থিক দীনতার সুরাহা বা সমাধান হলেই অন্যান্য সমস্যার সমাধান আপনা-আপনি হয়ে যায়—এ বিশ্বাস এখন আর করা উচিত নয়। জাতি ও উপজাতির সমস্ত উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সর্বদা সমান গুরুত্ব ও সচেতন প্রয়াস থাকা এখন অপরিহার্য।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ১৯৪৮-১৯৬৪

রণেন সেন

(মূল্যায়নের নববর্ষ সংখ্যা (১৩৯৫) দ্বিতীয় বিবরণ দেওয়া হয়েছে)

পার্টি কংগ্রেসের প্রথম দলিলটি বি. টি. রণদীভে কংগ্রেসে পেশ করেন। সেই দলিলের নাম ছিল "রাজনৈতিক থিসিস"। সেই থিসিসের সংক্ষিপ্তসার ঐ সংখ্যার "মূল্যায়নে" দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিলটির নাম ছিল "পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি"। এটিও পেশ করেন কমরেড রণদীভে। দলিলটির উদ্ধৃতি দিয়েই শুরু করছি। উদ্ধৃতির লেখাগুলি বাদে বাকী লেখাগুলি দলিলের সংক্ষিপ্তসার।

"যে ভ্রান্তি আমাদের পূর্ববর্তী যুগে পার্টির মধ্যে ছিল, যা আমাদের "মাউন্টব্যাটেন রোয়দাদ" সমর্থনের মত নিকৃষ্টতম সংস্কারবাদী বিচ্যুতিতে টেনে নিয়েছিল তার বিশ্লেষণ এই দলিলে করাই উদ্দেশ্য।"

সুতরাং একেবারে মূলে যাওয়া প্রয়োজন—"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী চিন্তা বা চেতনা পার্টিতে প্রবল ছিল···যুদ্ধকালীন সময়ের বিভ্রান্তি থেকেই যুদ্ধোত্তর যুগের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।"

পার্টি নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জনযুদ্ধে রূপান্তর হওয়া বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। বুর্জোয়ার লেজুড়বৃত্তি করেছে, শ্রমিকবিরোধী, মার্কসবাদবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধী পথ অনুসরণ করেছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের আওয়াজ ছিল—প্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য সোভিয়েত দেশের সমর্থনে দাঁড়াও। পার্টি এই আহ্বান ভুলে গেল। তার স্বাধীন কার্যক্রম ও ক্রিয়াকলাপ বিসর্জন দিল, বুর্জোয়াশ্রেণীর চাটুকারে পরিণত হল।

"দেউলী জেল দলিল", দেউলী জেল থেকে প্রেরিত হল। ঐ দলিলে কিছু ভুল ত্রুটি থাকলেও যথা কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্রাজ্যবাদের যুক্ত জোট (নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে) গঠন করা প্রয়োজন প্রভৃতি রায়বাদী (এম. এন. রায়) ভ্রান্ত বক্তব্য থাকলেও মোটের উপর মূল বক্তব্য সঠিক ছিল। দলিলটির প্রধান সার্থকতা

ছিল যে যুদ্ধের রূপান্তর সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে নিজের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র রক্ষার কথা বলেছিল। দলিলটিতে জাতীয় বুর্জোয়া সরকার সম্বন্ধে মনোভাব সুস্পষ্ট ছিল—এই সরকার হবে জাতীয়বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদের আপোষের ভিত্তিতে এবং যদিও নাৎসিবিরোধী যুদ্ধ পরিচালনা কিছুটা দক্ষতার সাথে করতে পারবে তথাপি শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। দলিলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর এক নতুন বিপ্লবী তরঙ্গ দেখা দেবে। নাৎসিবাদের দ্রুত পতনে ইউরোপীয় সর্বহারাশ্রেণী সোভিয়েতের সক্রিয় সাহায্য পেতে পারবে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হবে যার ফলে উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সক্ষম হবে। দলিলে দ্রুত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আংশিক সংগ্রামের কথা বলা হয়েছিল যার ফলে জাতীয় সরকার গঠিত হবে, সাম্রাজ্যবাদ নিজে থেকেই ভেঙ্গে পড়বে।

[মন্তব্য : ১৯৪১ এর ২২শে জুন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করল। দেউলী জেলে বন্দী রণদীভে "যুদ্ধের রূপান্তর ঘটেছে—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে" নামক দলিল ডাঙ্গের সমর্থনে জেল থেকে পাঠায় সেটাই "দেউলী জেল দলিল" নামে খ্যাত হয়। এই দলিলটি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (তখন গুপ্তভাবে আন্দোলন চালাচ্ছিল) প্রথমে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, পরে মেনে নিয়ে লাইন বদলায়। এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে—লেখক।]

যুদ্ধের যে রূপান্তর (সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে জনযুদ্ধে) ঘটেছিল তা বাইরের নেতৃত্ব বুঝতে অক্ষম হয়। প্রমাণ—"ফরওয়ার্ড টু ফ্রিডম" (স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হও) পুস্তকে বুর্জোয়ার লেজুড়বৃত্তি এমনকি সাম্রাজ্যবাদেরও লেজুড়-বৃত্তি করা হয়েছে। এই পুস্তকটি পি. সি. যোশীর নামে কেন্দ্রীয় কমিটি ছাপায় যাতে যুদ্ধের রূপান্তরের ব্যাখ্যা করা হয়। লেখাতে বিবৃত হয়েছে যে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর নিজে থেকেই ভারত স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। দেশপ্রেমীদের বলে টানবার জন্য "সাম্রাজ্যবাদ জনগণের শিবিরে বন্দী" এই রকম ধ্বনি ও (শ্লোগান) দেওয়া হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা ছোট করে দেখান হয়েছে "ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিহার করার পথ সুগম

করা হয়।" "যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার স্বরূপ উন্মোচন করতে লেখাটি ব্যর্থ হয়েছে।" জাতীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদের সব বাধাবন্ধন ভাঙতে সক্ষম হবে। জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করতে পারবে, জাতীয় সামরিক বাহিনী গঠন করে তুলবে ইত্যাদি জাতীয় সরকার সম্বন্ধে ভ্রান্তি ও মোহ সৃষ্টি করে।

পূর্বোক্ত পুস্তকে জাতীয় সরকার পত্তনকে স্বাধীনতা হিসাবে দেখান হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা, জাতীয় বুর্জোয়ার সাথে তার আপোষ ইত্যাদি ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করতে বাইরের নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে।

এই মনোভাব আরও পরিস্ফুট হয়, চিয়াং কাইশেকের ভারত ভ্রমণের বিপ্লবী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা ও তাকে 'মুক্তিদূত' হিসাবে দেখান প্রভৃতি লেখা ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

কেউ এই বইটির সমালোচনা করেনি, এমন কি জেল দলিলের লেখকও না। ১৯৪২-এ অনুষ্ঠিত প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় প্রত্যেকেই এই "ফরওয়ার্ড টু ফ্রীডম" পুস্তকের প্রশংসায় গদগদ।

"ভারত ছাড়" আন্দোলনের উপর সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন ও বুর্জোয়া-শ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও আমরা অটল থাকলাম। আমরা ক্রমেই শ্রেণীবহির্ভূত (নন-ক্লাস) পথে চলতে শুরু করি, সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত করার রাস্তা পরিত্যাগ করে, প্রত্যেক জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকলাম। "ফরওয়ার্ড টু ফ্রীডম" পুস্তকে ঘটেছে করার কথা ছিল না, প্রতি ছত্রে সংগ্রাম বিমুখতা বিদ্যমান ছিল। কৃষি ও ভূমি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম পুস্তকে অনুপস্থিত, খাদ্য সংকটের কারণ বিবৃত হল না। উপনিবেশবাদ ও জমিদারতন্ত্র কৃষি ও খাদ্য সংকটের যে মূল কারণ তা অনুচ্চারিত রয়ে গেল।

'পঞ্চমবাহিনীর' কল্পিত ক্রিয়াকলাপ অতিরঞ্জিত করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতন্ত্র ছাড় (এ্যালিবাই) পেয়ে গেল। যে কোন মৌলিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখের বিরোধিতা শুরু হল।" সাম্রাজ্যবাদের নিকট ইতিবাচক গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন কর, কোনও নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক বাক্য উচ্চারণ করবে না।"

১৯৪৩-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে—খাদ্য সংকটের জন্য 'পঞ্চম-বাহিনী'কে দায়ী করা হল সাম্রাজ্যবাদকে নয়। কোন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

ধ্বনি প্রস্তাবে ছিল না। উদারনৈতিক দৃষ্টিতে জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাওয়া হয়। রণদীভের মতে শ্রমিক স্ট্রাইককে শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা ও শ্রেণীর পরাজয় আখ্যা দেওয়া, উৎপাদন বৃদ্ধির উপর সমস্ত জোর দেওয়া বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার সমালোচনা এড়ান প্রভৃতি চরম সংস্কারবাদী ধ্যানধারণা মার্কসবাদের নামে চালান হয়। কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয় (দলিলে উপস্থিত করা হয়) যদি আমরা ভূস্বামীদের কাছে ঠিক মত প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারি তাহলে 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলনে তারাও যোগ দেবে—ভূস্বামীদের মধ্যে এক নব চিন্তার উন্মেষ হচ্ছে, ভূস্বামীরা স্বেচ্ছায় কৃষকদের জমি দান করছে, কিষাণসভার সঙ্গে সহযোগিতা করছে ইত্যাদি গালভরা, অবাস্তব, শ্রেণীবিরোধী আওয়াজ কংগ্রেসে তোলা হয় ও প্রস্তাব পাশ হয়।

সোসালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য বামপন্থীদল সমূহকে 'পঞ্চম-বাহিনী' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ, আর বুর্জোয়ার তোষামুদি খোলাখুলিভাবে করা হয়।

কিন্তু এইসব ত্রুটি, বিচ্যুতি, সাংঘাতিক ভুল সত্ত্বেও ঐ সময় পার্টির বৃদ্ধি হতে থাকে, তার কারণ অতীতে পার্টি জনগণের সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল, এবং পার্টিসভ্যরা কোন কোন সময় পার্টি নীতি ও নেতৃত্বের বাধা সত্ত্বেও জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কারবাদী ভুলত্রুটি সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের সময়, অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে পার্টির অবদান সামান্য ছিল না। পার্টির মূল জনযুদ্ধের নীতি ও ধ্বনি সঠিক ছিল এবং সঠিক ছিল জাতীয় ঐক্যের ও জাতীয় সরকারের যে আওয়াজ পার্টি তুলেছিল।

সংস্কারবাদী ধ্যানধারণার জন্য স্টালিনগ্রাড যুদ্ধে সোভিয়েতের জয়ের পর যে ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল তা আমরা বুঝতে পারি নি; বা সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে নতুন কোন চিন্তা করতে পারি নি। ঐ সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণার পরিণতি—জওহরলাল নেহেরুকে ফ্যাসীবাদবিরোধী আখ্যা দেওয়া, স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের পর ও জাপানী আক্রমণের অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরা, গান্ধীজীর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রশংসা বর্ষণ করা ইত্যাদি। ষোড়শ-সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টে স্টালিন গান্ধীজীকে আপোষকামী উদারনৈতিক বুর্জোয়া

নেতা হিসাবে যে চিহ্নিত করেছিলেন, কমরেড অধিকারী স্টালিনের সেই রিপোর্টের ঐ উক্তি "সংশোধন" করে পুনর্মুদ্রিত করেন।

আমাদের জাতীয় ঐক্যের আওয়াজ কোন রকমেই শ্রেণী ঐক্যের ভিত্তিতে বা জনগণের ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত হোক এ ধারণা সৃষ্টি করত না। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি-ভূমি ছিল উপরতলার নেতাদের—অর্থাৎ কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মিতালীর উপর।

এইসব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ করে পিবি সম্পূর্ণ দায়ী।

১৯৪৫-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব ঐ একই বিচ্যুতির পরিচায়ক।

প্রস্তাবে বলা হয়—"যুদ্ধে বিশ্ব গণতান্ত্রিক শক্তির জয় অবধারিত। অবিলম্বে শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহায়তায় ব্রিটিশ শ্রমিক দল ভারতের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে।" "ব্রিটিশ শ্রমিক দল ও সম্মিলিত জাতিসংঘ সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি করা হয়।" কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের মুখোস খোলা ও তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে তাদের প্রশস্তি ও লেজুড়বৃত্তি করা এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন করা আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুগের পরিবর্তন আমরা উপলব্ধি করলাম না যুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েতের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তিত অবস্থা না লক্ষ্য করে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর বৃদ্ধিকে অতিরঞ্জিত ও তারিফ করলাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিপদ দেখলাম না।

১৯৪৫'এর ডিসেম্বর মাসের সিসি প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে প্রধান প্রধান কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে—কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন, বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উত্তাল তরঙ্গ প্রভৃতি কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে ঐ পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রকাশ পেল না। প্রস্তাবে লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃত্বের আপোষকামী বিশ্বাসঘাতকতার চেহারা উন্মোচিত হল না। প্রস্তাবে গণজাগরণ ভাসাভাসাভাবে স্বীকৃত হল, বুর্জোয়ার লেজুড়বৃত্তি পরিত্যক্ত হল না অথচ আগত নির্বাচনে লীগ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এপ্রিল ১৯৪৬-এর সিসি মিটিংয়ের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাগুলিকে জনগণের নিজস্ব ও সমর্থিত সরকাররূপেই দেখান হল। মন্ত্রি-

সভাগুলি যখন শ্রমিকের উপর গুলি চালাচ্ছিল তখনও মন্ত্রিসভাগুলির বিরোধিতার পরিবর্তে তাদের তোষামুদি করা, তাদের সামনে নত হওয়ার জন্য পার্টি সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনী ইস্তাহারে লেখা হয়—কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র পার্টি যা অন্য দলের নিন্দা বা [illegible] করে না, অন্য দেশপ্রেমিক পার্টির উপর যারা হাত তোলে না—কোন ভারতীয় অন্য ভারতীয়কে আঘাত করবে না বরং ঐক্যবদ্ধভাবে শোষকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।" (এই সময় কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের প্রত্যক্ষ উসকানিতে ভারতের সর্বত্র কমিউনিস্টদের উপর কংগ্রেসীদের আক্রমণ হচ্ছিল—লেখক)

কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪৬এর আগস্ট মাসের সভার প্রস্তাবে বৈপ্লবিক ডাক দেওয়া হয়। সেই প্রথম সংস্কারবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বৈপ্লবিক পথের চিন্তা করা হয়, পূর্বতন যুগের প্রধান প্রধান সংস্কারবাদী বিচ্যুতির সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। প্রস্তাবে—১) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে ক্ষমতা দখলের আহ্বান থাকে। (২) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শ্রেণী-ভিত্তিক নীতির আপোষকামী স্বরূপের ব্যাখ্যা করা ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (৩) ভারতের যুদ্ধোত্তর যুগের গণজাগরণ ও সংগ্রামকে বৈপ্লবিক হিসাবে স্বীকার করা হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংঘর্ষ ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান দেশের পরিস্থিতিতে এক গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করেছে তা স্বীকৃত হয়। (৪) এরই পটভূমিতে এক গণতান্ত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ও পার্টি সদস্য ও সমর্থকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করা ও তাতে নেতৃত্ব দেবার আহ্বান দেওয়া হয়।

পূর্বোক্ত প্রস্তাবে ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণে ত্রুটি ও অসঙ্গতি ছিল। বিশ্ব ধনতন্ত্রের সংকট, সাম্রাজ্য-বাদের নতুন কৌশল ও নীতি গ্রহণ, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন, পারস্পরিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহ-যোগিতা ও আপোষরফার মনোভাব, দেশের আভ্যন্তরীণ নতুন অবস্থা লক্ষ্য না করা ইত্যাদি ত্রুটি বা বিচ্যুতি প্রস্তাবে অন্তর্নিহিত ছিল। পিবি (পলিটব্যুরো) সভায় পি. সি. যোশী প্রস্তাবের ইতিবাচক দিকটিকে জোর করে দেবার যথাযথ চেষ্টা করেছেন। পার্টি সেক্রেটারীর পদের অপব্যবহার করে তিনি পার্টি

চিঠি ও অন্যান্য পার্টি দলিলে সংস্কারপন্থী নীতিই—চালু রাখায় সচেষ্ট ছিলেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর কুকীর্তি ঢাকবার প্রচেষ্টায় তিনি এ পর্যন্তও বলেছেন যে "তথা-কথিত" দক্ষিণপন্থী হামলার বিরুদ্ধে সোরগোল করলে সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটবুরোর মধ্যে যুদ্ধোত্তর যুগের বিশ্লেষণে, বুর্জোয়ার চরিত্র সম্বন্ধে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের স্বরূপ ও শ্রমিক, কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে মতপার্থক্য দূর হল না। ফলে বিজাতি পার্টির সর্বস্তরে কম বেশী রয়ে গেল। কোন কোন কমরেড লীগ নেতৃত্ব সম্বন্ধে সমালোচক হলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহগ্রস্ত ছিলেন। এমনকি মুসলিম লীগ আহূত ১৬ই আগস্টের ডাক যার ফলে ব্যাপক দাঙ্গা ভারতে শুরু হল, তার জন্যও কে বা কারা দায়ী তা নিয়েও মতভেদ ছিল। ১৯৪৬-র ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এইসব মতভেদ আবার পরিস্ফুট হতে থাকে। ১৯৪৭-এর জুন মাসের সি সি সভায় "মাউন্টবেটন রোয়াদাদ" সম্পর্কে যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ সংস্কারবাদী ছিল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ তা ১৯৪৭এর ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। (১৯৪৭এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সম্পর্কে এবং সেখানে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে মাউন্টবেটন যে সিদ্ধান্ত দেয় ও যা লীগ ও কংগ্রেস নেতারা মেনে নেন অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি এই প্রবন্ধে গোড়াতে লেখা হয়েছে) "এই সভায় (১৯৪৭ এর সিসি মিটিংয়ে) কমিটির মধ্যে বাম ও দক্ষিণ মতের সদস্যরা সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে পড়েন। দক্ষিণে পি. সি. যোশী, সুন্দরাইয়া এবং অন্যান্য কয়েকজন, বামে রণদীভের সাথে বাংলার সব কজন সদস্য, সরদেশাই প্রমুখ কয়েকজন, মাঝপথে ডঃ অধিকারী, নাম্বুদ্রিপাদ ও কয়েকজন ছিলেন। (এ পর্যই পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে—লেখক) এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গান্ধীজীর ও নেহেরুর নিকট লিখিত যোশীর পত্রাবলী, বুর্জোয়ার নিকট নতিস্বীকার, এবং ক্রমশই বুর্জোয়ার কাছে আত্মসমর্পণ বলে নিন্দা করে। (এই দলিলে পূর্বেই লেখা হয়েছে যে এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভা পার্টির সংস্কারবাদী ধ্যানধারণা ভাঙবার দিকে প্রথম পদক্ষেপ, এই সভাই কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির নিন্দা করে এই দলিলটি উপস্থাপিত হয় এবং গৃহীত হয়—লেখক।) পার্টি কংগ্রেসের এই দলিলের অন্য অংশে

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে যে বিচ্যুতি হয়েছিল সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা হয়—সংক্ষেপে দেওয়া হল)

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র মার্কসবাদে ইতিবাচক অবদান। এই স্বীকৃতি আমাদের কংগ্রেস ও সোস্যালিস্ট পার্টি'র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা থেকে বাঁচিয়েছে কমরেড অধিকারীর "পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য" পুস্তিকা ও খসড়া দলিল ১৯৪২ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উপস্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সাংবিধানিক কচকচানির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তথাপি এই দলিলে সুবিধাবাদের বীজ অঙ্কুরিত থাকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' যে বুর্জোয়া ভাবধারার বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের চিন্তা যে মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি, দেশের স্বাধীনতার বিরোধী তা দেখান হয় না। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা শ্রেণীবর্জিতভাবে দেখান হয়। বুর্জোয়াশ্রেণী যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লেনিনবাদী পথে সমাধান করতে পারে না তা আমরা ভুলে যাই। তাই আমরা পাকিস্তান ধারণার বিভেদমূলক স্বরূপ ও তা যে লীগ ও সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত তা বুঝতে পারি না।

মুসলিম লীগ ও জাতীয় ঐক্য—এর উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয় ও শ্রেণীবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মুসলিম জনগণের কাছে পার্টিতে যোগ দেবার জন্য কখনও বলিষ্ঠভাবে পার্টি ডাক দেয়নি। বরং মুসলিম লীগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও মোহ সৃষ্টিই করা হয়েছে। ১৯৪৩ এর আগস্ট সিসি প্রস্তাবে লেখা হয় "মুসলিম লীগ ক্রমশই মুসলিম জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে প্রধানত মুসলমানের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হচ্ছে। আমাদের কর্তব্য এই ধারাকে সাহায্য করে তাকে আরও প্রগতিশীল পথে নিয়ে যাওয়া।" যখন লীগ নেতারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলনের বিরোধিতা করছিল, জিন্নাহ সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঘেঁসেছে তখন লীগ বুর্জোয়ার লেজুড়বৃত্তি আমরা করছিলাম। "স্বরাজ যেমন আমাদের অবিসম্বাদী দাবী মুসলমানদের পক্ষে পাকিস্তান সেই রকম।"

সাম্রাজ্যবাদের অবসান ও বুর্জোয়ার মুখোস খোলার দ্বারাই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির বৈপ্লবিক সমাধান সম্ভব। অথচ আমরা এই দাবী ও

অধিকারকে মুসলিম রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে ফেলেছি। রাজাগোপাল আচারিয়ার 'ফর্মুলা' জিন্নাহর ক্রিয়াকলাপ এবং গান্ধী-জিন্নাহর সুবিধাবাদী মিলন প্রচেষ্টা সব আমরা সমর্থন করেছি। আমরা মুসলিম লীগের লাহোর' প্রস্তাব যেখানে "মুসলিম জাতিসমূহের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকার' দাবি করা হয়েছিল, তা সমর্থন করেছি। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিনি। "ভারতীয় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম সুসংঘবদ্ধ ভারতীয় একতা চাই নি।" আমাদের যে প্রাথমিক কর্তব্য ছিল স্বাধীন একতাবদ্ধ ভারত গঠনের ডাক দেওয়া তা আমরা দিই নি···আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ১৮টি গণপরিষদের কথা বলি।"

কমরেড রজনী পাম দত্ত লীগকে মুসলমানদের জাতীয় সংগঠন বলে স্বীকার করেন নি—এবং লীগ ও কংগ্রেসকে সমপর্যায়ে ফেলেন নি।" কমিউনিস্ট পার্টির এক অংশ দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির এবং অন্য অংশ পাকিস্তান ভুক্তির পক্ষে বলে—অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানকে সমপর্যায়ে দেখে।"

উপরে দ্বিতীয় দলিলটি সংক্ষেপে উপস্থিত করা হল। পার্টিতে দলিলগুলির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের, কমিটি থেকে কমরেড যোশীর বাদ যাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অল্পবিস্তর আলোচনা চলতে থাকে। দলিল দুটিই পার্টির নিম্নস্তরে সমর্থিত হয়। কংগ্রেস সরকার সদ্যস্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত হল এবং কংগ্রেস চাইল শক্ত হাতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালাতে, কমিউনিস্ট পার্টি ও অঙ্গী শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র আন্দোলনের মোকাবিলা করে, গণতন্ত্রের ভড়ং রেখে, অন্যদিকে ধনবাদী পথে ভারতকে নিতে ধনিকবণিকদের রক্ষা করতে, তাদের শোষণ অব্যাহত রাখতে ও আরও বাড়াতে সাহায্য করতে প্রস্তুত হল। তারজন্য ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভা উপযুক্ত নয়। এই কথাগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উপস্থিত করলেন। সিদ্ধান্ত হল শক্তমানুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েই পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিরণশঙ্কর রায়কে পশ্চিমবাংলায় ডেকে এনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করলেন। অবরদস্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হল। ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা বিতাড়িত হল পঃ বঃ থেকে।

এসব ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত প: বাংলার পার্টিতে হতে থাকে। তা: রাজও কোমর বাঁধছিলেন, আমরাও পিছু হটতে রাজী ছিলাম না।

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের দলিল দুটি নিয়ে পার্টিতে আলোচনা শুরু হল। পার্টিকে নতুনভাবে গড়বার, ঢেলে সাজাবার চেষ্টা প: বঙ্গে আমরা করতে থাকি। এমন সময় পিবির একটি দলিল ১৯৪৮এর মার্চে প্রকাশিত হয়। নাম—দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর্যালোচনা (রিভিউ অব সেকেণ্ড কংগ্রেস)। ততদিনে প: বঙ্গের পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়েছে পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি ধীরে ধীরে কলকাতায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় কমিটির, রাজ্য কমিটির ও কলকাতা জেলা কমিটির প্রধান প্রধান নেতা আত্মগোপন করে কলকাতাতেই অবস্থান করতে থাকেন···বিরাট শহর আর 'প: বঙ্গ ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। দৈনিক হাজার হাজার মানুষ পূর্ববঙ্গের বাস্তু ছেড়ে কলকাতা আসছেন। প: বঙ্গ থেকেও অল্প হলেও মুসলমান ওদিকে যাচ্ছে। এই টালমাটালের মধ্যে কলকাতা হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মূলকেন্দ্র, ঘাঁটি। অসংখ্য গোপন আড্ডা, ঘাঁটি, যোগসূত্র আমরা গড়ে তুলেছি। এই সময় উপরোক্ত রিভিউ আমাদের বেশ চাঙ্গা করে তোলে। (এখন দলিলটার বিবরণে আসছি—লেখক।)

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর্যালোচনা (রিভিউ)

পাঁচ বছরের সংগ্রাম ও পরীক্ষা—কুৎসা ও দমনব্যবস্থা সত্ত্বেও "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের প্রধান বিপ্লবী শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠেছে।" ভারতের ও পৃথিবীর জনগণের স্বার্থে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত সহযোগিতা করে সি পি আই এক সঠিক আন্তর্জাতিক পথ গ্রহণ করেছে। বামপন্থী পার্টিসমূহ বুর্জোয়াশ্রেণীর পশ্চাৎ অনুসরণ করে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বহু ব্যক্তি সি পি আই এর পতন অনিবার্য বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু যেহেতু পার্টি জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে, দমননীতি ও কালো বাজারের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করেছে, দুর্ভিক্ষের দিনে জনগণকে সাহায্য করেছে, তাই পার্টির পতন হয় নি, তার সভ্য সংখ্যা দশ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ

হাজার হয়েছে। কংগ্রেস প্রচার করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি অন্য পক্ষে ছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম ও নৌবিদ্রোহ ইত্যাদিতে ভীত বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ রফার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সাম্রাজ্যবাদও তাই চাইছিল।

আমরা যখন জনগণের ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করছিলাম জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বিভেদ ও বিভাজনের প্রয়াসে ব্যস্ত ছিল। বাংলার এগারটা জেলায় হিন্দু-মুসলিম কৃষকের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত করেছিল, পরিচালনা করেছিল, ওয়রলিতে (মহারাষ্ট্রে) আদিবাসীদের সংগ্রাম, তেলেঙ্গানায় কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছিল। যখন পার্টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এবং কিছু বামপন্থী দল বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টির কাজে মত্ত ছিল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও পার্টি মারাত্মক বিচ্যুতি ও ভুল করেছে। 'মাউন্টবেটন রোয়দাদ'কে সাম্রাজ্যবাদের ভারতের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বলে না দেখিয়ে একে অগ্রগতি হিসাবে চিত্রিত করেছে, জাতীয় সরকারকে আপোষ ও আত্মসমর্পণ হিসাবে না দেখে একে অগ্রগতির হাতিয়ার হিসাবে দেখেছে। যখন নেহেরু সরকার জনগণের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে তখন আমরা তাকে সর্ব সমর্থন দিয়েছে। সরকার ও জনগণের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছি। জাতীয় পুনর্গঠন সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করেছি। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার ভীত হয়ে নেহেরু ও গান্ধীর পিছনে চলেছি। ১৯৪৭এর ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব এই বিভ্রান্তি ও স্থিতাবস্থা দূর করে বুর্জোয়ার আপোষ রফার বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক সংগ্রামী পথনির্দেশ দেয়—জনগণের স্বার্থে এক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (জোট) গঠন ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দেয়, সংস্কারবাদী পথ পরিত্যাগ করতে আহ্বান জানায়। "কংগ্রেস নেতৃত্বের সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ ও সহযোগিতার নীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শুরু করতে হবে।"

রাজনৈতিক দলিলের (থিসিস) উপর রিপোর্ট

(১) থিসিস উপস্থিত করেন কমরেড বি.টি. রণদীভে

(২) দেশভাগজনিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের প্রস্তাব—উপস্থিত করেন ভবানী সেন। পাকিস্তানে বসবাসকারী কমরেডরা পাকিস্তান পার্টি গঠন করবেন। (এর বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে—লেখক)

(৩) পার্টির দক্ষিণপন্থীবিচ্যুতির রিপোর্ট—উপস্থিত করলেন রণদীভে। রাজনৈতিক থিসিস উপস্থিত করে রণদীভে বলেন—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে কোনও চীনের প্রাচীর দাঁড়িয়ে নেই। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্য না করায় ভুল হয়েছিল। কমিউনিস্টরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে ফ্যাসীবাদের পরাজয়ের সাথে সাথে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য গণজাগরণ হবে। হয়েছিলও চীন ও পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রেণীবিন্যাসে ও শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন অবস্থা রক্ষা করবার জন্য সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশ করতে চায় সোভিয়েত ও সদ্য স্থাপিত জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল ও প্রধান কথা হল—

(১) ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাহ্যতঃ শক্তি বৃদ্ধি দেখা গেলেও সোভিয়েত দেশ, জনগণতান্ত্রিক দেশসমূহ ও চীন বিপ্লব এর ভিত্তি দুর্বল করেছে, দুর্বল করেছে। ভারতবর্ষ, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েৎনামের যুদ্ধোত্তর অবস্থা সাম্রাজ্যবাদকে কমজোর করে দিয়েছে।

(২) প্রত্যেক দেশে ধনিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঢলে পড়েছে ফলে তাদের মুখোস খুলে দেওয়া শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সোজা হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী যে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিরোধী, শ্রমিকশ্রেণী সেই সংগ্রামে অগ্রণী এ কথা বোঝা সম্ভব করেছে—ভারত সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়ার মধ্যে আঁতাত ও সহযোগিতার ভিত্তি পার্টির পূর্বেকার প্রস্তাবাবলীতে সুস্পষ্ট ছিল না—যথা মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ সম্পর্কে আগের প্রস্তাবগুলি।

—যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতের ধনিকশ্রেণী সম্পদ আহরণ করেছে, তারা আমেরিকার সাথে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প স্থাপনে আগ্রহী। মুদ্রাস্ফীতি ও জনগণকে শোষণ তাদের স্ফীত করে তুলেছে। তারা তাই সংগ্রামবিরোধী।

যুদ্ধোত্তরকালে যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয় তার সুযোগ গ্রহণ করে আমরা কমিউনিস্টরা জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি নি।

—ভারত কৃষি নির্ভরশীল উপনিবেশিক দেশ—কৃষি বিপ্লবই আমাদের সমস্যাবলী দূর করতে পারে।

—উৎপাদন (সর্বপ্রকার) কমে যাচ্ছে। জনগণের দারিদ্র্য বাড়ছে।

—ভারতের তথাকথিত স্বাধীন জাতীয় সরকার বস্তুত জাতীয় আত্ম-সমর্পণের ফল।

তাই আমাদের স্লোগান—জনগণের অধিকাংশকে জয় করবার জন্য বিরাম-হীন অভিযান (ক্যাম্পেন) চাই।

কোন সৎ পার্টি এই সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না। সুতরাং শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের এক মিলিত জনগণতান্ত্রিক জোট (পিপলস ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট) গঠন করতে হবে।

মূল প্রশ্ন হল ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন।

—ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোয়া-সামন্ততন্ত্রের জোট পতনোন্মুখ। ভারত-ভুক্তির নামে দেশী রাজন্যবর্গকে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। সুতরাং পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয়—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ছে।

গণতান্ত্রিক জোট (ফ্রন্ট) চাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য। তার ধ্বনি হবে—জমিদারী প্রথার অবসান, কৃষকের হাতে জমি প্রদান, শিল্পের জাতীয়-করণ ও ধনিকের কব্জা দূর করা, এবং শিল্পে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ, জায়গীরদার, রাজা, নবাব প্রভৃতির সম্বন্ধে যে মোহ জনগণের আছে তা দূরীকরণ, গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য অবিরাম আপোষহীন সংগ্রাম, গভর্ণমেন্ট ও প্রজামণ্ডল-গুলির আপোষকামী প্রচেষ্টায় বাধাপ্রদান—এইসব ধ্বনি ছোট বড় আংশিক ও স্থানীয় আন্দোলনে তুলতে হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ পরিচালনা করছে, পুনাপ্রা ভায়লার, কোয়েম্বাটুর, কানপুর প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট সংগ্রাম সংঘটিত করেছে।

পাকিস্তান সম্পর্কে প্রস্তাব—উত্থাপক ভবানী সেন। দেশভাগজনিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করতে হবে। কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক একতাবোধ এই দুই পার্টিকে এক সূত্রে বেঁধে

রাখবে তাছাড়া একতাবদ্ধন উদ্ভূত হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মিলিত শক্তির প্রধানত হবার জন্য। দুই দেশের জনগণের মৈত্রী সখ্যতা ও সংগ্রাম দুই দেশের সংগ্রামী জনগণকে একত্রে বেঁধে রাখবে। পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট এবং সাম্রাজ্যবাদই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সদা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। উভয় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে ভারতের সেনা প্রবেশ গণতন্ত্রের স্বার্থে নয়। অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখতে হবে। গণতন্ত্রের জয়ের পূর্বে অন্তর্ভুক্তি ফাঁকা কথা। তেলেঙ্গানাই পথ দেখাচ্ছে।

পার্টিতে দক্ষিণ বিচ্যুতির উপর রিপোর্ট

—উত্থাপক কমরেড বি. টি. রণদীভে। জনযুদ্ধ সঠিক প্রলেতারীয় নীতি ছিল। কিন্তু ফ্যাসিবাদের পরাজয় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গণতন্ত্রের জয় এনে দেবে, এ ধারণা বা বিশ্বাস ভুল ছিল। আর এ ধারণাও ভুল ছিল যে ফ্যাসীবিরোধী জনযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ জনগণের হাতে বন্দী হয়েছে, সুতরাং জনযুদ্ধের কাঠামোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনুচিত।

উৎপাদন বাড়াও ধ্বনি সঠিক ছিল কিন্তু আমরা মুনাফাখোরী ও শোষণ যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় সে কথা বুঝলাম না।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে সোভিয়েতের জয় এক সুদূরপ্রসারী পথনির্দেশিকা ছিল। আমরা নমনীয় কৌশল অবলম্বন করে, গণসংগ্রাম শুরু করে, তার চাপ, সাম্রাজ্যবাদের উপর ফেলতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি।

দেশনেতাদের মুক্তি চাওয়া ও জাতীয় সরকারের দাবি সঠিক ছিল কিন্তু এক্ষেত্রেও বুর্জোয়ার লেজুড়বৃত্তি করেছি। বামপন্থী দলকে পঞ্চবাহিনী আখ্যা দিয়েছি এবং তাদের সমালোচনা ও তাদের উপর আক্রমণ বেশী করেছি।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে, ভারতে বিবিধ জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা সঠিক ছিল, কিন্তু তা যেভাবে উপস্থিত করা হয় তাতে পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভাজন নীতির সমর্থন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের পিছনে ঘুরেছি, ভেবেছি তারা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য এনে দেবে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জাতি ও জনগণকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিন্ন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মারফৎ যে শ্রমিকশ্রেণীই একতাবদ্ধ করতে পারে এই লেনিনবাদী নীতি আমরা ভুলে গিয়েছিলাম।

যুদ্ধকালীন দুইটি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি—বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা আছে মনে করে তার পশ্চাতে ছুটেছি। এবং সাম্রাজ্য-বাদকে ছোট করে দেখেছি। সুতরাং যুদ্ধ শেষে যুদ্ধোত্তর গণঅভ্যুত্থান দ্রুত অনুধাবন করতে অক্ষম হই। তার ফলে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র পেয়ে যাবার মিথ্যা আশার শিকার হয়েছি। ১৯৪৬-এর আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব নির্ভুল ছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার প্রচেষ্টা দেখতে পাই নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা—গণ সংগ্রামকে গণ সমর্থনবিহীন ক্রিয়াকলাপ (ভানগার্ড এ্যাকশন) বলে আখ্যা দেওয়া। বিভিন্ন ধর্মঘট, পুনাপ্রাভাসদারের সংগ্রামকেও এইভাবে দেখা হয়েছে। জাঙ্গাগুলির সময় গান্ধী নেহেরুর জয়গান করা হয়েছে। জুন, ১৯৪৭-এর সিসি প্রস্তাবে মাউন্টব্যাটেন রেখে রোয়েদাদকে জনগণের কাছে নতিস্বীকার হিসেবে বলা হয়েছে।

কমরেড রণদীভে সাড়ে চার ঘন্টা রিপোর্ট করেন। কমরেড বি. টি. রণদীভের রিপোর্টিং-এর পরে কমরেড পি. সি. যোশী তাঁর আত্ম-সমালোচনা করেন। মোটের উপর ৩৪ জন প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। কয়েকজন কমরেড বক্তৃতায় দুটি আলাদা পার্টি গঠনের বিরোধিতা করেন। কমরেড সাজ্জাদ জহীর ও রণদীভে দুটি আলাদা দেশের জন্য আলাদা পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বলেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে, সাম্রাজ্য-বাদ, সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া আঁতাতের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত গড়ার কাজে সংগ্রামে দুই পার্টির একসাথে সম্পর্ক রেখে, সংযোগ স্থাপন সংগ্রাম চালাতে হবে।

দু পার্টি গড়ার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল অন্য প্রস্তাবগুলির উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করলেন—একটা প্রস্তাব সংশোধনী আকারে উপস্থিত করা হয় যে কংগ্রেসে আলোচনাগুলির ভিত্তিতে নয়া কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক থিসিসের উপযুক্ত সংশোধন ও সংযোজন করে থিসিসটি পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত করবেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে

"দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি" বলিলে নয়া কেন্দ্রীয় কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে আরও বিস্তারিতভাবে পার্টির মধ্যে যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ঘটেছিল তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ করা হোক। এই প্রস্তাবটিও পাশ হয়।

কমরেড ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী পার্টির গঠনতন্ত্রের কয়েকটা সংশোধন সুপারিশ করেন। তার উপর কমরেড ভবানী সেন পার্টির সামনে যে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব আদর্শ গঠনতন্ত্রে সংযোজন করতে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। এই সংশোধনী ও পাশ হয়।

যে চৌত্রিশ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন সংপাল ডাং সুনীল মুখার্জি, ইন্দ্রদীপ সিন্‌হা, হনুমন্ত রাও (অন্ধ্র), ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, সরোজ রায়, কুমুদ বিশ্বাস, হীরেন মুখার্জি, মোহন কুমারমঙ্গলম।

নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নলিখিত কমরেডদের নিয়ে গঠিত হল—নতুন ও পুরাতনের সমান সংখ্যা ছিল। যোশীর নামও প্রস্তাবিত হয়েছিল কিন্তু মোহনকুমার মঙ্গলম যোশীর নামের বিরোধিতা করে কমরেড রবিনারায়ণ রেড্ডী, (যিনি তিনবার অন্ধ্র মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ও তেলেঙ্গানা সংগ্রামের নেতাদের অন্যতম লেখক) নাম প্রস্তাব করেন ও তা পাশ হয়।

নতুন সিসি কমরেডদের নাম—রণদীভে, ভবানী সেন, লাহিড়ী, অধিকারী, অজয় ঘোষ, এন. কে. কৃষ্ণাণ, রাজেশ্বর রাও, এম. চন্দ্রশেখর রাও, ইউসুফ (পলিবি সদস্য) ডাঙ্গে, ঘাটে, রণেন সেন, ডি. এম. বৈদ্য, সুন্দরায়া, ই. এম. এস, অরুণ বোস, সরদেশাই, বিশ্বনাথ মুখার্জি, কৃষ্ণ পিল্লাই (কেরালা পার্টির সেক্রেটারী), কে. সি. জর্জ, বাসবপুন্নায়া, ডি. ডি, রাও, এল. ভি. ওঝ, পারুলেকর, কল্যাণসুন্দরম, শ্রীনিবাস রাও, মুজাফ্‌ফর আহমদ, বীরেন মিত্র (আসাম), মহঃ ইসমাইল, সুনীল মুখার্জি, রবিনারায়ণ রেড্ডি। রণদীভে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। কনট্রোল কমিশনে—মিরাজকর, কে. পি. আর. গোপালন ও রাধারমণ মিত্র সভ্য নির্বাচিত হলেন।

(পলিবি কর্তৃক প্রচারিত এই রিভিউ খুবই সংক্ষেপে উপস্থিত করলুম। কারণ কংগ্রেসের দলিলে যা অপূর্ণ ছিল, পরবর্তী দলিলগুলি তা বামদিকে আরও ঠেলে নিয়ে যায় তার বিবরণ পরে বিস্তারিত দেব—লেখক)

(চলবে)

কাজী আবদুল ওদুদ ঃ অসাম্প্রদায়িক অনুপ্রেরণা

অপূর্বকুমার রায়

●

> সৃষ্টিতে একক নিঃসম্পর্ক বা অপরিবর্তনীয় কিছুই নাই। সে-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি নামে মানুষ যে কোনো এক কালে পরিচিত হয়েছিল এইই তার চিরকালের পরিচয় এ-চিন্তার পরিসর এত ক্ষুদ্র যে একে অসত্য বলা যেতে পারে। যা আছে শুধু তাইই সত্য নয়, যা হওয়া উচিত মানুষের জন্য তাইই বিশেষ-ভাবে সত্য--তা সে-সত্যের উপলব্ধিতে মানুষের যত দীর্ঘকালই ব্যয়িত হোক।
>
> [কাজী আবদুল ওদুদ, সমাজ ও সাহিত্য, মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪১, পৃ. ৭৬]

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম আহ্বায়ক আবদুল ওদুদ আজীবন এই সত্যের প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকেই তিনি উদার মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান শতকের বিশের দশক থেকে অসাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তিনি অনুক্ষণ অনলস ছিলেন। কাজী সাহেবের কর্মক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি কখনো সমিতি-সংগঠক, কখনো বক্তা, কখনো লেখক। যে সব গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছিলেন, সে সব গ্রন্থের (সমাজ ও সাহিত্য/শাশ্বত বঙ্গ/নব পর্যায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ/পথ ও বিপথ) জন্য স্বদেশবাসীর কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ধর্মনিরপেক্ষ ওদুদ সাহেব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপনে সক্রিয় ভূমিকায় সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হলেন ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করে (১৯২৬)।

হিন্দু-মুসলমান মৌলবাদী চিন্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেশবাসীকে শোনালেন সমন্বয়ের সুর। তাঁর আদর্শ ছিল মধ্যযুগের আলবেরুণী আর আধুনিক কালের রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ। কেউ কেউ তাঁকে রাম-মোহন-পন্থী বলে ব্যঙ্গ করেছেন (আবুল কালাম শামসুদ্দিন ওদুদ-কে রামমোহন পন্থী বলে বিদ্রূপ করেছিলেন)। যাইহোক, ঢাকা মুসলিম সমাজের প্রতি প্রথমে একটু লক্ষ্য করছি। এই সমাজের পরিচালনায় যাঁরা ওদুদ সাহেবের সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জনাব আবুল হোসেন, আবদুল মজিদ, আবদুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল এবং কাজী আনোয়ারুল কাদিরের নাম উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয়, এই সমাজের বার্ষিক সভায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করতেন। সুললিত কণ্ঠের অধিকারি অধ্যক্ষ সুরেন মৈত্র সমাজের সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। অন্যান্য বিশিষ্ট হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল এবং অধ্যাপক ও সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমাজের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ছিলেন। এই সাহিত্য সমাজের এক বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের এক বার্ষিক সভায় আবদুল ওদুদ তাঁর 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তরুণ শিক্ষিত মুসলমান সমাজের একাংশ ওদুদ সাহেবকে প্রশংসা করলেও মুসলমান মৌলবাদী সমাজ তাঁকে 'কাফের' এবং 'মুসলমানের শত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করলেন। ওদুদের 'নব-পর্যায়' গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি পরিবেশিত হলে (১৯৩৩) 'মাসিক মোহম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক মৌলনা আকরাম খান তাঁর সাময়িক পত্রিকার পাতায় পর পর কয়েক মাস ওদুদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। আর এখানেই শেষ নয়, মৌলবাদীরা ক্রমশ তাঁর প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন। মুসলিম লীগ এবং মৌলানাদের উৎসাহে আবদুল ওদুদ এবং আবুল হোসেনকে সমাজচ্যুত করা হয়। অভিজাত মুসলমানেরা ঢাকার নবাব প্রাসাদে তাঁদের বিচারের দাবি জানায়। শুধু তাই নয়, খাজিম আহ্‌মেদের ভাষায় পরিনামে 'কাজী আবদুল ওদুদের জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়' (খাজিম আহ্‌মেদ, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি, চতুরঙ্গ, জুন ১৯৮৭, পৃ. ১৭)। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের লাহোর সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করল মুসলিম

লীগ, আর সেই বছরই আবদুল ওদুদ ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে এলেন। 'সম্মোহিত 'মুসলমান' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমলেন্দু দে বলেছেন,

> In the article, Sammohita Musalman (Fascinated Muslim), Kazi Wadud showed honour to Prophet Muhammad as 'a great man', but he refused to accept him as an 'omniscient' or as an 'all-pervading master'. He observed that the Prophet 'is only a great friend of men in their struggle; just like a light house to the sea-voyagers'. He could not agree with those who believed that the Prophet chalked out the comses of men for all time to come. ..The modern Musalman was so much captured by the Quran and other scriptures that he could not look at the world with a clear vision and he had lost his judgment as well as creative faculties.
>
> [Amalendu De, Islam is Modern India, Maya Prakashan. 1982, pp. 83-84]

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, য়ুরোপে গত শতাব্দীতে আর্নেষ্ট রেণাঁ (Ernest Renan) এবং ডেভিড স্ট্রস (David Straws) যথাক্রমে Vie de Jesus এবং Leben Jesu গ্রন্থে যীশুখ্রীষ্টের ঐশ্বরিক মহিমার পরিবর্তে মানবিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার ফলে খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। আর, বঙ্কিমচন্দ্র, যখন প্রতীচ্যের মানবিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষ্ণ চরিত্রকে ধর্মীয় নির্মোক থেকে মুক্ত করে নবরূপ দানে সচেষ্ট হয়েছিলেন তখন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে তিনি নিন্দিত হয়েছিলেন।

যাইহোক, আবদুল ওদুদ বুদ্ধির আলোকে স্বধর্মের সমালোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। আর, আপন ধর্মের বিরুদ্ধে মন্তব্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি 'পথ ও বিপথ' শীর্ষক নাটিকার ভিন্নধর্মী দুটি চরিত্রের মুখে ব্যক্ত করেছেন। এই নাটকের একটি চরিত্র সুজিৎ যখন বর্ণ হিন্দুদের রক্ষণশীল

অবিবেচনার বিষয়ে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে তখন তার বন্ধু আলি গওহর বলেছে,

> মুসলমানের দুঃখটা তুমি যেভাবে দেখেছ সেটি চমৎকার। কিন্তু বর্ণ-হিন্দুদের দুঃখটাও ত তোমাকে দেখতে হবে। তাদের প্রতি তুমি যে এত কঠোর হতে পেরেছ তার প্রচ্ছন্ন কারণ তাঁরা তোমার আপনার জন—দুই ছেলেতে বিবাদ হলে বুদ্ধিমান পিতা নিজের ছেলেকে শাসন করেন বেশী।
>
> [পথ ও বিপথ, দ্বিতীয় দৃশ্য, বিশ্বভারতী, ১৩৪৬, পৃ. ৩৭]

স্বীয় ধর্মের মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি যেমন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি তিনি আশা করতেন যে তাঁরই মত হিন্দুরাও স্বদেশমনস্ক হয়ে এবং মানবিকতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার অবসানে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হবেন।

তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কার যেখানে মানুষের সাথে মানুষের মিলনের পথ রুদ্ধ করে, বপন করে বিচ্ছিন্নতার বীজ সেখানে মানুষের অগ্রগতি স্বভাবতই অসম্ভব হতে পারে না। তাই, ওদুদ সাহেবের কাছে ধর্ম দেশকাল নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হয় নি। আর, ঠিক এই কারণেই কলকাতার মুসলিম সাহিত্য সমিতির আলোচনা চক্রে পঠিত 'মুস্তাফা কামাল সম্পর্কে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে কামালের খিলাফৎ-বিরোধী সংস্কার-পন্থাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। সে সময়ের শিক্ষিত ও তরুণ মুসলমান সমাজের কাছে এই প্রবন্ধটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল। ঢাকায় ফিরে এলে ছাত্রদের অনুরোধে মুসলিম হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমাবেশে তিনি এই প্রবন্ধটি আবার পাঠ করেন। এই সভায় ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রেরণা আবুল হোসেন এই প্রবন্ধটির মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, প্রায় একই সময়ে লেখা, আবুল হোসেনের কয়েকটি প্রবন্ধও (সত্য/অহমিকা/আজ্ঞানুবর্তিতা) তরুণ সমাজে তরঙ্গ তুলেছিল।

যাই হোক, মুসলিম সাহিত্য সমাজের সভ্যবৃন্দ ধর্মীয় সংকীর্ণতার অবসানে নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একটু আগেই আবদুল ওদুদ এবং আবুল হোসেনের কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি। এবার এই সমাজের মুখপত্র 'শিখা' কথা একটু স্মরণ করছি। সমাজের এই বার্ষিক মুখপত্রটি পর পর পাঁচ

বছর প্রকাশিত হয়েছিল। সমাজের মূল আদর্শ এই পত্রিকাটির শিরোনাম-পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হত : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। এই পংক্তিটির পরিকল্পনায় ছিলেন আবদুল ওদুদ। আর, 'বুদ্ধির মুক্তি' কথাটিও আবদুল ওদুদেরই দেওয়া। সম্ভবত, রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুসরণে এই শব্দ নিশ্চয় সমাজের মূল বাণীতে পরিণত হয়েছিল। শুধু এই দুটি শব্দ কেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় স্বদেশের যে আদর্শ রূপ কামনা করেছিলেন সেই রূপেরই প্রতিষ্ঠায় ওদুদ এবং তাঁর সহযোগী সহমর্মী মানুষেরা প্রয়াসী হয়েছিলেন; তাঁরাও চেয়েছিলেন রবীন্দ্র-মানসে উদ্ভাসিত স্বদেশ : 'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি/বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সহযোগী অপর একটি অসাম্প্রদায়িক সংস্থার (বিশ্বভারতী সম্মিলনী) সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সচেষ্টাও স্মরণযোগ্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই সংগঠনটিও ঢাকার হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশিষ্ট মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই সম্মিলনী স্থাপন করেছিলেন ঢাকার বাণীমন্দির গ্রন্থবিপণির প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন চৌধুরী। এই বিপণিটি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের গ্রন্থ বিক্রয়ের নাগরিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। লক্ষণীয়, বিশ্বভারতী সম্মিলনীর তিনজন সম্পাদকের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান ; আর, এই সম্মিলনীর সাদর আমন্ত্রণে আবদুল ওদুদ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনটি মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সম্মিলনী হিন্দু-মুসলমান শিক্ষকদের যৌথ সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল ঢাকার মুকুল থিয়েটারে।

যখন হিন্দু এবং মুসলমান মৌলবাদীরা ভারতবর্ষে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে দেশ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তখন ওদুদ সাহেব ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সহযোগিতায়, বাংলা দেশে, বিশেষত ঢাকা শহরে, বেশ কয়েক বছর ধরে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পাঠ করেছিলেন সে সব প্রবন্ধের বিষয় একটু আগে আমরা লক্ষ্য করেছি। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে (১৯২৬-৩৬) অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান বিষয়ে, তিনি আরো কতকগুলো মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত, তাঁর 'সমাজ ও সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে পরিবেশিত

'রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য', 'মোহম্মদ আলী' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত প্রথম প্রবন্ধটিতে তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। রামমোহনের সমন্বয়পন্থার প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এই মনোভঙ্গির জন্য তিনি যে রক্ষণশীল মুসলমানদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন সে কথা একটু আগেই স্মরণ করেছি। রামমোহনের উদার আদর্শে আস্থাবান উদারপন্থী আবদুল ওদুদের রামমোহন সম্পর্কিত প্রবন্ধটির একটি মনোজ্ঞ উক্তি দিয়ে বর্তমান নিবন্ধের সূচনা করেছি। এই একটি উক্তির মধ্যেই ওদুদ সাহেবের জীবনদর্শন উদ্ভাসিত হয়েছে। মোহম্মদ আলী স্মরণে তিনি যে প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> মোহম্মদ আলীর সুবৃহৎ চিত্তে rationalism এবং nationalism-এর যে বীজ লুক্কায়িত ছিল তাকেই মহীরুহে বর্ধিত করে তোলা তাঁকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের আজ হয়ত সব-চাইতে বড় কাজ। [সমাজ ও সাহিত্য, মোহম্মদ আলী, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৭২]

এবার সংস্কৃতি সমন্বয়ের দূত আবদুল ওদুদের ডাক পড়ল বিশ্বভারতীর অঙ্গনে। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ বিষয়ে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন (নিজাম বক্তৃতামালা, হিন্দুমুসলমানের বিরোধ, ২৬-২৮ মার্চ, ১৯৩৫)। যথাক্রমে এই বক্তৃতা তিনটির শিরোনাম স্মরণ করছি : মুসলমানের পরিচয়, দেশের জাগরণ এবং ব্যর্থতার প্রতিকার। এই বছরই, 'রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ হিন্দুমুসলমানের বিরোধ' নামে এই বক্তৃতাটি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশ করেছিল (মাঘ, ১৩৪২)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> এদেশে হিন্দুমুসলমানের বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতশ্বাস হয়ে পড়ে এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত মূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে তাঁকে নমস্কার করেছি।

ওদুদ সাহেবের 'সাহিত্য ও সমাজ', 'শাশ্বত বঙ্গ', হিন্দুমুসলমানের বিরোধ' এবং 'পথ ও বিপথ' গ্রন্থনিচয় অনুসরণ করলে দেখা যায় যে তিনি ধর্মকে আচার-

সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে সনাতন উচ্চ আদর্শে সকল ধর্মের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে মানবিকতার উদবোধন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'পথ ও বিপথ' শীর্ষক নাটকটির দুটি বিপরীত আদর্শের চরিত্রের—ইসলাম প্রচারক বশীরুদ্দিন এবং উদারপন্থী সাহিত্যিক আলি গওহরের—কথোপকথনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। নাটিকাটির মুখ্য চরিত্রের মুখে নাট্যকার আবদুল ওদুদের আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে :

> বশীরুদ্দিন। ভালো কথা। দেশের উন্নতি কে না চায়। আপনি হজরতের সেই হাদিস জানেন—হুব্বুল্ ওতন মিনাল্ ইমান—স্বদেশ-প্রেম ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু কোন্ পথে সেই উন্নতি খুঁজবো সেই কি খুব বড় কথা নয়? যেখানে যার সঙ্গে অমিল তার সঙ্গে এক-আত্মা হওয়া যায় কি করে বুঝি না।
>
> আলি গওহর। বোঝা খুব কঠিন নয় মওলানা সাহেব। জগতে অমিলের কি অন্ত আছে। আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার কত বিষয়ে কত রকমের অমিল। অমিলের চাইতে তাই বেশী করে ভাবতে হয় মিলের কথা। সেই মিল যেখানে বড় রকমের সেখানে ছোটখাট বহু অমিল অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে।
>
> [পথ ও বিপথ, প্রথম দৃশ্য]

'হিন্দুমুসলমানের বিরোধ' শীর্ষক গ্রন্থে আমাদের 'ব্যর্থতার প্রতিকার' প্রসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' সম্পর্কিত আদর্শ এবং রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ধর্মিতার সমর্থন করেছেন। ওদুদ সাহেবের বিশ্বাস,

> দেশের লোক যদি অন্ততঃ এই কথাটা বুঝতে পারে যে মানুষ বিচিত্র, মানুষের মনও বিচিত্র, সব এক ছাঁচে ঢালাই সম্ভবপর নয়, তা হলেও বিরোধ-শান্তির অনেকটা সহায়ক হয়।
>
> [হিন্দুমুসলমানের বিরোধ, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫০]

রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করতে গিয়ে আবদুল ওদুদ বলেছেন,

> রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়-বাদের দুইটি ধারা। একদিকে, তাঁকেও বলা যায় 'যত মত তত পথ'বাদী—বিভিন্ন শ্রেণীগত ও দেশগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি শ্রদ্ধাপূর্ণ; আর এক দিকে তিনি বিশেষভাবে সৃষ্টিধর্মী—

> মানুষকে দেশে কালে বিভক্ত না দেখে এক অখণ্ড বিকাশমান সমাজের সত্যরূপে দেখেছেন···। তাঁর **Religion of Man** গ্রন্থে তাঁর এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই যে বিকাশ-ধর্মী মানুষ সমাজ-জীবনে অক্লান্তভাবে সৃষ্টিশীল হয়ে চলা যার জন্য সার্থকতার পথ, এর অভ্যুদয় না হলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বলতে আমাদের যে দুঃখ বোঝায় তার দূর হবে না এই-ই আমাদের প্রধান নিবেদন।
>
> [তদেব]

তাঁর মতে, এই বিকাশধর্ম বা সৃষ্টিধর্ম মানুষের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়, এরই প্রভাবে 'পরিবেষ্টনকে নিয়ে' মানুষ নতুন হয়ে ফুটে ওঠে। 'দেহের কোষানু-সমূহের অক্সিজেনসংস্পর্শে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হওয়া দৈহিক স্বাস্থ্যের কারণে যেমন প্রয়োজন তেমনি চারিদিকের জীবনের সঙ্গে সংস্রবের প্রভাবে সমাজদেহের পরিবর্তন ও বিকাশ প্রয়োজন। কিন্তু, ধর্মমোহের প্রভাবে আমাদের দেশে 'চারিদিকের জীবনের সঙ্গে সংস্রবের অভাব' ঘটেছে। আবদুল ওদুদের ভাষায়,

> ধর্ম-মোহই যে এদেশে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-ধর্মের ব্যর্থতার প্রতিরূপ তার একটি বড় পরিচয় এই যে হিন্দু-জাগরণের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মুসলমানদের ভিতরে বিশেষভাবে জাগ্‌লো সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বুদ্ধি।
>
> [তদেব, পৃ. ৫৩]

তিনি মনে করেছেন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ সম্ভব 'যদি ধর্মকে চিরস্থির বিধানরূপে গণ্য না করে আবিষ্কারের বিষয় বলে ভাবা যায়'। সুতরাং হিন্দু হিন্দুত্বে নিষ্ঠাবান হলে এবং মুসলমান তার মুসল-মানত্বে নিষ্ঠাবান হলে তাদের মিলনপথ মসৃণ হবে, এ কথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা ভ্রান্ত। প্রতিকারের প্রকৃত পথ রয়েছে অন্যত্র। তাঁর বক্তব্য,

> ···এইসব ধর্ম ভবিষ্যতে কিভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম-শক্তির সূতিকাগার হবে এইই হওয়া চাই হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিশেষ সাধনার বিষয়, এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে—যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।
>
> [তদেব, পৃ.-৫৫]

মুসলমানের চিন্তার ইতিহাস অনুসরণ করে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সেখানেও

বিচারবুদ্ধি ও শাস্ত্রানুগত্যের সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে শাস্ত্রানুগত্যপন্থী ধর্মীয় নেতা আবদুল ওয়াহ্হাব 'আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন' বাদকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছিলেন। ভারতবর্ষে ওয়াহ্হাবী ধারার বিশেষ প্রসার শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময় বিচার-পন্থী সৈয়দ আহ্মদ ও আমির আলি শাস্ত্রানুগত্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেও ক্রমশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে, এবং হিন্দু জাগরণের প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মুসলমান সমাজে সনাতন-পন্থার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং এরই ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততা প্রকট হয়ে ওঠে [দ্বিতীয় বক্তৃতা, পৃ, ৯-১২ দ্রষ্টব্য]। অবশ্য, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততা পূর্ববর্তীকালে যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল একথা তিনি মানতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর **A Nation in Making** গ্রন্থে বলেছেন যে স্বদেশী আন্দোলন থেকে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সৃষ্টি। এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আবদুল ওদুদ অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সংবাদ দিয়েছেন :

> মোগল শাসনের শেষভাগে গুজরাটে ও কাশ্মীরে যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ার মোতাখেরীন'-এ তার উল্লেখ আছে।
>
> [প্রথম বক্তৃতা, পৃ.২]

যাই হোক, ধর্মের দেশকালনিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধিবিহীন সনাতনী আবেদন যে সাম্প্রদায়িকতার উজ্জীবনে সহায়ক এ-বিষয়ে ওদুদ সাহেব ছিলেন স্থির নিশ্চিত। হিন্দু বা মুসলমান বা যে কোন ধর্মের শাস্ত্র-সংস্কার যে মানুষের বিকাশের পরিপন্থী এবং ভ্রান্ত ধারণার পরিপোষক সে-বিষয়ে তিনি ছিলেন সংশয়বিহীন। এই বিষয়ে তিনি আপন ধর্মের শাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিয়েছেন :

> মদিনায় অবতীর্ণ একটি 'সুরা'র শেষে বলা হয়েছে—'হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহর রোষে যারা পতিত হয়েছে সেই দলের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না' (৬০ : ১৩)। টীকাকার বলেছেন, এখানে ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে। সমসাময়িক মুসলমানেরা হয়ত এই কথাই ভাল করে বুঝেছিলেন এবং তাঁদের অনুবর্তিতায় পরবর্তী মুসলমানেরা হয়ত বুঝেছেন—যাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোর্-আনের অনভিপ্রেত। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় এই বাক্যের সত্যকার মর্যাদা

> ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলাই বাহুল্য। একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে সেইদিনে মুসলমান বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন আর তাদের ধ্বংসকামী গর্বিত ইহুদী ধর্মপ্রাণ ছিলেন না। কিন্তু ধর্মপ্রাণতা কোন সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়। তাই কালে কালে এমন অবস্থার উদ্ভব সম্ভবপর যখন মুসলমান সমাজের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বন্ধু সেই সমাজে দুর্লভ হতে পারে ও সেই সমাজের বাইরে সুলভ হতে পারে।
>
> [প্রথম বক্তৃতা, পৃ. ৬-৭]

প্রত্যুত, সনাতনকে আঁকড়ে থাকার স্থবিরত্ব যে সমাজ ও স্বদেশের পক্ষে সুফলদায়ক নয় এই নির্মম সত্য ওদুদ সাহেব উপলব্ধি করেছিলেন। এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার আদর্শ যে শেষ পর্যন্ত আত্মহা পথেই আমাদের পরিচালিত করে সে বিষয়ে তিনি আমাদের সচেতন করতে চেয়েছিলেন। খাজিম আহমেদ ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছেন,

> কাজী আবদুল ওদুদ মুসলিম সমাজের ধর্মান্ধতা এবং অস্বচ্ছ চিন্তার বিরুদ্ধে তুলনারহিত সংগ্রাম শুরু করেন। ধর্মীয় নির্দেশের প্রতি 'অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে সতর্ক মনের উজ্জীবন আশা করেছিলেন তিনি।
>
> [চতুরঙ্গ, জুন, ১৯৮৭, পৃ. ১৭২]

সমাজের সত্যকার অগ্রগতির স্বার্থে সৃষ্টিধর্ম বা বিকাশধর্মের অনুবর্তনার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করে বলেছিলেন যে অতীতের প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত হব, কিন্তু অতীতের পূজারিতে পরিণত হব না, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। দেশের বর্তমান সংকটে তিনি সৃষ্টিধর্মী নব নেতাদের আগমনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই নব নেতাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন,

> ...সুপ্রাচীন 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'-এর মিলন তাঁদের কাম্য হবে না, কেননা তা অসত্য ও অসম্ভব, তাদের কাম্য হবে একটি নব জাতি গঠন—যার সূচনা নানাভাবে বহুকাল ধরে দেশে হয়েছে, দেশের এ কালের জীবনের জন্য যার প্রয়োজনের অন্ত নেই। মনোজীবন ও রাষ্ট্রজীবন দুই ক্ষেত্রেই অভ্রান্তভাবে চলবে তাঁদের সৃষ্টির কাজ। একালের যে ধর্মসম্প্রদায়গত রাষ্ট্রজীবন সেটি কদাচ তাঁদের সমর্থনের

বিষয় হবে না, কেননা, তার ফলে এ দেশের অভিশাপ-রূপ জাতি-ভেদ নব নব সম্ভাবনা লাভ করে চলবে ; তাঁদের সাধনার বিষয় হবে দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ, কেননা তারই ভিতর নিহিত রয়েছে দেশের রাষ্ট্রজীবনের, অথবা জীবনের, সত্যকার বিকাশ সম্ভাবনা।
[তৃতীয় বক্তৃতা, পৃ. ৬০]

স্বদেশপ্রেমিক ওদুদ সাহেব স্বদেশের স্বার্থে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এক মহাজাতিক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পঙ্কিল রাজনৈতিক আবর্তে সমর্পিত স্বদেশভূমি যখন দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে, তখন আবদুল ওদুদ তাঁর 'পথ ও বিপথ' নাটকটির প্রধান চরিত্র সাহিত্যিক আলি গওহরের মুখে তাঁর নিজের আদর্শই প্রতিফলিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত নাটকটি থেকে নবীন সাংবাদিক গোলাম মওলা এবং সাহিত্যিক আলি গওহরের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

গোলাম মওলা। বাস্তবিক ইকবালের পাকস্থান পরিকল্পনাটি ভাববার মতো বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের এই অনেক কালের কঠিন বিরোধের রীতিমতো সম্মুখীন হবার চেষ্টা রয়েছে ওতে।

আলি গওহর। দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঠিক নেই যদিও ইকবালের মতো প্রতিভাবানের নাম ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ওর গোড়ায় রয়েছে এক বড় রকমের গলদ—যে-শক্তিবলে এমন বিভাগে বিভক্ত জনগণের জীবন-বিকাশের সহায় হতে পারে তারই অভাব ঘটেছে ওতে। এমন বিভাগ করতে চাওয়া হয়েছে প্রাচীন ধর্ম এবং ধর্ম-সম্পর্কিত সংস্কৃতির বিভিন্ন-ভিত্তিতে কিন্তু সেইটেই যে একালে মানুষের আশ্রয়যোগ্য ভিত্তি আর নয়।...নবা অভ্যুত্থানকামী মুসলিম দেশেও প্রেরণা আসছে প্রাচীন ধর্ম ও প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে নয়—নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব-আশা ও নব-শক্তি সম্ভাবনা থেকে।
[পথ ও বিপথ, তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ৬৯]

এই আলী গওহরই একটু পরে স্পষ্টভাষায় বলেছে, 'বাঙালী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী না হয়ে বরং বাঙালী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী হয়েও আমরা ভারতীয়ই হব বেশী' অথবা, 'ভারতীয়তা আমাদের উদ্ধার-মন্ত্র—আমাদের রক্ষা-মন্ত্র হবার ক্ষমতাও তারই আছে।' এবং এই নাটিকাটি শেষ হয়েছে বলিষ্ঠ আশাবাদী সুরে—

'ধর্মবর্ণ-নির্বেশেষে দেশের চির নবীনগণ হতে চলেছে চিরশ্রদ্ধের ভারতবাসী'। [তদেব, পৃ. ৭৭]

লক্ষণীয়, এই নাটিকার প্রায় সব দৃশ্যেই বিপথগামী ভারতবাসীর কাছে ওদুদ সাহেব সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। উল্লিখিত রচনাটির প্রথম দৃশ্যে আলি গওহর অমিলের মধ্যে মিলের সন্ধান করতে চেয়েছে, আর, দ্বিতীয় দৃশ্যে সদ্যমুক্ত রাজবন্দী সুজিৎকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, 'এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর কিছু হবার ঝোঁক কাটানো শক্ত। কিন্তু সে ঝোঁক কাটাতে হবে।'

'পথ ও বিপথ' গ্রন্থটির ভূমিকায় আবদুল ওদুদ দেশের সংকটে সাহিত্য-সেবীর সঠিক ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন,

> ভারতবর্ষের সাহিত্যিকরা···এক যুগ-সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হয়েছে, এই প্রশ্নে আজ তাদের অন্তরাত্মা মথিত—তাদের দেশের জন্য কোন্‌টি জীবনের পথ কোন্‌টি মৃত্যুর পথ। বাংলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ গুজরাটের চাইতে ভারতবর্ষই আজ তাদের সত্যকার স্বদেশ কেননা তাদের একালের জীবনের ধাত্রী হবার যোগ্যতা বিশাল ভারতবর্ষেরই আছে, কোনো প্রদেশের নেই।···এমন যুগ সন্ধিক্ষণে প্রচারক না হয়ে তাদের উপায় নেই, তবে তারা যেন হয় একমাত্র তাদের অনুভূত সত্যের প্রচারক আর কিছুরই নয়।

তাই, সাহিত্যসেবী আবদুল ওদুদ দেশের চরম দুর্দৈব দর্শনে তাঁর অনুভূত সত্যের প্রচারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধির আলোকে আমাদের চলার পথ আলোকিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু, রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আমরা যেমন উপেক্ষা করেছি তেমনি আবদুল ওদুদের আবেদনেও আমরা সাড়া দিই নি। বিশেষত, ব্যক্তিক স্তরে ওদুদের অসাম্প্রদায়িক আবেদন কিছুটা কার্যকরী হলেও, কখনোই সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে দেশবাসীকে পরিচালিত করে নি। বস্তুত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রযন্ত্রই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নির্বাচনী বৈতরণী

পার হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় পাথেয় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সত্যদর্শনে ও সত্যভাষণে সতর্ক ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের সার্বিক উন্নতির পরিপন্থী এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা যখন প্রকট হয়ে ওঠে তখন আমরা সাময়িক সমাধান-সূত্র আবিষ্কার করে উল্লসিত হয়ে উঠি। ওদুদ সাহেব কিন্তু সমস্যার মর্মমূলে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ধর্ম ও সম্প্রদায়িকতা নয়, জ্ঞান ও জাতীয়তার আদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে।

দুর্ভাগ্যবশত, দেশের সাম্প্রদায়িক সংকট নিত্য নতুন পথে প্রসারিত হয়ে চলেছে। দীর্ঘ দিনের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পাশে এখন জন্ম নিয়েছে শিখ হিন্দু সমস্যা। ধর্মমোহ এবং রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির মণিকাঞ্চনযোগে এর পর হয়ত সব ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বনাশা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। সেই সর্বনাশা দিনটির প্রতি আমরা কি বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মতো অনিবার্য বেগে ধাবিত হব? নব ভারতের যে আদর্শ রূপের আরাধনায় আবদুল ওদুদ নির্দিষ্টচিত্ত ছিলেন সেই নব রূপ কি আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠবে না? ভারতীয় মহাপুরুষদের 'রাত্রির তপস্যা, সে কি আনিবে না দিন'?

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন

নরহরি কবিরাজ

মার্কিনবাদীদের মতে একটি বিপ্লবের সাফল্য দেখা দেয় ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে। সেই নিরিখে বিচার করলে, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তার জন্মের পরে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল অতিক্রান্ত হলেও আজও ক্ষমতা দখলের কিনারে গিয়ে পৌঁছাতে পারে নি।

আরও উদ্বেগের বিষয়: ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ভারতে যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা প্রায় এক-নাগাড়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করার যে সংকল্প কমিউনিস্টরা বারবার ঘোষণা করেছে তা আজও পূর্ণ হয় নি, এবং নিকট ভবিষ্যতে পূর্ণ হবার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল নয়।

বিষয়টি কমিউনিস্টদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী ঔপনিবেশিক বিপ্লবের যে রণনীতি কমিউনিস্টরা এতকাল অনুসরণ করে এসেছে তা কি ভারতের পার্টিতে অচল? না, সেই রণনীতি সঠিক হলেও ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করতে ভারতীয় কমিউনিস্টরা ব্যর্থ হয়েছে?

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রণনীতির বিকল্প হিসাবে কমিউনিস্টরা লেনিনের চিন্তা অনুসরণ ক'রে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের যে প্রেক্ষিত তুলে ধরেছে তার যুক্তি-যুক্ততা ইতিহাসগতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। নিজ নিজ দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি সামনে রেখে চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া এবং পরে কিউবা ঔপনিবেশিক বিপ্লবের লেনিনীয় রণনীতি অনুসরণ করেছে, নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে সমাজতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছাতে পেরেছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, উপরোক্ত দেশগুলিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি শক্তিশালী ধারা হিসাবে কখনও

আবির্ভূত হয় নি। সেদিক থেকে ভারত একটি ব্যতিক্রম। ভারতে গান্ধীজী ও পরে পণ্ডিত নেহেরুর পরিচালনায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারাটি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি শক্তিশালী ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, এই ধারাটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মূলস্রোত হিসাবে গণ্য হয়েছে। ঠিক এই রকমটি অন্য কোনো পরাধীন দেশে ঘটে নি। ভারতের এই বিশেষ পরিস্থিতি মনে না রাখলে সমস্যার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অন্য দেশের কমিউনিস্টদের মতই ভারতীয় কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে, জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রাম সংগঠিত করেছে, জাতীয় আন্দোলনে একটি বামপন্থী ধারা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে, এক আপোষহীন, বৈপ্লবিক তরঙ্গে জাতীয় আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। যখনই তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে, তখনই তাদের এক শক্তিশালী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং এই ধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি হবে তা স্থির করতে হয়েছে।

এখানেই উদ্ভূত হয়েছে প্রধান সমস্যা। তাদের সামনে বারবার প্রশ্ন উঠছে—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারাটি সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শক্তি, না সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই দুটিকে ঠিক্ কোন মাত্রায় মেলাতে হবে—এই জটিল প্রশ্নটির সন্তোষজনক সমাধান বের করতে তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

এই পরীক্ষায় কমিউনিস্টরা উত্তীর্ণ হতে পারে নি এই কারণে যে তারা একটি সহজ পথের সন্ধান করেছে। কখনও সোভিয়েতের পথ, কখনও চীনের পথের মধ্যে নিজেদের পথের নির্দেশ খুঁজেছে। দেশের নিজস্ব পরিস্থিতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে ভারতের নিজস্ব পথ আবিষ্কারের তারা চেষ্টা করে নি।

আমাদের দেশে বিপ্লবের পথ কি হবে তা আমাদের স্থির করতে হবে। চাতকপাখীর মত মস্কো বা চীনের দিকে তাকিয়ে থাকলে সেই লক্ষ্যে কখনও পৌঁছানো যাবে না। দেশের অর্থনীতি, দেশের ইতিহাস, দেশের ঐতিহ্য, দেশের দর্শন-চিন্তা, দেশের মানসিকতার গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে নিজস্ব পথের

সন্ধান মিলবে না। ভারতের জলবায়ুতে যাঁরা মানুষ তাঁদেরই একাজ করতে হবে। এক কথায়, নিজের দেশকে চিনতে হবে।

এই কাজ একমাত্র কমিউনিস্টরাই সঠিকভাবে করতে পারে। কেননা এই কাজ করার মত হাতিয়ার তাদের আছে। ঔপনিবেশিক বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারা একটি নতুন পথের নিশানা এনে দিয়েছে। পরবর্তীকালে মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তার সূত্র ধরে, নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে, লেনিন ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রকৃতি, তার চালিকা শক্তি, তার প্রেক্ষিত প্রভৃতি বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। জাতি-সমস্যা সম্পর্কিত লেনিনের রচনাবলীতে, বিশেষ ক'রে, ঔপনিবেশিক বিপ্লব সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে রয়েছে—কমিউনিস্টরা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে নিজস্ব স্বাধীন রণনীতি অবলম্বন করবে এবং কিভাবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করবে—তার ইঙ্গিত।

লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই চিন্তার উপর যে পৃথিবীর দেশগুলি দুইভাগে বিভক্ত—কতকগুলি নির্যাতনকারী দেশ (সাম্রাজ্যবাদী দেশ, যেমন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি)—আর কতকগুলি নির্যাতিত দেশ (পরাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দেশ, যেমন, ভারত, চীন, পারস্য প্রভৃতি।[১] নির্যাতিত দেশগুলির সামনে প্রধান কাজ—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই কারণে এইসব দেশের বিপ্লব জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চরিত্র-বিশিষ্ট। লেনিনের নির্দেশ—এই সব দেশে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আপোষহীন, নিরলস যোদ্ধা হিসাবে পরিচয় দিতে হবে।

ঔপনিবেশিক থিসিসের আর একটি মূলকথা—বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত যে জাতীয় আন্দোলন ইতিমধ্যে রয়েছে—(যেমন ভারতে গান্ধী নেতৃত্বে, চীনে ডঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে, তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে) তার প্রতি কমিউনিস্টদের সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

লেনিন বললেন—এই সব দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অবশ্যই এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে।[২] এটা স্বাভাবিক যে এইসব

দেশে প্রথম দিকে বুর্জোয়াশ্রেণী জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবে।

লেনিনের বক্তব্য: সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে "শর্ত-সাপেক্ষ সমর্থন" জানাতে হবে। বুর্জোয়ারা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তখন কমিউনিস্টরা তাদের সেই সংগ্রামকে সমর্থন করবে, আবার যখন তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টা করবে তখন তারা সেই কাজের বিরোধিতা করবে। এইভাবে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করবে।

কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করার দুটি শর্তের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি: যখন এই আন্দোলন হবে সত্যিকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। দ্বিতীয়: যখন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করার অধিকার মেনে নেবে।

তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন—কমিউনিস্টরা নিজেদের স্বাধীন রাজনৈতিক ও আদর্শগত অবস্থানে দূর থেকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করবে, কিছুতেই, এমন কি ভ্রূণাবস্থাতেও, তার সঙ্গে মিশে যাবে না।

এখন আসল প্রশ্নে আসা যাক। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিস্টদের স্বাধীন অবস্থান বলতে কি বোঝায়?—এই প্রশ্নটির জবাবে লেনিন বলেছেন—জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে একটি সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ, অপরটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ।[৩] বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়ারা নেতা এবং শ্রমিক-কৃষক, যাদের তারা নিজেদের স্বার্থেই জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতে টেনে আনতে চায়, তারা হবে তাদের পতাকাবাহী। এই সংগ্রাম সংস্কারবাদের পথ ধরে চলে—কেননা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাপোষ—এই দ্বৈতচরিত্র তার বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা, চালিকা-শক্তি, পরিপ্রেক্ষিত—সবই আলাদা। এখানে শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রদূতের ভূমিকা

পালন করতে হবে। এর প্রধান চালিকা শক্তি হবে শ্রমিক ও কৃষক। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম তার বৈশিষ্ট্য, এটি সংস্কারমূলক আন্দোলন নয়, এটি হবে সত্যিকারের বৈপ্লবিক আন্দোলন। এই ধারা শুধু সাম্রাজ্যবাদের পুরোপুরি উচ্ছেদ চায় তাই নয়, কৃষকের শত্রু দেশীয় সামন্ততন্ত্রেরও পুরোপুরি অবলুপ্তি চায়। এই ধারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এক পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চিত্রটি তুলে ধরে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিস্টদের স্বাধীন অবস্থান বলতে কি বোঝায়—এই প্রশ্ন নিয়ে লেনিন ও এম. এন. রায়ের মধ্যে একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল।[৪] এম. এন. রায়ের ধারণা ছিল রুশ-বিপ্লবের পরে বিশ্বে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে—তাতে পরাধীন দেশ-গুলির পক্ষে আর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তারা এখনই সমাজ-বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আর কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা নেই। এই হিসাব অনুযায়ী তিনি ধরে নেন যে ভারতে গান্ধী নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনেরও আর কোনো মূল্য নেই। এই আন্দোলন পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল।

লেনিন এই মত খণ্ডন করে বললেন—পরাধীন দেশগুলি সমাজ বিপ্লবের স্তরে উপস্থিত—এই মত ঠিক নয়। এই দেশগুলি এখনও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্তরে রয়েছে। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম—তাতে বুর্জোয়ারাই নেতৃত্ব দিক, আর কৃষকরাই নেতৃত্ব দিক—এটি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ।

তাহলে বিপ্লবের স্তরটি যেহেতু গণতান্ত্রিক, সেইহেতু এটি সব দেশের কমিউনিস্টদের যতদিন না বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের কাজগুলি সমাধা হয় ততদিন কি অপেক্ষা করে থাকতে হবে ?

বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য—ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে থাকা—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষ, অর্থাৎ অর্ধ-সমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

লেনিন বললেন—এইসব দেশের সামনে ধনতন্ত্রের পথ একমাত্র ভবিতব্য নয়।

মহান রুশ বিপ্লবের জয়লাভের পরে এইসব দেশের সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সাহায্য থেকে এইসব দেশ ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ না করে অ-ধনতান্ত্রিক পথটি বেছে নিতে পারবে—যে পথ শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে—যে পথ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করবে। এটি হবে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব—যা সমাজতন্ত্রের অভিমুখে বিপ্লবের গতিকে পরিচালিত করবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলাভের আগেই ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রবল গণ-সমর্থন লাভ করে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টিকে জন্মের পরের দিন থেকে গান্ধী নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করবে তা স্থির করতে হল।

স্বীকার করতেই হবে—এই পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে পারে নি। তার কারণ এম. এন. রায়ের চিন্তাধারার প্রভাব (জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের শক্তি নয়) প্রথম যুগের নেতাদের উপর বেশ কিছুটা পড়েছিল। তার চেয়েও বড় কথা, কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৯) ঔপনিবেশিক থিসিসে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল।[৫] কমিউনিস্টরা সঠিকভাবে বলেছিল—জাতীয় আন্দোলনকে শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন, কিন্তু সংকীর্ণতাবাদী চিন্তার প্রভাবে ঠিকমত বিচার করতে পারে নি। এই সংকীর্ণতা দেখা দেয় কখনও স্থূল আকারে, কখনও বা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকারে।

স্থূল আকারে এই সংকীর্ণতা এসেছিল এম. এন. রায়ের চিন্তার জের হিসাবে। এম. এন. রায় ভারতীয় বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চরিত্রটি বুঝতে পারেন নি এবং একলাফে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর নেতা ও কর্মীর মধ্যে এই অতি-সরলীকরণের প্রবণতা বারে বারে দেখা দিয়েছিল। মুহুর্মুহু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, 'প্রলেতারিয়ান পাথ', 'টয়লার্স ফ্রন্ট', তিন শ্রেণীর মৈত্রী প্রভৃতি বাছা

বাছা বুলি এই যুগের এক শ্রেণীর নেতাদের মুখে প্রায়ই শোনা যেত। সম্প্রতি-কালে নকশালপন্থীরা এই মতেরই প্রতিধ্বনি করছেন।

তবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই ধরনের স্থূল সংকীর্ণতাবাদ ব্যাপক নয়। সব সময়ে এক মুষ্টিমেয় কর্মী ও নেতার মধ্যে এটি ছিল সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদ দেখা দিয়েছিল অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকারে। আমাদের দেশের বিপ্লব যে জাতীয় মুক্তির বিপ্লব চরিত্রের দিক থেকে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—সাধারণভাবে এটি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদও যে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরকার একটি ধারা-এটি বোঝার চেষ্টা করা হয় নি। বরং এই আন্দোলন ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বর্ষাফলকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন কালের দলিলগুলিতে এর স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। মীরাট মামলায় (১৯২৯) আসামীদের জবানবন্দী এক অতি প্রামাণ্য দলিল।[৬] এতে বিপ্লবের প্রকৃতি, চালিকাশক্তি, প্রেক্ষিত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে, এই দলিলে বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক চরিত্রটি ভালোভাবেই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিত্রিত করা হয়েছে।

এই দলিলে বলা হয়েছে—ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী। বুর্জোয়াদের এতে নেতৃত্ব দানের প্রশ্ন ওঠে না। এমন কি বিষয়গতভাবেও বুর্জোয়াদের পক্ষে কোনো রকমের বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এই ভ্রান্ত চিন্তা থেকে অগ্রসর হয়ে এই যুগের নেতারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলি যেমন অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন—এগুলি প্রতিক্রিয়াশীল। মন্তব্য করা হয়েছে—এই আন্দোলনগুলি শুরু হয়েছিল 'অ-বিপ্লবী চরিত্র' নিয়ে এবং সমাপ্তির সময়ে 'প্রতি বিপ্লবী চরিত্র' গ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনগুলি ছিল বিপ্লবকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র মাত্র।

আরও বলা হয়েছে—নেহেরু, সুভাষ প্রভৃতি 'তথাকথিত বামপন্থী নেতারা' যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করছেন তা একটি চতুর কৌশল ছাড়া কিছু নয়। তাঁদের উদ্যোগে গঠিত ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ একটি ভাঁওতা মাত্র।

এখানেই শেষ নয়। এতে আরও বলা হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ও এদেশীয় বুর্জোয়া এদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিশ্চয়ই বিরোধ আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে উভয়েই—শোষকশ্রেণী, তাই ক্রমে কাছাকাছি আসা ও শেষে আত্মসমর্পণ—এটাই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পরিণতি।

বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের মাঝখানে এমন একটি ধারা থাকতে পারে যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম—এই ধারণা এই দলিলে নেই। অথচ লেনিনের উপনিবেশিক থিসিসের এটি ছিল একটি প্রধান মূলসূত্র। ভারতে অ-সহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন অহিংস সত্যাগ্রহের পথে (সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম ও আপোষ) একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এই কথাটি এই দলিলের রচয়িতারা বুঝতে পারেন নি।

যেহেতু এই দলিলটির কখনও মূল্যায়ন করা হয় নি, যেহেতু এই সংকীর্ণতাবাদের শিকড়টি কখনও চিহ্নিত করা হয় নি, তাই পরবর্তী কালেও (কিছুটা পরিবর্তিত আকারে) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এই সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তারই দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরব।

পরবর্তীকালে এই মতেরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯৪৮) সিদ্ধান্তে। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ঐ কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল—এই আজাদী ঝুটা হ্যায়। যেহেতু ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের হাতে—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ এবং শেষে তার কাছে আত্মসমর্পণ যার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তাই এর মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না এই ঐ কংগ্রেসের অভিমত।

১৯৫১ সালে গৃহীত পার্টি কর্মসূচীতেও এই সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক খুবই স্পষ্ট। এই দলিলেও বলা হয়েছে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে নি। এটি একটি অর্ধ-উপনিবেশ, পর্দার আড়াল থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাই ভারত শাসন করছে। ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে যুদ্ধও শান্তির মধ্যে—কপট অভিনয় বলে চিত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই কপট অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নেহেরু সরকার বিশ্ব রাজনীতিতে সবচেয়ে আগ্রাসী শক্তিগুলির (আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি) স্বার্থ সুরক্ষিত করছে।

আবার লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিসের সারমর্ম উপেক্ষা করে উল্টো-দিকে এগিয়ে যাবার অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিরও নজির রয়েছে। পি. সি. যোশীর আমলে স্বাধীন শ্রেণী-অবস্থান বিসর্জন দিয়ে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের ভূমিকাটিকে অতি-বড় করে দেখার প্রবণতা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে জাতীয় ঐক্য গড়ার নীতি বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদকে সমর্থনের নামে জাতীয়তাবিরোধী, বিভেদপন্থী পাকিস্তানের দাবিটিও সমর্থন করা হয়েছিল। এই পর্বে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উপর এই নির্ভরশীলতা কমিউনিস্ট পার্টির ভাবমূর্তি অনেকটা বিনষ্ট করেছিল।

আগেই বলেছি, কমিন্টার্নের চিন্তায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সংকীর্ণতাবাদী ধারণা বিশেষভাবে দেখা দেয়। যুদ্ধ-পরবর্তীকালেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একান্ত সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা পোষণ করতে থাকে। এই চিন্তা মাথায় থাকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশে যে স্বাধীন জাতি-গঠনের প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয় (যার পুরোভাগে ছিলেন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা) তার গুরুত্বটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন অনুধাবন করতে পারে নি।

পরবর্তীকালে এই সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক বাড়িয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস প্রকৃত-পক্ষে এই দিকে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিসের সারমর্মটি সামনে রেখে কমিন্টার্নের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত সংকীর্ণ চিন্তার সমালোচনা-প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয়। আত্মসমালোচনার সুরে বলা হয়—আমাদের এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ আজও নিঃশেষিত হয় নি এবং ভারত, বার্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশ যে বুর্জোয়া নেতৃত্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে—এটি তারই স্পষ্ট প্রমাণ। ৮১ পার্টির দলিলে বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করে বলা হয়েছে—জাতীয় বুর্জোয়াদের সেই অংশ—যাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক নেই—দ্বৈতচরিত্র সত্ত্বেও তারা প্রগতিশীল। জাতীয়

বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিষয়গত বিরোধের প্রশ্নটি এই সম্মেলনে বিশেষ-ভাবে আলোচিত হয়।[৭]

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই পর্যালোচনা থেকেও যথোচিত শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে।

সি-পি-এম বিংশতি কংগ্রেসের চিন্তাকে সংশোধনবাদী বলে মনে করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ৮১ পার্টির দলিলের প্রধান প্রধান ধ্বনি—যেমন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, অ-ধনতান্ত্রিক পথ—প্রভৃতিকে সংশোধনবাদী বলে গ্রহণের অযোগ্য বলে মনে করেছে। তাদের কর্মসূচীতে জাতীয় আন্দোলনকে বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত বলে ধরে নিয়ে তার আপোষপন্থী সুবিধাবাদী চরিত্রটি চিহ্নিত করা হয়েছে।[৮] প্রকৃতপক্ষে, সি-পি-আই(এম) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কমিন্টার্ণের ষষ্ঠ কংগ্রেসের বক্তব্যটি আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পার্টি ভাগা-ভাগির পরে—১৯৬৭ সালে মীরাট মামলার বন্দীদের জবানবন্দী (যার সংকীর্ণতাবাদী চরিত্রটি আগেই আলোচনা করা হয়েছে) মুজফ্‌ফর আহমদের ভূমিকা সহ উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়।

অপরদিকে, সি. পি. আই বিংশতি কংগ্রেসকে স্বাগত জানিয়েছে এবং ৮১ পার্টির দলিলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। সেই হিসাবে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, অধনতান্ত্রিক পথের স্লোগানগুলি তার কর্মসূচীতে সংযোজিত করেছে। কিন্তু তারা তাদের কর্মসূচীতে বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্বটি জুড়ে দিয়েছে।[৯] এই তত্ত্বটির উল্লেখ ৮৯ পার্টির দলিলে নেই। এই তত্ত্ব লেনিনীয় চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক হাড়ি খাঁটি দুধে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়লে যা হয় তাই হয়েছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, অ-ধনতান্ত্রিক পথ প্রভৃতি সঠিক স্লোগানগুলি অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে—এগুলি তার বৈপ্লবিক মর্মবস্তুটি হারিয়েছে। কেননা বুর্জোয়া ও শ্রমিকের যৌথ নেতৃত্বে যা হবে তা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রকমফের, অ-ধনতান্ত্রিক পথ নয়, অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের পথ। বুর্জোয়া ও শ্রমিকের যৌথ নেতৃত্বে যা ঘটবে তা মোটেই বিপ্লব নয়, বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মতির ভিত্তিতে বড়জোর কিছুটা সংস্কার।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের ভূমিকাকে হয় ছোট

করে দেখা নয় বড় ক'রে দেখার প্রবণতা আজও কমিউনিস্ট আন্দোলনে বেশ প্রবল।

এখানে অবশ্য একটা কথা বলা দরকার। ১৯৪৭ সালের আগের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও পরের জাতীয়তাবাদ—এর মধ্যে একটা মস্তবড় পার্থক্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অবস্থানে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এখন শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত এবং দেশ গঠনের উপায় হিসাবে ধনতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে।

মনে রাখতে হবে, ১৯৪৭ সালের পরে আমরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় স্তরে (অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, আমূল ভূমি সংস্কার প্রভৃতি সম্পন্ন করা যে স্তরের কাজ) প্রবেশ করেছি। এই স্তরে সাম্রাজ্যবাদ মূলশত্রু হয়ে থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধনতন্ত্রের পথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই স্তরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ-গুলিকে সমাপ্ত করার ব্যাপারে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্ব দেওয়া দূরে থাকুক, এই স্তরে বিপ্লবের অন্যতম চালিকা শক্তিও হতে পারে না। আসল কথা জাতীয় বুর্জোয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করে এই স্তরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলিকে কিছুতেই সুসম্পন্ন করা যাবে না।[১০]

আবার এই পরিবর্তনকে অতিসরলীকৃত করে দেখলেও ভুল হবে। যেমন জাতীয় বুর্জোয়ারা যেহেতু ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণ করছে, যেহেতু তার সঙ্গে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা আছে, তাই তারা ক্রমে ক্রমে বিশ্ব ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য—এই হিসাব বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। বাস্তব ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণ করেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়। ভারত সরকার ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে ধরে থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার আন্তরিক চেষ্টা করছে, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার নীতি অনুসরণ করছে, জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছে, সাম্রাজ্যবাদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা ক'রে সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতিতে অটল রয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়া অনুসৃত এই পথে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি কখনও সম্পন্ন হবে না, কিন্তু কিছু সংস্কার এই পথ সাধন করতে পারে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের এই সংস্কারমূলক কাজগুলি এড়িয়ে গিয়ে তাকে

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শক্তি হিসাবে চিত্রিত করলে জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এগুলি কমিউনিস্টদের বাঁধা বুলি বলে প্রতিভাত হবে।

আবার সাম্রাজ্যবাদ মূলশত্রু এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়ারা সংগ্রাম করছে এই অছিলায় শ্রমিক-বুর্জোয়ার মৈত্রীর ভিত্তিতে জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার আওয়াজও হবে একান্ত ক্ষতিকর।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে না পারলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসূত্রটি কখনও ভালোভাবে গড়ে উঠবে না। বিশেষ বিশেষ সংকটজনক পরিস্থিতিতে জনসাধারণের সঙ্গে বিচ্ছেদ বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন সম্প্রতিকালে সি. পি. আই জরুরী অবস্থা সমর্থন করার ফলে সাময়িকভাবে তার স্বাধীন ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলেছিল। তেমনি আবার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের ভূমিকাটি ছোট করে দেখলে শুধু মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সমাজের ব্যাপক অংশ নয়, এমনকি শ্রমিক ও কৃষকের বিরাট অংশ থেকে বামপন্থী শক্তিগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ইন্দিরা হত্যার পরে—যখন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখা দিয়েছিল।

ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে তার সবলতা ও দুর্বলতা উভয় দিক সম্পর্কেই অবহিত থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে—ভারত সরকার রাশিয়ার জারতন্ত্র বা চীনের চিয়াংতন্ত্রের মত স্বৈরাচারী সরকার নয়। এই সরকারের একটি মোটামুটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র রয়েছে। একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এর চলাফেরা। বিশ্বে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলেছে তার সুযোগ নিয়ে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী সমাবেশকে নিজের কাজে লাগিয়ে, ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই সে এক নিজস্ব পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। কংগ্রেস আন্দোলনের একশো বছরের উত্তরাধিকার সে বহন করছে। শুধু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বড়, মাঝারি ও ছোট অংশ নয়, কৃষক সমাজের বিশাল অংশ, শ্রমিকদের ব্যাপক অংশ, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজের বেশ বড় অংশের উপর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি আদর্শগত প্রভাব (গ্রামসির ভাষায় যাকে বলা চলে hegemony) আজও বজায় রাখতে পেরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে অধিক

শক্তিশালী মনে করলেও ভুল হবে। হবে—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের শ্রেণী-ধর্মই হল জনসাধারণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজের উপরতলার অংশের (বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজির) সেবা করা। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, গরীবী প্রভৃতি এর অনিবার্য পরিণতি। বুর্জোয়া সরকারের নীতির মধ্যেই রয়েছে শ্রেণীসংগ্রামের উর্বর ক্ষেত্র। একদিকে জনগণের স্বার্থে শ্রেণীসংগ্রাম, অপরদিকে জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শগত প্রভাব থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম—এই উভয়বিধ সংগ্রাম একসঙ্গে চালাতে হবে। সোভিয়েতের স্বৈরাচারী ভারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল বা চীনে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী চিয়াং সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে পথের আবির্ভাব ঘটেছিল, ভারতের পথ হবে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ভারতকে অবিষ্কার করতে হবে তার নিজস্ব পথ।

সূত্র-নির্দেশ

১ Lenin—Draft of Theses in the National and Colonial Questions; Report of the Commission in the National and Colonial Questions; A Caricature of Marxism

২ Lenin—Address to the Congress of Communist Organisation of the East; Backward Europe and Advanced Asia, Theses in the National and Colonial Questions; Right of Nations to Self-determination.

৩ Right of Nations to Self-determination; Theses in the Colonial Question; Report of the Commission on the Colonial Questions;

৪ লেনিন-রায় বিতর্ক—মূল্যায়ন, ৫ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা,

৫ কমিন্টার্ন ও ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম—মূল্যায়ন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা।

৬ Communists Challenge Imperialism from the Dock—edited by Muzaffar Ahmed, National Book Agency, 1967—পৃ. ৮২-৮৮, ৯৮-১১৪

৭ অ-ধনতান্ত্রিক পথ ও ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা—মূল্যায়ন, ৭ম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা

৮ সি পি আই (এম) কর্মসূচী,—প্যারা ৮৫

৯ সি পি আই-এর কর্মসূচী, অষ্টম পরিচ্ছেদ; তার ব্যাখ্যা: Rajsekhar Reddy; What is CPI's Programme (1975)

১০ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা—মূল্যায়ন, বর্ষ ২২, সংখ্যা ১

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশতম সম্মেলনের আলোকে পেরেস্ট্রোইকা ও গ্লাসনস্ত

রণধীর দাশগুপ্ত

মিখাইল গরবাচভ তাঁর "পুনর্নির্মাণ এবং আমাদের দেশের তথা বিশ্বের জন্য নতুন চিন্তা" শীর্ষক পুস্তিকার (মস্কো, রাজনৈতিক সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮) ৪২-৪৮ পাতায় লিখেছেন :

"অক্টোবর বিপ্লবের ৭০ বছর পরে আমরা কেন একটা নতুন বিপ্লবের কথা বলছি ?"

"একটা ঐতিহাসিক তুলনার সাহায্য নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। লেনিন নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন যে চিরায়ত বুর্জোয়া বিপ্লবের দেশ ফ্রান্সে এই বিপ্লবকে তার সমাপ্তিতে পৌঁছানোর জন্য ১৭৮৯-১৭৯৪ সালের মহান বিপ্লবের পর (১৮৩০, ১৮৪৮ এবং ১৮৭১ সালের) আরও তিনটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। সেখানে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের ক্রমওয়েলীয় বিপ্লবের পর এসেছিল ১৬৮৮-১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের "গৌরবময় বিপ্লব", আর তারও পরে অনিবার্য হয়ে পড়েছিছল ১৮৩২ সালের সেই সংস্কার (রেফর্ম) যার মধ্য দিয়ে নতুন শ্রেণীটি বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা স্থায়ী রূপ পেয়েছিল। জার্মানীতে ঘটেছিল দুটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (১৮৪৮ সালে এবং ১৯১৮ সালে), আর তার মধ্যবর্তী ষাটের দশকের বিসমার্ক পরিচালিত "লৌহ ও রক্তের" পথে অর্জিত হয়েছিল নিদারুণ সংস্কার সমূহ।

লেনিন লেখেন : "ইতিহাসে এমন কোন বিপ্লব ঘটেনি, যে বিপ্লবে অর্জিত সাফল্যগুলিকে পকেটে রাখা যায় এবং সেই অর্জিত সাফল্য সমূহের মুকুট মাথায় পরে বিশ্রাম নেওয়া যায়" (লেনিন সমগ্র রচনাবলী, রুশ সংস্করণ, ৩৮তম খণ্ড, পৃঃ ৫২)। যে সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদের থেকেও বেশী গভীর সমাজতান্ত্রিক

এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে তাকে কেন একাধিক বৈপ্লবিক পর্যায় অতিক্রম করতে হবে না? তা না করে সে কি ভাবে নিজের সকল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করবে এবং নীতিগতভাবে নতুন একটি সমাজব্যবস্থা হিসেবে নিজ অন্তিম রূপ পরিগ্রহ করবে? লেনিন একাধিকবার এই মত ব্যক্ত করেন যে বহু প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করবে। এই প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্থে একপেশে হবে, এদের প্রত্যেকটিরই থাকবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং একথা সকল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বন্ধ্যাত্বের, এমন কি গুরুতর সামাজিক সংকটের উদ্ভবের বিরুদ্ধে কোন গ্যারাণ্টি নেই। আর এই প্রকার সংকট হতে অথবা সংকটপূর্ব পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ অনিবার্য। সমাজতন্ত্র এই প্রকার পদক্ষেপে সক্ষম কেননা তার প্রকৃতি স্থানু নয়, গতিশীল।

বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণের এই প্রক্রিয়ার একটা পর্যায় আমরা সম্প্রতি দেখলাম ২৮শে জুন থেকে ১লা জুলাই তারিখে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নেরর কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম নিখিল সোভিয়েত কনফারেন্স।

সোভিয়েত সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্নির্মাণের কাজ এ পর্যন্ত কিভাবে এগিয়েছে, সমালোচনামূলকভাবে তার পুনর্মূল্যায়ন করা এবং সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পার্টির মধ্যে উপযুক্ত মতাদর্শগত পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল এই কনফারেন্সের প্রধান লক্ষ্য।

১৯তম সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল পার্টির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে বিপ্লবী পুনর্গঠনকে কি করে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং পিছু হঠা রোধ করা যায়। কারণ পেরেস্ত্রোইকা বিষয়টা বাস্তব জীবন থেকে উদ্ভূত, পার্টি এবং জনগণের মধ্যে এটা আলোচিত হয়েছে। পার্টি এবং সোভিয়েত স্তরের এই নতুন বিকাশকে পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়। এখানে কেউ কেউ করেন যে পেরেস্ত্রোইকা, গ্লাসনস্ত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন অর্থাৎ সবই হল নেতিবাচক। এর মধ্যে তাঁরা ইতিবাচক কিছুই দেখতে পান না। তাঁরা মনে করেন যে রুশ বিপ্লবের ঐতিহ্য এবং সমাজতন্ত্রের সাফল্যই যে এই পরিবর্তনের

অগ্রসরমান ভিত্তি এটাকে অস্বীকার করে, তাকে ধ্বংস করে গরবাচভ সেই ধ্বংসস্তূপের উপর এক নতুন বিপ্লব সংগঠিত করছেন। তারা অনুভব করছেন না যে এতকাল মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একপেশেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং সেই মতাদর্শকে আরও সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন, এবং সমাজতন্ত্রে আরও গণতন্ত্র ও মানবিকতার উপাদানগুলি সংযোজন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হবার জন্য সোভিয়েত যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে কেউ কেউ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি বলে মনে করেন।

অথচ কনফারেন্সের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে জনসাধারণ সর্বত্র না হলেও ক্রমবর্ধমান হারে সচেতন ও উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া নতুন চিন্তাধারা, আবেগ ও উদ্যোগ, চেতনা ও নতুন কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করেছে। সবই যদি নেতিবাচকই হয়ে থাকে তা হলে এই ইতিবাচক উপাদানের উন্মেষ কি করে সম্ভব হতে পারে?

অর্থনৈতিক সংস্কার

অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নটিকে আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতেই বিচার করা হয়েছে। কোথাও লক্ষ্যপূরণ হয়েছে, কোথাও হয় নি, আবার কোন কোন কারখানায় প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে সরকারী কোটা পূরণ করা হয়েছে। ভোগ্যপণ্যের দর যে ভর্তুকী দিয়ে সস্তা রাখা হয়েছে জনগণের স্বার্থে অথচ তার উৎপাদন খরচ দরের বেশী তারও উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এটা অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত যন্ত্রপাতির যে এখনও সন্তোষজনক উন্নতি হয় নি তার জন্যও সম্মেলনে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের উদ্যোগকে বাড়ানো হয় এবং বিশেষ করে রুটির ক্ষেত্রে যাতে অপচয়ের মনোভাবকে দূরীভূত করা যায়।

সমাজের নৈতিক দক্ষতা ও বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় করার গুরুত্ব

সমাজের নৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি না করে ও বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট পরিমাণ

সক্রিয় না করে সমাজতন্ত্রের পুনর্নবীকরণ বা পেরেস্ট্রোইকাকে কার্যকরী করা অসম্ভব। কারণ সমাজের বুদ্ধিগত দক্ষতার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং সমগ্র সংস্কৃতি। এই বিরাট ক্ষেত্রে প্রচণ্ড কর্মযোগ প্রয়োজন এবং তার জন্য প্রয়োজন অর্থ বিনিয়োগও।

পেরেস্ট্রোইকার সূত্রপাত থেকে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনটা হল খোলামেলা আলোচনা, সৃষ্টিশীলতা ও আলোচনার স্বাধীনতা, বাস্তব ও পক্ষপাত নিরপেক্ষ গবেষণা এবং আলোচনা ও সমালোচনা। চিন্তার জগতে বিপ্লবী পরিবর্তন এবং অনেকদিনের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত না হলে নতুন চিন্তা সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব পেরেস্ট্রোইকা পার্টি বৈজ্ঞানিকদের অবদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিসে পার্টি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক ও কৃতকৌশলের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছে এবং সর্বোপরি মনে করেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্চমানের যন্ত্রপাতি যেমন মাইক্রো-ইলেক্ট্রনিকস, রোবোট, বাইওটেকনোলজি এবং পরি-সংখ্যানের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সাফল্যগুলি আয়ত্ত করাই হল মূল চাবিকাঠি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার ক্ষেত্রে অগ্রগতির শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মানও উন্নত হচ্ছে। পরিকল্পনায়, গবেষণায় সম্ভাব্য যাবতীয় সাহায্য করা হচ্ছে। যদিও অবস্থার গুণগত পরিবর্তন এখন হয় নি।

মৌলিক গবেষণার কাজে এখনও পরিস্থিতি জটিল। অতীতের অনেক বাধাবিপত্তি, উপর থেকে হুকুমজারি করার প্রথা এখনও রয়েছে। ফলে অনেক নতুন নতুন গবেষণা অঞ্চল এখনও সময়োচিত সাহায্য পাচ্ছে না, বিজ্ঞান ও তার বিকাশের নিজস্ব গতি অনুসরণ করতে পারছে না। বিজ্ঞানের বিকাশকে সাহায্য করার জন্য কোন সংগঠনিক সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞান এবং জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় ব্যাহত হচ্ছে। পেরেস্ট্রোইকার মূল কথা বিজ্ঞান এবং কর্মীর মৈত্রী—এই মূল সূত্রটি ব্যাহত হচ্ছে। প্রকল্পের পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনায় বিজ্ঞানীদের মতামত নেওয়া হয় না, এমন কি তাকে গ্রাহ্যও করা হয় নি। এর ফলে বিজ্ঞানের সামাজিক মর্যাদা গত কয়েক দশক যাবৎ নিম্নগামী। সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় হল যে বন্ধ্যাবস্থার ফলে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং উৎপাদনও ব্যাহত হয়। এই বিজ্ঞান নীতিতে শুধু ভুল সংশোধন করা যথেষ্ট

নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে সমস্ত বাধামুক্ত করতে হবে নতুবা গবেষণার কাজ গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে। এটা না হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্নবীকরণ বা পেরেস্ট্রোইকা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

বিকাশমান সামাজিক বিজ্ঞানের ওপর কনফারেন্স খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই সামাজিক বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশী প্রতিহত হয়েছে ব্যক্তিত্ব প্রাধান্যতা, আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা, মতান্ধতা এবং দক্ষতার চূড়ান্ত অভাব থেকেই। ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের পর বিজ্ঞানের নতুন ধারাকে গবেষক, সমাজবিজ্ঞানীদের মতান্ধতার শিকারে পরিণত হতে হয়। পেরেস্ট্রোইকার সমস্যাবলী অনুশীলন করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতন্ত্রীকরণ, মানবিক উন্মেষ, জাতি-উপজাতি সমস্যা এবং নতুন রাজনৈতিক চিন্তা। এককথায় বলতে গেলে সমাজকে নতুন বিকাশমান রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হতে হলে, জনগণের মনে নানাবিধ ধ্যানধারণাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি, ভিন্ন ভিন্ন বা বহুমতের সহনশীল বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করলে তবেই তার সমস্যাবলীর বৈজ্ঞানিক সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের প্রতি মতান্ধতার দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখলে রাষ্ট্র, উৎপাদনব্যবস্থা, এবং গোটা সমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে বাধ্য। সমস্ত রকম বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে উপনীত না হলে সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ অসম্ভব। মার্কসের কথা উল্লেখ করে বলা যায়—সকলে সাধ্যমত কাজ করবে, আর প্রয়োজনমত সামগ্রী নেবে। অতএব বিজ্ঞান শীর্ষস্থানে না পৌঁছুলে এই নীতি কার্যকর করা অসম্ভব। এই নীতির পিছনে যে বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা এবং স্বাধীন ও অবাধ বিকাশ নিহিত রয়েছে এটা কনফারেন্স থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। এত বড় ইতিবাচক দিকে আর কোন-কালে নজর দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজকে এগিয়ে নেবার জন্য সোভিয়েত সাংস্কৃতিক জগতের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারার উন্মোচন হয়েছে—যেমন স্পষ্টবাদিতা, সমাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে, অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করার স্বাধীনতা। এইভাবে বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে মানুষের

কর্মোদ্যোগ বাড়ে এবং সেকেলে মতান্ধ মতবাদের গণ্ডী ভেদ করতে সাহায্য করে। সামাজিক ও সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উর্ধে তুলে ধরাই হল লেনিনীয় নীতি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ

সোভিয়েত ইউনিয়নে পেরেস্ত্রোইকা হল আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন। কারণ সোভিয়েতের এই আভ্যন্তরীণ পলিসির দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বিচার করা হয়েছে।

যুদ্ধোত্তরকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মনোভাব এতটুকুও হ্রাস পায় নি। বরাবরের মত এখনও সামরিক হুমকী বজায় রয়েছে। তথাপি আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে "আমাদের হুকুমদারী প্রশাসনিক পদ্ধতি পররাষ্ট্র নীতির উপরও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে "আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করেছে।"

সোভিয়েত এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকীর বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমান সামরিক সমতা অর্জন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা যখন আয়ত্ত করা গেল, তখন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করা উচিত ছিল। কারণ সোভিয়েতের বিরাট শান্তি অভিযান, উত্তেজনা হ্রাসের আন্দোলন, জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধের পরিবর্তে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ সারা বিশ্বের মধ্যে একটা মৌলিক পরিবর্তন সুনিশ্চিত করেছে। এই পথ অনুসরণ না করার ফলে সোভিয়েতও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয়ে আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হল। এর ফলে দেশের সামাজিক ও আর্থিক বিকাশ ব্যাহত হল।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা এক সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হবার পর শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলন বিশ্বব্যাপী শুরু হল। নতুবা সামরিক মোকাবিলার বিপদ ছিল। তখনই সোভিয়েতের পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তন হয়ে এক নতুন মোড় নিল। এটা হল রাজনীতিগতভাবে নতুন চিন্তাধারা।

সমসাময়িক বিশ্বের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে গরবাচভ বলেছেন যে

"আমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করছি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে শ্রেণী-চরিত্র বজায় থাকলেও, এই সম্পর্কগুলি ক্রমবর্ধমান হারে জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কে পরিণত হচ্ছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিশ্বের ঘটনাবলীতে জনগণ, বিভিন্ন জাতি, উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও পারমাণবিক যুদ্ধরোধ ও নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে একই অবস্থান নিচ্ছে। নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে এটা একটা নতুন উপাদান।

পারমাণবিক বিপদ, অন্যান্য বিশ্ব-ঘটনাবলীর জটিলতা এবং বিশ্বের সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিকতা, নানা বিরোধ সত্ত্বেও পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থ এবং সমগ্র মানবতা এক সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বা হচ্ছে। আমাদের যুগে সাধারণ মানুষের মানবতাবোধ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এটা হল নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু। এই নতুন চিন্তাধারার ফলে আমরা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে উপলব্ধি এবং তার উপর নৈতিক মূল্যবোধ আরোপ করছি।"

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং পারমাণবিক যুদ্ধরোধ এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। বলা দরকার যে পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত এবং তার উদ্যোগ আমাদের পররাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে শান্তির উপর লাগামছাড়া গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না, সাম্রাজ্যবাদ ও তার চক্রান্তকে ছোট করে দেখা হচ্ছে না।

যুদ্ধের বিপদ কি পিছিয়ে গেছে? তার উত্তরে গরবাচভ বলেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

কারণ এখন বর্তমানে পারস্পরিক মোকাবিলার পরিবর্তে সহযোগিতা, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা, আলোচনা ইত্যাদি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কেরও উন্নতি হয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্রের একাংশ ধ্বংস করার জন্য চুক্তিও হয়েছে। আফগানিস্থান থেকে সৈন্য অপসারণ নিয়ে চুক্তি হয়েছে। এ সব খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।

কিন্তু বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিপদ দূর হয়েছে বলে মোহ থাকা উচিত নয়।

রাজনৈতিক সংস্কার কেন

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন হল পেরেস্ত্রোইকাকে যাতে অতীতের নানাবিধ বাধা-বিপত্তি প্রয়োগ করে ব্যাহত করতে না পারে। সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনকে গণতন্ত্রীকরণ, রাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে আরও কার্যকরী করা এবং জনগণের হাতে সমাজতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব অর্পণ করাই হল রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্য। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অতীতের সংকটের জন্য বহুলাংশে দায়ী, সেই ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রকে সংকুচিত করার দায়িত্ব পরিহার করতে পারে না। যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্টোবর বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুরুতর বিচ্যুতি ও বিকৃতি ঘটেছে। এর ফলে স্তালিনের "অতুলনীয় অবদান" থাকলেও দমননীতির বহুল প্রয়োগ হয়েছে, কমিউনিস্টদের জীবনহানি হয়েছে, বহুক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। উক্ত বছরগুলিতে প্রশাসনের হুকুমদারি ব্যবস্থা সমাজবিকাশের বিভিন্ন দিককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

২০তম পার্টি কংগ্রেস যে সম্ভবনাসমূহ সৃষ্টি করেছিল সেই সম্ভাবনাগুলিকেও পার্টিতে লেনিনবাদী নীতি অনুসারে কার্যকরী করা হয় নি। কারণ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে লঘু করে দেখা হয়েছিল। এর ফলে ক্ষমতা সোভিয়েত ও জনসংস্থার হাতে বিকেন্দ্রিত না হয়ে সরকারের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে ব্যক্তিত্ববাদের পরিস্থিতি আরও শক্তিমান হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতা বনাম ব্যক্তিত্ববাদের যে নতুন সংঘাতের জন্ম হল তা সোভিয়েত সমাজের বহুল পরিমাণ অগ্রগতিকে ব্যাহত করে একটা সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টির উপক্রম করেছিল। ১৯তম কনফারেন্সের পূর্ববর্তী যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বন্ধ্যাবস্থাকে শক্তিশালী করে যাবতীয় সংস্কারকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বন্ধ্যাবস্থাকালে অনেক রিপাবলিকে পরিচালন ব্যবস্থা গণতন্ত্র লঙ্ঘন করে হুকুমের মাধ্যমে কাজ চালাতে থাকে। ফলে সর্বত্র আমলাতন্ত্র ও তার আনুসঙ্গিক ত্রুটিগুলি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে আঘাত করতে থাকে ও জনসাধারণকে উদ্যোগহীন করে তোলে। মানুষের মধ্যে, সোভিয়েতের কর্তৃত্ব না বেড়ে সরকারী কর্তৃত্বই প্রধান স্থান গ্রহণ করে। রাষ্ট্রকে মানুষ ভয়ের চোখে দেখতে থাকে।

লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে যা বলেছেন, গরবাচভ তাঁর রিপোর্টে তা উল্লেখ করেছেন। গরবাচভ বলেছেন—"Let us recall Lenin's well-known defination of the socialist state as one" which is no longer a state in the proper sense of the term" or even a "half-state" which gradually develops into Social Self-Govt.

কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্র সম্পর্কে এই তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা কর্মক্ষেত্রে বিকৃত হয় বা বর্জিত হয়। রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। পরিচালনায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে, গণসংস্থায় জনগণের উদ্যোগকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়, আমলাতন্ত্রের আধিপত্য সর্বব্যাপক হয়, চিন্তার স্বচ্ছতা দূষিত হয়, আইনের নিরপেক্ষতা ও পবিত্রতা নষ্ট হয়, আলোচনা সমালোচনার কণ্ঠরোধ করা হয়, সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা ক্ষুণ্ণ হয় এবং গণতান্ত্রিক বিকাশ এক বদ্ধজলায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এর জন্য সোভিয়েত সমাজকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। বহু শ্রমিক রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় কলকারখানাকে নিজেদের সম্পত্তি মনে না করে বেতন পাবার একটা হাতিয়ার বলে মনে করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন কারখানার দায়দায়িত্ব, আধুনিকীকরণ করার দায়িত্ব সরকারের, আর আমার দায়িত্ব মাসিক আয়ের জন্য কেবল মেসিনের চাকা ঘোরানোর। তাতে উৎপাদনের মানের অবনতি হলে তার জন্য সরকারকেই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন মানে সমাজতন্ত্রের দক্ষতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি, এই গর্ববোধ আমলাতন্ত্রের চাকায় পিষ্ট হতে থাকল।

রাষ্ট্র সম্পর্কে উপরিউক্ত লেনিনের বক্তব্য খুবই প্রণিধান যোগ্য এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রকে ক্রম বিলুপ্তির পথে যেতে হলে তাকে আরও বেশী গণতান্ত্রিক হতে হবে অর্থাৎ জনগণ ও সোভিয়েতের উপর আরও অনেক ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। এতে গণ উদ্যোগের স্ফুরণ হয়। লেনিন "On workers' and peasants inspection" নামক প্রবন্ধে একই কথা বারবার বলেছেন। এইভাবে সমাজজীবনের ওপর। উৎপাদন থেকে বণ্টন পর্যন্ত সর্ববিষয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। এইভাবেই গণচিন্তার আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কাজ যা মানুষের চিন্তাশক্তিকে এক বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রাখা ছিল। গণতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্রের ক্রমবিলোপের পদ্ধতি এই লেনিনবাদী ধারণা,

উল্টে গিয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করল। মনে হয় রাষ্ট্র ও তার ধ্যানধারনার বিকৃতি ও বিচ্যুতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল ব্যক্তিবাদের তত্ত্ব। বিতর্কমূলক হলেও এটাকে ভেবে দেখা উচিত।

এই কনফারেন্সে কতকগুলি মৌলিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১) দেশ শাসনের প্রতিটি কাজে, (কথায় নয়), সাধারণ মানুষকে জড়িত করতে হবে এর তাদের উপর দায়িত্ব দিতে হবে।

২) নাগরিক উদ্যোগ বৃদ্ধির জন্য সমস্ত সুযোগ দিতে হবে, স্ব-পরিচালিত ও স্ব-শাসিত সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী প্রতিনিধি, জনগণের প্রতিষ্ঠান ও পার্টিসহ সমষ্টিগত কাজের ধারা প্রবর্তন করতে হবে।

৩) প্রয়োজন অনুসারে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে, সকল শ্রেণীর স্বার্থে ক্ষুণ্ণ না করে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৪) আন্তর্জাতিকতাবাদ, সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের ভিত্তিতে জাতি-অধিজাতির আরও উন্নয়নশীল বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে হবে।

৫) সমাজতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন শৃঙ্খলাকে দ্রুত শক্তিশালী করতে হবে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না ঘটে, নাগরিকদের আইনগত অধিকার ও স্বাধীনতা বজায় থাকে। এবং যাতে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব নাগরিকেরা পালন করেন।

৬) সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এক নয় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার পার্টিও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও লেনিনীয় নীতি অনুসারে উভয়ের কাজের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৭) আভ্যন্তরীণ ও বাইরের পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দ্রুত প্রয়োগ করতে হবে। তবেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও স্ব-শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্য হচ্ছে এবং তার প্রয়োগের মাপকাঠি হল মানব অধিকারকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করা এবং জনগণকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের

কাজে আরও উদ্দীপিত করা। এটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের-তত্ত্বের মূল কথা, অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেওয়া এবং পেরেস্ট্রোইকা ও গ্লাসনস্তকে সফল করে তোলা। মনে রাখা দরকার যে মানবাধিকার হল সমাজতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কমিউনিস্ট পার্টির গণতন্ত্রীকরণ এবং আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ

পেরেস্ট্রোইকাকে কার্যকর করার থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অবস্থানকে এই বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকাকে, বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পেরেস্ট্রোইকা গ্লাসনস্তকে সামনে ঠেলে দিয়েছে। গ্লাসনস্তের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হচ্ছে—সরকারের কাজে ও সংগঠনে, পাবলিক সংস্থায়, সভা সমিতিতে, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য সম্মেলনে এবং জনসাধারণের সভায়। পার্টি, পেরেস্ট্রোইকা এবং গ্লাসনস্তকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কমিউনিস্ট পার্টি হল সাধারণ মানুষের আশা ভরসা।

যে নেতিবাচক ঘটনাবলী সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং এখনও যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে এবং যা এখনও সর্বত্র বিলুপ্ত হয় নি—তার প্রতিফলন পার্টিতেও ঘটেছে। ২৭তম পার্টি কংগ্রেসে এই নেতিবাচক দিকগুলির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ অনেক নেতা, পার্টি-সদস্য, এমন কি পার্টি সংস্থার মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানের ও কর্মের অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। রাজনৈতিক ও নৈতিক অধঃপতনের ফলে পার্টির সঙ্গে জনসংযোগ দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

এই সব ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র থেকে আমলাতন্ত্র কত ক্ষমতাশালী হয়ে পার্টি পরিচালনা করছিল। হুকুমদারির মাধ্যমে পার্টি পরিচালনা, পার্টি সদস্যদের মধ্যে সমসম্পর্কের অবনতি, কমিউনিস্টদের মধ্যে সমসম্পর্কের অবনতি, পার্টি প্রধান ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অগণতান্ত্রিক বিভাজন ইত্যাদি প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই অবস্থাকে সহ্য করা উচিত নয়। সকলে এটা স্বীকার করলেও এখন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি যদিও এই পরিবর্তনের সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে।

এই কারণে পার্টির নীতি, খোলামেলা আলোচনা, আত্মসমালোচনার ও

শৃঙ্খলার প্রতি বিশ্বস্ততা, নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং দক্ষতার প্রতি আনুগত্য ও অনুরাগ সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পার্টি সংগঠনগুলি এদিকেই পরিচালিত হচ্ছে। এই কনফারেন্সের কাজ হল এই প্রক্রিয়াকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা। কর্মস্থানে যেমন নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে, তেমনই সমষ্টিগত-ভাবে পেরেস্ট্রোইকাকে কার্যকরী করতে হবে। কর্মীদের কাজের মাধ্যমেই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পার্টির সদস্য সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রকার 'কোটা' ব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্জন করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা হয়। যারা পার্টির উচ্চ সংস্থায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের কর্মকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে আমলাতন্ত্রের অনুকূলে আর কোন সুযোগ না ঘটে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে পার্টির কাজকে রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে আলাদা করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টিকে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কাজ করবে। সরকারী নির্দেশ মত বা কোন অর্থনৈতিক সংস্থার নির্দেশে পার্টি কমিটিগুলি কাজ করতে বাধ্য থাকবে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে সমাজতন্ত্রের মধ্যে আরও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি, জনসাধারণের উন্নততর জীবন এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের স্ফুরণের সিদ্ধান্ত কনফারেন্সের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এটাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য সম্মেলনের। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য দরকার গণতন্ত্রীকরণ, প্রশাসনত্ব, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। এটাই হল অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্যবাহী নতুন ধরনের বিপ্লব, পেরেস্ট্রোইকা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের নতুন ভাবমূর্তি। উদ্যোগবিহীন সমাজতন্ত্র হয় না, সমাজতন্ত্রই হল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। এটাই হল এগিয়ে যাবার সবচেয়ে বড় শর্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যপ্রণালী, পার্টি ও সরকারের পৃথকীকরণ ও কাজের ধরন, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়েছে। কোথাও অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। সাম্যবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে অতীতের সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তগুলি হল বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করার প্রয়াস থেকে একেবারে অবিচ্ছিন্ন।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন

গরবাচভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উপনিবেশবাদ ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ় ঐক্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ছাড়া তিনি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই বলেন নি। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে সমস্যাবলী কি, তার সমাধান কোন পথে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতবিরোধ নিরসনের উপায় কি?, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে অ-মার্কসীয় মতবাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভাব ও ইতিহাস বিকৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ঐক্যের স্বার্থে কোন পথনির্দেশ তাঁর রিপোর্টে পাওয়া যায় না। অথচ সমাজতন্ত্র নির্মাণের এই আন্তর্জাতিক শক্তিকে সংহত না করলে বিশ্বের পরিবর্তন করা কি করে সম্ভব? বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিও বটে।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনের আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বারবার গুরুতর ভুল হচ্ছে কেন? স্তালিনের personality cult কি এই সমগ্র ভুলের উৎস? বিপ্লবে পরীক্ষিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সময়মত এ সব ভুল সংশোধন না করে তার শিকারে পরিণত হচ্ছেই বা কেন? কেবল personality cult দিয়েই কি ঐতিহাসিক কারণসমূহের মূল সূত্র বের করা সম্ভব? অথবা বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্র সম্পর্কে লেনিনের ধারণা ও তত্ত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও রূপ কি হবে এসব সম্পর্কে বিচ্যুতি কি এর একটা মূল কারণ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য গবেষণা করতে হবে প্রধানতঃ সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টিকে। সোভিয়েত সমাজে গণতন্ত্র লঙ্ঘন যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং তার পরিণাম যে কিরূপ বিষময় হয়ে উঠতে পারে তার প্রচুর প্রমাণ আজ আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে।

আমরা আশা রাখি, ঊনবিংশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি এই বিষময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বুখারিনের পুনর্বাসন সম্পর্কে

রণজু ঘোষ

[বুখারিন অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে লেনিনের সহকর্মী ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্তালিন সঠিকভাবেই তাঁর কিছু ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু বিচারকালে তাঁকে সাম্রাজ্যবাদের চর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং সেই অভিযোগে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বর্তমানে তাঁর এই মাত্রায় পুনর্বাসন হচ্ছে যে তিনি সাম্রাজ্যবাদের চর ছিলেন এই অভিযোগ মিথ্যা। অবশ্য, তাঁর ভ্রান্ত মতামতের সমালোচনা বহাল থাকছে। ঘটনাটি চাঞ্চল্যকর। এই বিষয়ে সোভিয়েতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার সারমর্ম 'মূল্যায়ন'-এর পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। —সম্পাদক]

সোভিয়েত বিপ্লবের প্রথম সারির নেতাদের একজন নিকোলাই বুখারিন (১৮৮৮-১৯৩৮) ১৯০৭ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অর্থ-শাস্ত্র শাখায় ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু মস্কো পার্টি কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করায় দেড় বছর পর তাঁর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে চার বছরের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় আরো তিনবার, পাঠানো হয় নির্বাসনে এবং সেখান থেকে পালিয়ে চলে যান বিদেশে।

নিকোলাই বুখারিনের ছয় বছর প্রবাস জীবন নিয়ে চমৎকার একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী হতে পারে। অস্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করে সামরিক জেলখানায় পোরেন, পরে ব্রিটেনে গেলে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুইডেনে তিনি আরো একবার গ্রেপ্তার হন তাঁকে নির্বাসিত করা হয় নরওয়েতে। সেখান থেকে নিকোলাই গোপনে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

নিকোলাই বুখারিন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টিতে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ১৯০৬ সালে, আর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর—যে বিপ্লব জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রাভদার সম্পাদনা করেছেন এবং

পার্টিও সরকারের অন্যান্য বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে একাধিক পুস্তক রচনা করেছেন।

বুখারিন সম্পর্কে লেনিন

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে লেনিন যখন খুব অসুস্থ তখন তাঁর রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্রের বয়ান মুখে বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর আদর্শকে, যেসব সহযোদ্ধা কমরেডদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাঁদের সকলের চারিত্রিক বিশেষত্বগুলিই এই দলিলে যথাযোগ্য স্থান পায়, তাঁদের মধ্যে বুখারিনও ছিলেন। লেনিন তাঁর সম্পর্কে বললেন "বুখারিন পার্টির একজন অত্যন্ত মূল্যবান কমরেড ও বড় তাত্ত্বিকই শুধু নন, সঙ্গতভাবে তাঁকে সমগ্র পার্টির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু যথেষ্ট সতর্কভাবে বিচার করে তবে তাঁর তাত্ত্বিক মতগুলিকে পুরোপুরি মার্কসবাদসম্মত বলে গণ্য করা যেতে পারে, কেননা তাঁর মধ্যে কিছুটা পণ্ডিতসুলভ মনোভাবের ব্যাপার আছে (তিনি কোনদিনই ডায়লেকটিস্ পড়েন নি, আর আমার মনে হয় কোনদিন তা পুরোপুরি বোঝেন নি) লেনিন তখন মৃত্যুশয্যায়। দ্রুতলিখনের জন্য কথা বলতেই তাঁর শ্রান্ত মস্তিষ্কে তিনি প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব বিচার করছিলেন। ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটতে না দিয়ে ইচ্ছাপত্রটি কাজের কথা এবং পার্টি নেতাদের রাজনৈতিক মূল্যায়নের মধ্যে সীমিত রাখাটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও বুখারিনের জন্য চয়ন করেছেন আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী শব্দগুচ্ছ—

"আমাদের বিপ্লবের দেওয়া
সোনার টুকরো ছেলে।"

লেনিন সম্পর্কে বুখারিন

লেনিনের মৃত্যুর পঞ্চবার্ষিকী স্মরণসভায় বুখারিন যে থিসিস পেশ করেছিলেন তার মূল কথা ছিল—

১) সমাজতন্ত্র কোন পথে নির্মাণ করা হবে, তার রণনীতি ও রণকৌশল কি হবে, দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যবাদকে কিভাবে মোকাবিলা করা যাবে।

বুখারিন তাঁর থিসিসে বলেছেন লেনিনের অক্টোবর বিপ্লব ইতিহাসের একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এই বিপ্লব ছিল এক প্রারম্ভিক ও দুঃসাহসিক

বিপ্লব। লেনিন এই বিপ্লবের মধ্যে এক সামগ্রিক সম্ভাবনা দেখেছিলেন। রুশ দেশে বিপ্লবের অনুকূল যে বিশেষ অবস্থা ছিল তা হল (১) বিশ্বযুদ্ধ (২) পরাধীন দেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিরাট আলোড়ন, (৩) দেশের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী শ্রেণীগুলির সমন্বয়—যাকে মার্কস বলেছিলেন কৃষি বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অনুকূল সমন্বয়। রুশ বিপ্লবের এটাই ছিল ভিত্তি। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকেরা ক্ষমতা দখল করার পর নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। তার সঙ্গে সোভিয়েত ব্যবস্থা মিলে অন্যান্য দেশগুলির অপেক্ষা সোভিয়েত এগিয়ে গেল। লেনিনের এই ধারণা ও তত্ত্ব ছিল বিপ্লবের চাবিকাঠি। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে এবং একে যে কোন উপায়ে রক্ষা করতে হবে নতুবা এর ব্যর্থতা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করে সমাজতন্ত্রের সাফল্যকে ব্যর্থ করে দেবে। লেনিনের এই বক্তব্যই ছিল বুখারিনের থিসিসের মূল বিষয়বস্তু।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন

লেনিন আন্তর্জাতিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে বলেন: (১) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে বিরোধ; প্রথম প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি জার্মানীকে পদানত করে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু মার্কিন সাহায্যে জার্মানী আবার দাঁড়াতে পেরেছিল; (২) অপরদিকে বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের সাফল্যের উপর নির্ভর করে দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে কিঞ্চিৎ সুবিধাদানের পথ গ্রহণ করে শ্রেণী সমন্বয়ের পথ অনুসরণ করতে থাকল; (৩) প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত-চীন ইত্যাদি দেশে বিপ্লবী আন্দোলন রুদ্ধ করার জন্য চক্রান্ত চালাতে থাকে; (৪) একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ বাড়তে থাকে আবার অন্যদিকে প্রাচ্যের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের বিরোধও বাড়তে থাকে; (৫) সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধ তীব্র হতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের এই বিশ্লেষণ সত্যে পরিণত হয়েছিল। লেনিন প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছিলেন। ইতিহাস লেনিনের এই বাণীকে সত্যে পরিণত করেছে।

রণনীতি ও রণকৌশলের ভিত্তি

বুখারিন তাঁর থিসিসে উল্লেখ করে বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক আক্রমণই হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাবিপদ। সুতরাং এই বিপদকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যও আমাদের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে না পারলেও প্রভূত ক্ষতি করেছে। লেনিন বলেন আমাদের জয়ের ভিত্তি হল বিরাট জনগণ। সোভিয়েত, চীন ও ভারতের বিপুল জনসাধারণ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আমাদের এমন রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে যেখানে কৃষকের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

লেনিন সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য কৃষকদের প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে গ্রামে পাঠিয়ে কৃষকসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কারণ এটা ছিল সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য অপরিহার্য।

লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের গভীরে প্রবেশ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এর মূল শক্তি যে সামনের সারির শ্রমিক তাদের বিশেষভাবে সংগঠিত করার প্রতি সমস্ত কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথমেই সামনের সারির শ্রমিক দ্বিতীয়ত দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এভাবেই সমস্ত কাজে শ্রমিক-কৃষকের তদারকীকে সংগঠিত করার জন্য লেনিন উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের দক্ষতা বাড়বে, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যও পার্টির ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে।

বুখারিন তাঁর থিসিসে বলেন যে উপরোক্ত সবই হল লেনিনের নির্দেশ। লেনিনের নেতৃত্বের উপর বুখারিনের আস্থা কত প্রগাঢ় ছিল এর থেকেই বোঝা যায়।

বুখারিন ও স্তালিন

সংক্ষেপে বলতে গেলে যোসেফ স্তালিনের নেতৃত্বে পার্টির একাংশ নেতারা মতাদর্শগত সংগ্রামে লেনিনবাদকে রক্ষা করেছিলেন। ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে স্তালিনের মতাদর্শগত সংগ্রামকে বুখারিন সহ পার্টি সমর্থন করেছিলেন। সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রাথমিক কৌশল ও পদ্ধতি তার সাফল্যকে রক্ষা করার

জন্য স্তালিনের অবদান অতুলনীয়। ১৯২০ সালের শেষের দিকে সমাজতন্ত্র নির্মাণে কৃষকের ভূমিকা নিয়ে পার্টির মধ্যে তীব্র সংগ্রাম শুরু হয়। ঐ সময় দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুতগতিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন স্তালিন অনুভব করেন এবং তাকে কাজে প্রয়োগ করেন। কিন্তু বুখারিন এবং তাঁর অনুগামীরা দ্রুতগতিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের গুরুত্বকে অবহেলা করেন এবং বিরোধিতা করেন। এটাই ছিল বুখারিনের ও তার অনুগামীদের সংকীর্ণ ও মতান্ধতাগত দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত।

অবশ্য একদিকে স্তালিনের অতুলনীয় অবদানকে যেমন অস্বীকার করা ভুল তেমনি তাঁর গণতন্ত্র লঙ্ঘন করার ঘটনাবলীকেও অস্বীকার করা ভুল। এই প্রসঙ্গে কমরেড গরবাচভ স্তালিনের অবদান সম্পর্কে বলেছেন "**Incontestable Contribution**". সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্তালিনের রাজনৈতিক ভ্রান্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দমনমূলক ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিত্ববাদ সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। (**Gorbachev :October and Parestraika : the Revolution Continues. p. 20,26.**) তাই বুখারিনের এই ভ্রান্তিকে সংশোধন করার সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আদালতের বিচারে বুখারিনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

বুখারিনের স্ত্রীর স্মৃতিচারণা

বুখারিনের স্ত্রী আন্না লারিনার স্মৃতিচারণা থেকে পাওয়া যায়—বুখারিন ছিলেন হাসি-খুসী ও দুষ্টু স্বভাবের এই মানুষটি ভালবাসতেন প্রকৃতিকে, গাছ-পালা ও পাখীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন বিশারদ। তাঁর অনুরাগের বিষয় ছিল শিল্পকলা।

বুখারিনের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজনীতি ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে ছোটখাট ব্যাপারেও তিনি হার মেনে নিতেন। একবার সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যে ক্ষুব্ধ কবিদের কাছে তিনি মার্জনা চেয়ে নেন। কবিতা রচনার শিল্প-নৈপুণ্য উন্নতি করতে বলার অধিকার তার পুরো মাত্রাতেই ছিল এবং তিনি তা করার কথা বলেছিলেন সম্পূর্ণ সৎ অভিপ্রায় নিয়েই।

তাই তাঁর ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না—কিন্তু তবুও তিনি চেয়েছিলেন।

বুখারিনের বিরুদ্ধে যখন পর্বতপ্রমাণ মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় তার প্রতিবাদে তিনি অনশন ধর্মঘট করেছিলেন, এই প্রতিবাদ থেকে পিছু হটে তিনি স্তালিনের পরামর্শে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৩৭ সালে পূর্ণাঙ্গ সভায় অনশন ধর্মঘটের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। মার্জিত রুচি ও আবেগ প্রবণ বুখারিনের আচরণ কোনও কোনও সময় হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত হত। লেনিনের মৃত্যুর সময় অনেক কমরেডের চোখে জল ছিল কিন্তু বুখারিন কেঁদেছিলেন মেয়েদের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ভাবাবেগ তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিয়েছিল। তাঁর আবেগ ছিল বেশি মাত্রায়, আর মেজাজ ছিল লাগাম ছাড়া। কায়মনোবাক্যে একজন বিপ্লবী হিসাবে তার সংগ্রামের সংকল্প সবসময়ই চাইত বাস্তবে ব্যক্ত হতে। মানবতাবাদী সামাজিক রূপান্তরের ভাবনায় তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। মানুষের স্বভাবের আমূল সংস্কার ছাড়া সত্যিকারের বিপ্লবের কথা চিন্তাই করা যায় না বলে তিনি ভাবতেন। তিনি বলতেন, পুরোনো সমাজে যাদের নিচু শ্রেণীর বলা হয় তারা, শ্রমিক ও কৃষকরা সংস্কৃতির উঁচু সোপানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা সম্পন্ন করা যাবে না। এই তীব্র ও অম্লান আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নই তাঁকে পরিচালিত করেছে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে। জীবনকে তিনি নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন কারণ জীবনকে তিনি ভালবাসতেন।

১৯৩৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী সেই ভয়ঙ্কর দিনটিতে স্তালিনের সেক্রেটারী পস্‌ক্রেবিশেভ বুখারিনকে টেলিফোনে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় ডেকে পাঠালেন। বুখারিন জানতেন এটাই তার পরিবারের সঙ্গে শেষ দেখা। সেই ভয়ঙ্কর সময়েও তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের পুত্র সন্তানকে যেন বলশেভিক করে তোলেন। আর বলেছিলেন তিনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে। "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পার্টি নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি"-র, তাঁর ইচ্ছাপত্রের প্রতিটি কথা মুখস্ত করে রাখার জন্য বললেন। আন্না লারিনা তা করেছিলেন। বুখারিন জানতেন তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে কিন্তু ভবিষ্যতের প্রজন্মতো জানবে যে তিনি নির্দোষ ছিলেন এবং মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টিতে স্বস্থানে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি চান নি।

বুখারিন সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির সিদ্ধান্ত

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরে শেষ পর্যন্ত বুখারিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ সভায় বুখারিনের বিরুদ্ধে অভিযোগটি (সাম্রাজ্যবাদের চর ইত্যাদি) পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং কোন প্রমাণ না থাকায় পূর্ণাঙ্গ সভা সর্বসম্মতভাবে বুখারিনের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা বাতিল করে দিয়েছে।

এটি একটি ন্যায়সঙ্গত কাজ। সোভিয়েত সমাজে ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত করার ও গণতন্ত্র সম্প্রসারণের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তও বটে।

মধ্যশ্রেণী-বুদ্ধিজীবীর দায় ২

দাশু রায়

স্বর্গচ্যুত মধ্যশ্রেণী যদি বুঝতে না চায় যে শ্রেণীচ্যুতি ছাড়া তার কোন পথ নেই তাহলে অসহায় আত্মহনন ছাড়া কোন পথ তার থাকে না। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা একের পর এক ঘটনায় ধ্বসে গেল মধ্যশ্রেণীর সাধের স্বর্গ। পরিবর্তে সাতচল্লিশ (স্বাধীনতা)-উত্তর মধ্যশ্রেণী আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল সাম্যবাদী সংগঠন ও আন্দোলনের রোমাঞ্চকে। শ্রেণী-দুর্বলতা তথা অসামর্থেই সেখানে মুক্তি মেলেনি। সুতরাং অবনমন হল অনিবার্য। চাকুরীর ক্ষেত্র সংকুচিত, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনাস্থা, কৃষি ব্যবস্থায় দুঃসহ সংকট, বিশ্বাসে ভাঙন, সম্পর্কের ভাঙন তৈরী হল এক ভয়ঙ্কর অসহায়তা। এই রূঢ়তার সামনে দাঁড়াতে মধ্যশ্রেণীর দ্বিধা ও ভয়। ভেঙে যাওয়া কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়ার প্রয়াস। নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত জীবন থেকে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি সে নিতে পারে না নিতে চায় না যতক্ষণ পারে মুখোশ টানতে চায় মুখের উপর। নিজের চেতনায় আয়নায় নিজের মুখ দেখতে ভারি ভয়। ভীড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে অন্যের ঘর্মাক্ত সংযোগের মধ্যে আত্ম-বিলুপ্তিতে এঁদের পরম সুখ। তারপর নানা কারণে সমাজে যখন ভাঙন ধরে তখন অবস্থা বড় অসহায় বড় করুন। কারণ এই মধ্যশ্রেণী আসলে পরতান্ত্রিক। নিজেদের মুক্তি, বিবেক ও রুচির উপর নির্ভর করতে না শেখার ফলে ভাঙনের মুখে এঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইতিহাসের উল্টোদিকে চলার এই ঝোঁক কেবলমাত্র গল্প শুনতে চাওয়া পাঠককেই প্রতারিত করতে পারে। আমরা স্বশ্রেণীর ভূমিকার প্রতি ততটা নিষ্ঠুর হতে চাই না—পারি না।

একদা যে উচ্চ-আশার কৈলাসে মধ্যশ্রেণীর অবস্থান ছিল সময়ের চাপ, অর্থনৈতিক টান তাকে টেনে নামিয়েছে সেখান থেকে। সে পতনকে সে স্বীকার করতে চায় না। তৈরী করা 'মিথ্যা' যদিবা ভেঙে যায় তবু তাকে মেনে নিতে এই অনিচ্ছা। নিজেদের মিথ্যা গৌরব আর অহঙ্কার ঠেকিয়ে

রাখার প্রাণান্তকর প্রয়াস মধ্যশ্রেণীর শ্রেণী-দুর্বলতার প্রকাশ তার কুৎসিৎ চেহারাকেই নগ্ন করে দেখায়। মধ্যশ্রেণীর এই গণ্ডি ভেঙে বেরোনোর ঘটনা বিরল নয় কিন্তু তা ব্যক্তির বিদ্রোহ সেটা প্রতিবাদ নয় ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত। উনিশ শতকী সীমাবদ্ধ রেনেসাঁসের ব্যর্থ ও ম্লান পরিণতির উত্তরাধিকার দীর্ঘকাল বহন করে চলেছে বিশেষ করে এই মধ্যশ্রেণী। অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া বিকাশের ধাক্কা বারে বারেই এই মধ্যশ্রেণীর জীবনকে করেছে খণ্ডিত ও লাঞ্ছিত। ইতিহাসে সামাজিক বিদ্রোহ কখনও তৈরী হয়েছে কিন্তু ব্যক্তির বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত পথ হারিয়েছে। মধ্যশ্রেণীর মধ্যেকার ব্যক্তি বিদ্রোহ থেকে, বিদ্রোহের পথ ধরেই এসে পৌঁছেছে রাজনীতিতে। কিন্তু রাজনীতি তো নিছক বাইরের ঘটনা নয় তাকে জড়াতে হয় জীবনের সঙ্গে। মধ্যশ্রেণীর আত্মতৃপ্তির জগতে সে রাজনীতির কর্মযজ্ঞ হতে পারে না। মধ্যশ্রেণীর সযত্ন-লালিত বিশ্বাস ও ভাবনার সীমানার মধ্যে সে রাজনীতির সম্ভব নেই। শ্রেণীগতভাবে অবধারিত বিনাশই মধ্যশ্রেণীর একমাত্র পরিণতি। শ্রেণী-গত গণ্ডি কেটে, সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যবাদী আন্দোলন ও ভাবাদর্শের মধ্যে একমাত্র সুযোগ করে দিতে পারে এই অবধারিত বিনাশ থেকে মুক্তি। আমাদের দেশে ৫, ৭ বা ১০টি সাম্যবাদী পার্টির বহুস্পর্শ ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তোলার পথে হয়তো বা অন্যতম প্রধান অন্তরায় কিন্তু সাম্যবাদী আদর্শ ও পার্টি ছাড়া জাতির ও শ্রেণীর মুক্তির স্বপ্ন দেখা তো অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক।

স্বাধীনতা-উত্তর চার দশকের গতিপথে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজজীবন পর্যন্ত মনে হয় যেন জীবনের সুর-তাল-ছন্দ-মাত্রা সব ভেঙেচুরে গেছে ও যাচ্ছে। কোথাও তার পরিচিত নিশ্চিন্ততা নিশ্চয়তা দেখা যায় না। বোধময় হয় না। বর্তমানের বেসুর বেতাল বেআব্রু জীবন যত বিসদৃশ, উৎকট বিভীষিকাময় হোক এই বিসদৃশ্য বিভীষিকা থেকে বের হওয়ার রাস্তা আছে সে রাস্তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব, বুদ্ধিমান মানুষেরও অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদেরই।

বুদ্ধিজীবীদেরই বৃত্তি হচ্ছে কায়েমী ব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করে, কায়েমী নৈতিক-মানসিক ভিত্তিকে দুর্বল করে, সমকালীন মানুষের সামনে বিশেষ করে সংগ্রামরত শ্রেণীসমূহের সামনে বিকল্প সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি

নিয়ে আসা। আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক সমাজের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে যুগ যুগের সংস্কার পরিহার করে অথবা বদ্ধ ধ্যান ধারণার মোহমুক্ত হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের ও রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা অতি কঠিন, ঔপনিবেশিক শ্রেণী হিসাবে শাসন-শোষণের নির্যাতন যন্ত্রণা বুদ্ধিজীবী মধ্যশ্রেণীর কোনদিন তেমন ভোগ করতে হয় নি। বিদেশী শাসকদের চোখে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন মুনসী মাত্র। এঁদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার লক্ষণ দেখলেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা আঁতকে উঠে যেকোন উপায়ে ও অজুহাতে তা রোধ করতে উদ্যত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ঘুষ ও ধমক মিশিয়ে বুদ্ধিজীবীদের পর্যবসিত করতে চেয়েছেন শিরদাঁড়াহীন কেরানী মুৎসুদ্দীতে। বিদেশী শাসকদের এই আকাঙ্ক্ষা অনেকটা পরিমাণে সফলতা লাভও করেছিল। ইতিহাসে চিরদিনই প্রধানত শাসকশ্রেণীর পারিষদের ভূমিকাই এঁরা পালন করেছে। কাজেই মজ্জাত বুদ্ধিতে বর্তমান সামগ্রিক নৈরাজ্য-বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এমনকি এই শ্রেণীভুক্ত বিপ্লবীরাও তাঁদের গতানুগতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নতুন করে বিপ্লবাত্মক না করলে Revolution-এর প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটন করা তাঁদের পক্ষেও সম্ভব হবে না।

যে ধনতন্ত্রের রূপ বিশ্লেষণে মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎপত্তি, পরবর্তীকালের বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্রমোন্নতির পথে সেই ধনতন্ত্রের আদত রূপ ঠিক থাকলেও বাহ্য রূপের—এত ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে যা ৫০/৬০ বছর আগেও সম্ভব ছিল না। বস্তু বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ব্যাপক প্রয়োগে ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এমন এক উন্নত স্তরে পৌঁছেছে এবং বুর্জোয়া প্রচার কৌশল এমন এক লোভনীয় স্তরে ভোগেচ্ছাকে উন্নীত করেছে যে মধ্যবিত্ত এমনকি একাংশের মেহনতী মানুষও তাতে নেশাখোরের মত বুঁদ হয়ে থাকতে প্রবৃত্ত হচ্ছে। পণ্যময় সমাজে সুখোচ্ছ্বাসের তরঙ্গে ও দিবাস্বপ্নে প্রায় সকলেই ভাসমান হচ্ছে।

অতি উন্নত পণ্য শিল্প সমাজের টেকনোলজিকাল উদারতার অকৃপণ ভোগ-লালসা উপেক্ষা করে কতজন মেহনতী মানুষ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বা কারখানার শ্রমিক বর্তমানের ধনতন্ত্রের অন্তরালবর্তী কঙ্কালসার চেহারার দিকে চোখ ফেরাবে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরিবর্তনের জন্য উৎসাহিত হবে? অথচ উন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মার্কসীয় আত্মবিচ্ছেদের ফলে বেদনা,

নৈরাশ্য, আত্মবিকার ক্রমেই দৃঢ়মূল হচ্ছে, বৈপ্লবিক চেতনায় মরচে ধরে যাচ্ছে। সবদিক দৃষ্টি দিলে দেখা যায় উন্নত ধনতন্ত্র তার কৃতকৌশলগত সমাজটাকে এক বিশাল চক্রে পরিবর্তন করছে যার মধ্যে মানুষ জমাট বেঁধে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ ধনতন্ত্রের এই অবস্থা অতিবার্ধকের উপসর্গ অথবা তার বিদায়ের পর্ব তা প্রায় মধ্যশ্রেণীর বোধশক্তি থেকে বিলীয়মান। তাঁদের হবার কথা স্বাধীন সমালোচক তাঁদের অনেকেই হয়েছেন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সভাসদ, কর্মচারী। তাঁদের বিচার, বিশ্লেষণ অনুসন্ধিৎসা, উদ্ভাবনা, সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুন সম্ভাবনা এবং বুর্জোয়া বিকল্পের প্রতিশ্রুতি আনবে তাঁদের অনেকেই সরকারী তকমা খেতাব, বৃত্তি চাকুরী কিংবা সরকারী কৃপার লোভে আশ্রয় নিয়েছেন বাকচাতুরীতে, ভাগীদার হয়েছেন প্রশাসনিক পাপাচারের এবং অনিবার্যভাবে হারিয়ে ফেলেছেন জিজ্ঞাসার সামর্থ্য। বিবেক ও নৈতিকতার স্বপ্রতিষ্ঠ অধিকার। সমাজে বুদ্ধিজীবীদের যা বিশিষ্ট বৃত্তি, ইতিহাসে যা বুদ্ধিজীবীদের মুখ্য দায় তা পালন করতে বুদ্ধিজীবীরা বর্তমানে পরাঙ্মুখ। ক্ষেতের ফসল এঁরা ফলাতে পারেন না কিন্তু মনকে জড়তার আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার সামর্থ তো বুদ্ধিজীবীদের থাকা দরকার। সে শক্তির উৎস হচ্ছে নিরন্তর বিজ্ঞান অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা এবং তার নির্ভীক প্রকাশ। প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া শক্তির কাছে বুদ্ধিজীবী যখন প্রশ্নশীলতাকে বন্ধক রাখেন সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর আত্মিক অধঃপতন শুরু হয়। যার জোরে বুদ্ধিজীবী ইতিহাসে ও সমাজে বিবর্তনের বাহক তা ক্রমেই মোহগ্রস্থ হয়, ভিতরকার বুদ্ধিজীবীকে গ্রাস করে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও আবির্ভূত হয় 'পুরুত-মোল্লার' প্রেত। বুদ্ধিজীবী নিজেদের ঠকাতে পারেন কিন্তু ইতিহাসকে ঠকানো যায় না।

বিশ শতকের প্রথম পর্বেও ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েট শ্রেণী-সংগ্রামের যে চিত্র স্পষ্ট আকারে দেখা গিয়েছে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক অগ্রসরমান দেশে সে চিত্র অনেকটাই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উন্নত কৃতকৌশল-সম্পন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের সমাজের রূপ দেখলে মনে হয় না যে বুর্জোয়া প্রলেটারিয়েট সংঘর্ষের আদি রূপ অবিকৃত আছে এবং তাদের পরস্পর সংঘাত অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম বৈপ্লবিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ইতালি, ফ্রান্স, বৃটেন, জাপান, আমেরিকা, সুইডেন ইত্যাদি। শ্রমিকশ্রেণী ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন দাঁড়াচ্ছে ঐক্যত্রিক দরকষাকষির আন্দোলন, মধ্য-

শ্রেণীর ট্রেড-ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের ঝোঁক প্রবল, বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতার মতন। এতে বিদ্রোহ-বিপ্লবের নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই। তার কোন চৈতন্যও নেই। অবিমিশ্র অর্থনীতিবাদ ক্রমাগত মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে। শ্রেণীচেতনা দূরের কথা, শ্রম দাসত্বের বেদনা-যন্ত্রণা পর্যন্ত বিলীয়মান হচ্ছে। ইয়াঙ্কি সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তার বিশেষ করে এশিয়ার অনুন্নত অর্ধোন্নত দেশগুলিতে লক্ষণীয় ব্যাপার। আমাদের দেশে আমেরিকান ডলারের ইনভেস্টমেন্টের মত—আমেরিকান 'সমাজ-বিজ্ঞানের'ও আমদানি হয়েছে। উভয়েরই উদ্দেশ্য একই মার্কসীয় নীতি ও সংগ্রামের ভিত্তি ক্ষয় করা, শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণী-ভেদবোধ সম্বন্ধে মার্কসীয় মানদণ্ডকে নস্যাৎ করা। যেমন আধুনিক ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই আমেরিকান মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁদের গবেষণা, কাজকর্ম প্রধানত আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীদের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত। আর এসব হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর দেশীয় সমশ্রেণীর সঙ্গে মধ্য-শ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্যে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের অতিজটিল যন্ত্রপিঞ্জরে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী নয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী কর্মরত মানুষের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদবোধ ভয়াবহরূপে প্রকট হয়ে উঠছে। দাসত্ব চেতনা লুপ্ত হচ্ছে। যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের দাস যারা—তারা যে অকৃত্রিম দাসানুদাস সেই বোধ পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে। বস্তুজগতে নিছক বস্তুতে পরিণত হওয়াই হল আসল দাসত্ব, আত্মবিচ্ছেদের সঙ্গে সেই দাসত্ববোধ লোপ হল যন্ত্রীকৃত সমাজের লক্ষণ। আর এ লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রতিফলিত মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশে। মধ্যশ্রেণীর অংশবিশেষ সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশ্চাত্য অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসে প্রবল বেগে ধাবমান হচ্ছে। পাশ্চাত্য সমাজে যদি এ সমস্যা প্রকট হয়ে থাকে (জানিনা) তবে আমাদের সমাজে এ সমস্যা বিকট হচ্ছে বলা যায়। পাশ্চাত্য সমাজের যেমনই হোক একটা আকার আছে। আমাদের সমাজ কিম্ভূত-কিমাকার। ঐতিহ্য-আধুনিকতা, বিজ্ঞান-ধর্ম, গুরুবাদ ও নেতাবাদ, সলজ্জ সাধুতা নির্লজ্জ-অসাধুতা, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র, বহু দেবতা ও বহু দানব এবং বহু মানবের এক বিচিত্র মিশ্র সমাজের মিশ্রণ আমাদের এই দেশ।

একদিকে প্রবল সংস্কার ও জড়ত্ববাদ অপরদিকে যন্ত্রোন্নত আধুনিক

ধনতান্ত্রিক সমাজের আরামদায়ক অধীনতা থেকে মানুষের মুক্তি কোন পথে, রাজনৈতিক কর্মীদের বিশেষ করে সাম্যবাদী সমাজচিন্তার অনুগামী বুদ্ধিজীবী ও বিষজ্জনদের এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের নৈতিক দায়িত্ব আছে। আমাদের মত সদ্যস্বাধীন দেশের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যাঁরা ধনিকশ্রেণীর সরকারের লুণ্ঠন ও শোষণ পরিকল্পনার বুদ্ধির জোগানদার ও সহযোগী অংশীদার তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানের ধারা বিশ্বাস করেন অনুশীলন করেন, যাঁরা মার্কসবাদী তত্ত্বে সমাজবিজ্ঞানের সূত্রাঙ্কিত পথে শ্রেণীসংগ্রাম বিশ্বাস করেন, যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রম-বিকাশকে মার্কসবাদ অনুসরণ করে অগ্রসর হন তাঁদের পক্ষে, সর্বশ্রেণীর মুক্তি প্রচেষ্টার অংশ না নিয়ে শ্রেণীর মুক্তি নেই।

শাসকশ্রেণী মোটের উপর সমাজবিকাশের পুরোধা রূপেই শাসকশ্রেণী হয়ে ওঠে, সেই শাসকশ্রেণী সমাজ বিকাশের পথে বাধা ও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালে তারপর আর বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। সামন্ত শাসকরা সেজন্যই হেরে গেলেন ধনিকশ্রেণীর কাছে, ধনিকশ্রেণীরও দিন ফুরিয়ে আসছে। এখন শ্রমিক কৃষকের দিন আসছে। কিন্তু এই শ্রমিক-কৃষক-শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নেতৃত্ব এখনও আমাদের দেশে প্রধানত বুদ্ধিজীবী-দের কবলে। শ্রেণী (বা গোষ্ঠী হিসাবে যে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী তার নিজস্ব বিপ্লবী শক্তি অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। কথাটা হয়তো ক্ষোভের বশেই বলা হল কিন্তু এই সেদিন পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যশ্রেণীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য ছিল, দেশ সেবায়, মানুষকে ভালবাসায়, আত্ম-ত্যাগের, দুঃখ বরনের ও সহনের এবং কর্মকুশলতার। এই নেতৃত্বের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবর্গের শিক্ষিতশ্রেণীর। ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এঁরাই নেতৃত্ব করেছেন যত বিধাগ্রস্ত হোক সে নেতৃত্ব। কিন্তু মধ্যশ্রেণীর সেই বিপ্লবী ভূমিকা যেন দিন দিন নিঃশেষ হয়ে গেল, দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আয়োজনে যেন আজ আর এঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক অক্ষম, এঁদের যেন সাধ্য নেই কৃষিবিপ্লব সার্থক করতে সহযোগিতায় অগ্রসর হন, শিল্পবিপ্লবে উদ্যোগী হয়ে শ্রমিক জনগণকে সহযোগিতা দান করেন। ('৭০ এবং '৮০ র দশকের আন্দোলনে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হওয়া দরকার) শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর গোষ্ঠী বর্তমানে

নিঃশেষিত আর অবক্ষয়ের পথে যাত্রী। এই সংকল্পভ্রষ্ট শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সহযোগিতায় শ্রমিক-কৃষকের স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব কিনা চিন্তা করা দরকার।

সারা দেশে ধনিকশ্রেণীর শোষণ ও পীড়নের যন্ত্রণা ও বঞ্চনার—বহুমুখী আক্রমণে সাধারণ মানুষ বিমূঢ় হয়ে পড়ছে, অস্থির হয়ে উঠছে। প্রতিদিন মানুষ চোখের উপর দেখছে, অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করছে পরিকল্পনার নামে শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা, অপচয়, চারিদিকে চোরাবাজার, নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি, অপদার্থতা, আত্মীয় পোষণ, স্বার্থপর অর্থলিপ্সা, বিলাস-ব্যাসন ঔদ্ধত্য, বেপরোয়া লুণ্ঠন মুষ্টিমেয় ফন্দিবাজ এবং একচেটিয়া ধনিক ও ফটকা-বাজের স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্রও বেপরোয়া হচ্ছে। মানুষের জীবন-সংকটে এই অনাচার, পাপাচারের প্রতিরোধে অগ্রসর হতে হলে, এই জীবন সংকট হতে মুক্তি পেতে হলে জনশক্তিকে জাগ্রত করে, অসমাপ্ত জনবিপ্লবকে সার্থক করাই দেশের সম্মুখে প্রকৃত পথ। আর এই পথের সংগঠক হিসাবে, নেতৃত্বের অংশ হিসাবে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের পাশে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষকে নিজ ভূমিকা পালন করতেই হবে। 'সমাজ বিপ্লবকে বিলম্বিত করলে সমাজ বিপর্যয়ই অনিবার্য হয়ে উঠবে'। শুধুমাত্র ভাবলোকের উর্দ্ধাকাশ থেকে রৌদ্র-বায়ু সংগ্রহ করেই মানুষের জীবন রক্ষা হয় না। সমগ্র দেশব্যাপী বর্তমানে অতি প্রকট হয়ে অনুভূত হচ্ছে যে '৪৭ এর রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় আটক রেখে জনগণের জীবনের মুক্তি হবে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে জনগণের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন একান্তই প্রয়োজন।

দেশে এখনও অন্তত-তিনশত বৎসরের বস্তাপচা সামন্ততন্ত্রের জের মেটাতে পারা যায় নি, অথচ তা না মেটাতে পারলে নব্য-সমাজের আবির্ভাব হবে স্বপ্ন দেখা। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অবসানের জন্য যে সব আইন-কানুন হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এমনকি যা আইন-কানুন আছে তা দৃঢ়চিত্তে প্রবর্তন করতেও শাসকশ্রেণী উদগ্রীব নয়। কৃষকের জমির 'মালিকানা' দেওয়া হয় নি অথচ দেশের বৃহত্তর সমাজের ধনযোগানদার ও রাজস্বের মূল উৎস এখনও পর্যন্ত কৃষকসমাজ ছাড়া আর কে?

অর্থনৈতিক স্বরাজলাভ করতে চাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উপর হাত না

দিয়ে এবং দেশীয় একচেটিয়াদের অবাধ স্বাধীন লুণ্ঠনের সুযোগ দিয়ে। আমরা বাঙালীরা অন্তত জানি, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দালাল এই দেশীয় শোষকরা দেশে স্বনির্ভর শিল্পায়নের স্বাধীন গতিতে সহায়তা করতে পারে না করবে না। আমরা বাঙালীরা মেদমজ্জায় চিনি সাম্রাজ্যবাদী ও তার দেশীয় সহযোগীদের—শোষণের রূপ।

আসল কথাটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব এই দুই পরস্পর নির্ভরশীল বিপ্লব সম্পূর্ণ না হলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না, আর এই দুই বিপ্লবের অর্থ একই কালে কৃষকের আত্মপ্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই বৃহৎ জনসমষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় না করলে মধ্য-শ্রেণীরও সমস্যার সমাধান নেই। এই মূল কথাটা বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠী-স্বার্থেই মনে রাখা দরকার।

একটা পাকাপোক্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আমাদের রাজ্যে একটানা প্রায় একযুগ হল বামপন্থীদের দ্বারা সরকার পরিচালিত হচ্ছে। এক যুগ সময়টা কম নয়, অভিজ্ঞতাও কম হল না। রাজ্যের অধিকাংশ সাধারণ বা শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এই সময়কালের মধ্যে সমস্যা বা সংকট নিরসন হয়েছে এমন দাবী কেউ করছে না, কিন্তু যা হয়েছে সেটা মহামূল্যবান। রাজ্যের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ আত্মশক্তির সন্ধান পেয়েছে, অধিকার, বোধ, মর্যাদাবোধ, একতাবোধ, রাজনৈতিকবোধ সর্বোপরি শ্রেণীবোধ অনেকটা জাগ্রত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শোষণ ও পীড়নের যন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্বরূপ বামপন্থী অনুগামী জনগণের চেতনার মধ্যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেকটা এসেছে। নিজেদের শ্রেণীশক্তি ও শ্রেণীশত্রুর যথার্থ চেহারা এই দুই চেতনাই বামফ্রন্ট পরিচালনকালের মূল্যবান সম্পদ। ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, ক্ষুদ্রতা এমনকি শ্রেণীস্বার্থ অপেক্ষা গোষ্ঠীস্বার্থ বা পার্টিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতাও কখনও কখনও প্রকট হচ্ছে এবং সমস্যা সৃষ্টি করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রধান গতিমুখ হচ্ছে রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্য, শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্য, শ্রেণীর ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—তথা শ্রেণীসংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হচ্ছে।

অপরদিকে গত একযুগের যেটা প্রধান দুর্বলতা ক্রমাগত প্রকট হচ্ছে তা হল একদিকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর স্বার্থপরতা ও মূল শ্রেণী-

স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নতা, অপরদিকে বামফ্রন্টের উপরের চেহারা দেখে মনে হয় এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীই যেন বামফ্রন্টের সংগঠন ও সরকারের পরিচালনার প্রধান স্তম্ভ। শক্তির 'প্রধান উৎস'।

কারা এই মধ্যশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত! জমির উপস্বত্ব ভোগী, অনেকেই উচ্চবর্ণের শিক্ষিত, দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যবিত্ত হল একালের সৃষ্টি। গত দেড়শ-দুশ বছরে এদেশে বৃত্তিজীবী যে শিক্ষিতশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এঁরা তাঁরা। এঁরাও জমির উপস্বত্ব ভোগী হতে পারেন, কিন্তু এঁদের জীবিকার প্রধান উৎস শিক্ষিত বৃত্তি, মাথার কাজ। ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি যে সব রাজ্যে যেমন যেমন হয়েছে সে সব রাজ্যে মধ্যবিত্তের বেকারত্ব ততটাই বেশী। আমাদের রাজ্যে মধ্যবিত্ত বেকার সংখ্যা ভয়াবহ। জমি আঁকড়ে পড়ে থাকেন যাঁরা সেটা তাঁদের শুধুমাত্র অভ্যাস বা ঐতিহ্য নয় জীবিকা অর্জনের অন্য কোন পথও এঁরা সহজে দেখতে পান না। মধ্যবিত্তের অপর অংশটি অবশ্য কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, মাষ্টার, দালাল প্রভৃতি নানা বুদ্ধিজীবী।

ঐতিহ্য হিসাবে আজও শিক্ষিত শ্রেণী প্রধানত 'ভদ্রলোক'। ধোপার কাচা জামা-কাপড় পরা কর্মচারী। এঁরা চায় 'ভদ্রজীবিকা'। অর্থাৎ কলম এবং শিক্ষিত কারুবিদের বৃত্তি। হাতের কাজে বাধ্য না হলে সাধারণত বিমুখ। এদেশের মজুরের জীবন তার দৈন্য-গ্লানিপীড়িত পরিবেশ শ্রমকাজের জন্য অমর্যাদাবোধ আচার-আচরণ এসব মধ্যবিত্তের কাছে বিভীষিকা। আজকের সমাজে যথেষ্ট আয় না থাকলে কেউ 'ভদ্রলোক' থাকতে পারে না, সেই 'ভদ্রশ্রেণী' থেকে আসলে মধ্যবিত্ত যত পরিমাণে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে ততই ক্ষুদে-মধ্যবিত্তের চেষ্টা হচ্ছে বেতন ভোগী শ্রমিকের জীবনকে দূরে ঠেলে দিয়ে কোনরকমে ভদ্রলোক নাম বজায় রাখবার। যে-কোনভাবে বাজারে আয়ের মাপকাঠিতে একধাপ উপরে উঠবার ব্যাগ্র-কামনা। এই মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীই বামফ্রন্টের "প্রধান হাতিয়ার" হতে চাইছে। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াতে চাইছে। বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে এঁরা আকাঙ্ক্ষার কিছুটা সফলতাও অর্জন করেছে। ভাল করে বিচার করে দেখা দরকার বামফ্রন্ট শাসনকালে নিজেদের শ্রেণী (গোষ্ঠী) স্বার্থে এই মধ্যশ্রেণী বর্তমান সরকারী ক্ষমতাকে কতটা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে এবং

বামফ্রন্টের সামগ্রিক শ্রেণী অনুগামী জনগণের জীবন-মানের সঙ্গে তার সমতা থাকছে, কিনা ? কিংবা ফ্রন্ট শাসনকালেও আরও একদল বিশেষ সুবিধা-ভোগী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে অধিকতর 'শক্তি' সঞ্চয় করতে সক্ষম হচ্ছে ?

মনে রাখা দরকার বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের অধিকাংশের পক্ষে এভাবে 'স্বচ্ছল পরিবারে' পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। বরং মধ্যবিত্তের অধিকাংশকেই নিম্ন থেকে নিম্নতর পর্যায়ে পরিবর্তিত হতে হতে আসলে শ্রমজীবী পর্যায়ে পৌঁছানোই অনিবার্য। আর্থিক সামাজিক ক্ষেত্রে শোষিত মধ্যবিত্তের স্থান শ্রমিকশ্রেণীরই সঙ্গে। যাঁরা কার্যতঃ শ্রমজীবী হয়েও সমাজে শ্রমিক হিসাবে পরিচিত হতে চান না তাঁদের মুক্তি নেই। মধ্যবিত্ত কর্মচারী শ্রেণীকেও বুঝতে হবেই সংঘবদ্ধ হতে হলে একত্রিত হয়ে দাঁড়াতে হবে শ্রমিকশ্রেণীরই পাশে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে। অভিভাবক হয়ে নয় পরম আত্মীয় হয়ে নিজেদের শ্রেণী অভিমান ত্যাগ করে। মাথার কাজের কর্মী হিসাবে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হবে তখন যখন শোষণহীন ব্যবস্থায় শ্রেণীহীন সমাজের পত্তন হবে। যখন শ্রমিকশ্রেণী পাবে নেতৃত্ব, একাধিপত্য, মাথার কাজের মজুর হিসাবে শিক্ষিকশ্রেণীও পাবে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সম্মানিত স্থান। তারপূর্বে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামে অংশ নিয়ে, বিপ্লবের সহকারিতা করে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের স্বস্বার্থ বিলোপ করে তবেই শিক্ষিত সাধারণের ভদ্রচেতনা ভদ্র-ঐতিহ্যের উদ্ধারলাভ সম্ভব। বুদ্ধিজীবী শ্রমিকরূপে মধ্যবিত্তশ্রেণীর আর্থিক ও নৈতিক সিদ্ধিলাভ শ্রেণীহীন সমাজেই সম্ভব। এছাড়া মধ্যবিত্তের কোথাও উদ্ধারের উপায় নেই।

বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত যখন শূন্যবিত্ত, তখন তাঁদের প্রধান স্বার্থকতার পথ হল নিজেদের জন্মগত 'শ্রেণীমার্কা' ত্যাগ করে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরূপেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় মধ্যবিত্তের বিলোপ যেমন নিশ্চিত, বুদ্ধিজীবীর বিকাশও তেমনি ভাবীসমাজে অধিকতর সুস্থির। আর এই উদ্যোগ বাঙলাদেশেই সম্ভব। বামপন্থী গণতান্ত্রিক রাজ্য সরকার তথা বামফ্রন্টের পরিচালনাকালেই বাস্তব।

কার্ল মার্কসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান-ভাবনা

প্রদীপ বক্সী

১৯৮১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং জার্মান গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলসের ৫০ খণ্ডের রচনাবলীতে তাঁদের যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে, ১৯৭৫ সাল থেকে মস্কোর প্রগতি প্রকাশনীর সৌজন্যে সেগুলির ইংরেজী সংস্করণ আমরা এ দেশেই সংগ্রহ করতে পারছি। ইংরেজী সংস্করণে এ পর্যন্ত ২৭টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত ৫০ খণ্ডে অবশ্য এ পর্যন্ত প্রকাশিত সব রচনা স্থান পায় নি। পৃথকভাবে প্রকাশিত মার্কসের গণিত বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সমূহের একটা বড়ো অংশ (৯), মার্কসের নৃতত্ত্ব বিষয়ক নোট বইগুলি (দ্রষ্টব্য : ৩৭, ৪৮, ৪৯) এবং প্রকৌশল সংক্রান্ত নোটগুলির এ পর্যন্ত প্রকাশিত অংশটি (৫৯) উপরোক্ত রচনা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এর বাইরে রয়েছে মার্কস-এঙ্গেলসের অপ্রকাশিত খাতা ও খসড়া পাণ্ডুলিপি সমূহের এক বিশাল ভাণ্ডার। আশা আছে প্রস্তাবিত ১০০ খণ্ডের রচনা সমগ্রে তাঁদের সকল সংরক্ষিত রচনাই স্থান পাবে।

বর্তমানে তাঁদের অপ্রকাশিত খাতার সংখ্যা ১৯৪। এর মধ্যে ১৭৪টি মার্কসের এবং ২০টি এঙ্গেলসের। এঙ্গেলসের খাতাগুলির মধ্যে ১৫টিতে রয়েছে প্রোয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস সংক্রান্ত নোট, বাকীগুলিতে স্থান পেয়েছে জার্মানীর ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস এবং সমর-বিজ্ঞান। আর মার্কসের ১৭৪টি অপ্রকাশিত খাতার মধ্যে প্রধানত পাই তাঁর প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চার পরিচয় (৩ এবং ১১)। মার্কসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার পরিচয়বাহী এই খাতাগুলির অধিকাংশই তাঁর জীবনের শেষ দিকের সাথে জড়িত (দ্রষ্টব্য : "পুঁজি", ২য় খণ্ড, ভূমিকা, ইংরেজী সংস্করণ, প্রগতি, মস্কো, ১৯৭৮, পৃ ৩-৪)। প্রশ্ন ওঠে : কেন তিনি শেষ জীবনে প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন? মার্কসবাদের সমগ্র কাঠামোর মধ্যে মার্কসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার স্থান কোথায়? বিজ্ঞানের ইতিহাসেই বা মার্কসের এই

বিজ্ঞান চর্চার স্থান কোথায়? এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য, অবশ্য, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কিভাবে প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও প্রাসঙ্গিক দার্শনিক প্রশ্নাবলী অধ্যয়ন করেন তার সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন (১০, পৃ. ৩)।

মার্কসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসকে কালানুক্রমিকভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ১. জিমনাসিয়ামের ছাত্র হিসাবে প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার (১৮৩৫ সাল পর্যন্ত) ; ২. বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব (১৮৩৬-১৮৪১) ; ৩. বিজ্ঞানসম্মত সাম্যবাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর মূলনীতিগুলি নির্ধারণ পর্ব (১৮৪২-১৮৪৮) ; এবং ৪. মূর্তবিশেষ বিজ্ঞানসমূহের অধ্যয়ন (১৮৪৮-১৮৮৩)।

১. জিমনাসিয়ামে প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন

ত্রিয়েরের জিমনাসিয়ামের ছাত্র কার্ল হাইনরিখ মার্কস ইয়োহান ক্রিডরিখ ব্লুমেনবাখ রচিত পাঠ্যপুস্তক সমূহের ভিত্তিতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন (১৫)। তাঁর গণিতের শিক্ষক নিকোলাস ড্রুকেন হ্যালার এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক ইয়োহান স্টাইনিঙ্গার নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণাও করতেন (২২, ২৩, ৮৯)। স্টাইনিঙ্গার অতিরিক্ত চর্চা করতেন দর্শনের ইতিহাস (১১)। তাঁদের অধ্যাপনায় এইসব গবেষণাকর্মের প্রভাব না পড়ে পারে না। জিমনাসিয়ামের অধ্যক্ষ ইয়োহান হুগো ভিটেনবখে ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস হতে আহৃত তথ্য ও ধারণা সমূহের সাহায্য নিয়ে ইতিহাস পড়াতেন। তাঁর নিজের রচনার মধ্যেও এই সংশ্লেষণ প্রয়াসের পরিচয় মেলে (১৪, ১৫)। ত্রিয়েরের জিমনাসিয়ামের ছাত্রেরা সেকালের প্রুশিয়ার অন্যান্য অংশের ছাত্রদের তুলনায় প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চা করতো খানিকটা বেশি পরিমাণে (দ্রষ্টব্য : ৬৪ এবং ৮৮)। গণিতের পাঠক্রমে ছিল—চিরায়ত পাটিগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, লগারিদমের তত্ত্ব সহ বীজ-গণিত এবং সীমাহীন ভাবে ক্ষুদ্রের কলন, আর প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মধ্যে পড়ান হত—চিরায়ত বলবিদ্যা, আলোকবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল এবং প্রাথমিক ভূতত্ত্ব (৬৪, পৃ. ১৫৭)। বিদ্যালয়ের নীচের দিকের শ্রেণীগুলিতে (৬ষ্ঠ, ৭ম ইত্যাদি শ্রেণীতে) প্রকৃতি-বিজ্ঞান শেখান হত সুকুমার শিল্পের ও হাতের কাজের সাথে একযোগে। এখানে ত্রিয়েরের তৎকালীন সমাজের কুটির শিল্পের ও কৃষির চাহিদার সাথে সেখানকার জিমনাসিয়ামের

পঠন-পাঠনের একটা যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। ভিটেনবাখ এবং স্টাইনিঙ্গার ছিলেন "ত্রিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সমিতি"-র সদস্য (৭১)। ড্রুকেন ম্যুলার প্রথমে ছিলেন শিল্পপতি। ১৮৪৬ সালে তিনি ত্রিয়েরের বিদ্যালয় সমূহের পরিচালক পদে বৃত হন (৯৬, পৃ. ৬৩)।

ভিটেনবাখের মতো শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানের ছাত্রেরা শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কতকগুলি তথ্যই শিখতো না, শিখতো প্রকৃতির ইতিহাস। সাধারণভাবে বলা যায়, ছাত্রদের ঐতিহাসিক-ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বিকশিত হত। বালক মার্কসের ইতিহাস ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষকেরা সকলেই ফরাসী ও জার্মান এনলাইটেনমেন্টের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের ভাবজগতের এই আন্দোলন প্রচলিত মতবাদ ও মূল্যবোধসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, পরিচালিত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ও সর্বজনীন মানবীয় প্রগতির ধারণার, এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-নির্ভর পদ্ধতির ও যুক্তির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের স্বপক্ষে। মার্কসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষক স্টাইনিঙ্গার সম্বন্ধে তো নিরীশ্বরবাদ ভাবধারা প্রচার করার অভিযোগও ওঠে। ত্রিয়েরের জিমনাসিয়ামের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেকার ভাবাদর্শগত পরিবেশ প্রাশিয়ার তদানীন্তন সরকারের পক্ষে এতদূর অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, যে সেখানে রাজনৈতিক খবর-দারী করার জন্য দ্বিতীয় এক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (৬৩, পৃ. ২৮৩)।

এই আবহাওয়ার মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠেন কিশোর মার্কস। সর্বাগ্রে তিনি হয়ে ওঠেন জিমনাসিয়ামের ও ত্রিয়েরের সমাজের জীবনের এক সমালোচক। তিনি বুঝতে পারেন ব্যক্তির কর্তব্য হল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সচেতনভাবে ও নৈতিকতাসম্মত পথে সক্রিয় হওয়া, সেখানেই তার শক্তি [দ্রষ্টব্য : জিমনাসিয়ামের ছাত্র মার্কসের লেখা নিবন্ধ—"ভবিষ্যতের পেশা সম্বন্ধে তরুণের ভাবনা" (৬১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩-৯), এবং "জন ১৫ : ১-১৪ অনুসরণে বিশ্বাসীদের সাথে খ্রীষ্টের মিলন—তার ভিত্তি, মর্মবস্তু, পরম অবশ্যম্ভাবিতা ও পরিণত প্রদর্শন" (তদেব, পৃ. ৬৩৬ ৬৩৯)]। জিমনাসিয়ামের পাঠ শেষে মার্কস প্রধানত প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন নি। বরং তাঁর পরীক্ষার ফলে এবং উপরোক্ত নিবন্ধ দুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক-ঐতিহাসিক বিদ্যাসমূহের প্রতি এবং নাগরিক ও মানবীয় মূল বোধসমূহের প্রতি তাঁর প্রথম অনুরাগ।

২. বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে প্রকৃতি দর্শন চর্চা

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের ছাত্র মার্কস আইন ছাড়াও পড়েন ভূগোল, নৃতত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র (৬১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯১-৭০৪)। এই সময়ে ঐতিহাসিক প্রগতির নিয়মানুগতার প্রশ্নের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং মানবসমাজের ইতিহাসের মর্মবস্তু অনুধাবন করার তাগিদ থেকে তিনি প্রাচীন গ্রীক ও রোমক দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। এই অধ্যয়নের পরিচয় পাই তাঁর ডক্টরেট পর্যায়ের গবেষণায় (৬১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩-৫০৯) এবং "ডেমোক্রিটাসের ও এপিকিউরাসের প্রকৃতি-দর্শনের মধ্যেকার পার্থক্য" শীর্ষক গবেষণাপত্রে (তদেব, পৃ. ২৫-১০৫)। প্রাচীন গ্রীক প্রকৃতি দর্শন সমূহের (এবং তাদের রোমক ভাষ্যগুলির) সাথে মার্কসের পরিচিতি এখানে স্বতঃপ্রতীয়মান। এই পর্যায়ের গবেষণায় হেগেলের "প্রকৃতির দর্শন" বা "দর্শনের ইতিহাস" বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে বোঝা যায়না, যদিও প্রথমোক্ত গ্রন্থটির সাথে তিনি সে সময়েই পরিচিত ছিলেন (তদেব, পৃ. ৫১৩ ৫২৪)। অন্যদিকে গবেষণাপত্রে ও প্রস্তুতিপর্বের নোটে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছেন বাস্তববাদী গ্যাসেণ্ডী। সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে পিয়ের গ্যাসেণ্ডী ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের ও এপিকিরাসের নীতিশাস্ত্রের নবীকরণে সচেষ্ট হন। মার্কসের এই গবেষণায় ফয়ারবাখের "আধুনিক দর্শনের ইতিহাস" (১৮৩৩) শীর্ষক গ্রন্থের প্রভাবও উল্লেখনীয়। প্রকৃতি-দর্শন বিষয়ক এই গবেষণাপত্রে প্রাচীন গ্রীক পরমাণুবাদের ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে যথাযথভাবে, ও তার সকল বৈচিত্র্য সহকারে। এখানে আলোচিত হয়েছে : পরমাণু সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ধারণার বিবর্তন ও তার ব্যাখ্যা, স্থানের সাথে পরমাণুর সম্পর্ক, পরমাণুর গুণাবলী, সরল রৈখিক পথ হতে পরমাণুর বিচ্যুতির সাথে অবশ্যম্ভাবিতা ও সম্ভাবনার সম্পর্ক, ইত্যাদি। মার্কসের পরবর্তী কালের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার গতিধারাটি বোঝার, এই পর্যায়ে ব্যক্ত তাঁর দুটি ধারণা আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে :

এক : ডেমোক্রিটাসের ও এপিকিউরাসের প্রকৃতি-দর্শনের চাবিকাঠি হল পরমাণুর ধারণার মর্মবস্তু। সাধারণ পর্যবেক্ষণ হতে পরমাণুর ধারণার মর্মবস্তুতে পৌঁছানো যায় না।

দুই : প্রকৃতিবিষয়ক অনুসন্ধান প্রকৃতির নিজস্ব যুক্তির আলোকেই পরিচালিত হতে পারে।

এখানে ব্যক্ত হয়েছে মার্কসের আগামী প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার দিকনির্দেশ : প্রকৃতিকে তার আভ্যন্তরীণ নিয়মানুগতার মধ্যে অধ্যয়ন করতে হবে এবং এই প্রকৃতি শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণেরই বিষয় নয়, ধারণাত্মক (তত্ত্বগত এবং দার্শনিক) বিশ্লেষণেরও বিষয়বস্তু।

৩. বুর্জোয়া প্রকৃতি-দর্শনের সমালোচনা এবং বিজ্ঞানসম্মত সাম্যবাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তরণ : মানুষ ও বাকী প্রকৃতির ঐতিহাসিক সম্পর্কের সাধারণ পর্যালোচনা

"১৮৪৪ সালের অর্থনীতি ও দর্শনবিষয়ক পাণ্ডুলিপিগুলি"-তে মার্কস মানুষ ও বাকী প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে, তথা প্রকৃতি-বিজ্ঞান, শিল্পোৎপাদন ও সমাজের ইতিহাসের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে নিজের তৎকালীন ধারণা-সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করেছেন (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : এই রচনার "ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কমিউনিজম" এবং "হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ও সামগ্রিকভাবে তাঁর দর্শনের সমালোচনা" শীর্ষক অধ্যায়গুলি ; ৬১, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩-৩০৬ এবং ৩২৬-৩৪৬)। "পবিত্র পরিবার"-এর "ফরাসী বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক সংগ্রাম" শীর্ষক অংশে (৬১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪-১৩৪) বিধৃত হয়েছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-দর্শন এবং দর্শনের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্কসের তৎকালীন ধারণা। এই পর্বে মার্কসের সকল প্রধান রচনার বিষয়বস্তু : প্রকৃতি ও মানুষের ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্ক এবং বিজ্ঞানের, শিল্পের, সমাজের ও দর্শনের (প্রধানত ইউরোপীয় দর্শনের) ইতিহাসে তার অভিব্যক্তির তত্ত্বগত পর্যালোচনা।

ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার বিরুদ্ধে বিতর্কে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বাস্তবতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে মার্কস লক্ষ্য করলেন, তথাকথিত এক ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ সৃষ্টির ধারণা প্রবলভাবে নাড়া খায় ভূতত্ত্বের মুখোমুখি হয়ে ; কেননা, ভূতত্ত্ব পৃথিবীর উদ্ভব ও বিকাশকে উপস্থিত করে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে। পৃথিবীর নিজস্ব বিকাশের ভূতত্ত্বে বর্ণিত চিত্রটি তথাকথিত ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির

ধারণাটিকে কার্যকরীভাবে খণ্ডন করে (৬১, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪-৩০৫, এবং প্রাসঙ্গিক পাদটীকা—তদেব, পৃ. ৬০৩)।

খ্রিস্টীয়-ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ। তার একটা ধারা কার্তেসীয় পদার্থবিদ্যা হতে উদ্ভূত হয়ে ক্রমশ প্রকৃতি বিজ্ঞানের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এই অধিবিদ্যা, বিরোধী প্রকৃতি-বিজ্ঞান ফ্রান্সিস বেকনের বস্তুবাদের এক বিশিষ্ট অবদান। মার্কসের ভাষায় : "বেকন হলেন ইংলণ্ডীয় বস্তুবাদের এবং সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর বিজ্ঞানের প্রকৃত আদি পুরুষ। তাঁর মতে প্রকৃতি-দর্শনই আসল দর্শন, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যা হল এই প্রকৃতি-দর্শনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ" (গুরুত্বচিহ্ন মার্কসের) (৬১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৮)। বস্তুবাদ ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ঐক্য সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদীদের ধারণাটি মার্কস কিন্তু সোজাসুজি গ্রহণ করেন নি। কেননা, প্রকৃতি-দর্শনের এই পর্যায়ে মার্কস প্রত্যক্ষ করেন লঘুকরণবাদী (রিডাকশনিস্ট) প্রবণতার অস্তিত্ব—এই প্রবণতা প্রকৃতির ভৌত গতিসমূহকে বলবিদ্যার গাণিতিক সূত্রাবলীতে লঘুকৃত করতে সচেষ্ট হয়। বস্তুবাদ ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এই পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে মার্কস সে সময়ে যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজছিলেন তা হল এই : মানুষের সামাজিক-ঐতিহাসিক কার্যকলাপের মধ্যে বাকী প্রকৃতির জায়গাটা ঠিক কোথায় ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি স্ট্রাউস, ব্রুনো বাউয়ের, হেগেল ও ফয়ারবাখের প্রাসঙ্গিক ধারণাসমূহ পর্যালোচনা করলেন। স্ট্রাউসের স্পিনোজীয় দৃষ্টিকোণ সমালোচিত হল অধিবিদ্যক ছদ্মবেশ ধারণকারী প্রকৃতি হিসাবে মানুষকে উপস্থিত করে, তারপর তাকে প্রকৃতি হতে পৃথক করার দরুন। ব্রুনো বাউয়েরের ফিখটেপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি : প্রকৃতির উপরে আত্মগত ভাবনার স্থাপনা। হেগেলীয় ধারণাসমূহে মানুষ ও প্রকৃতির ঐক্য তার অধিবিদ্যক প্যারডি হিসাবে উপস্থাপিত। আর ফয়ারবাখ "হেগেলেরই দৃষ্টিকোণ থেকে হেগেলের সমালোচনা করেন, অধিবিদ্যক পরম ভাবকে" "প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান বাস্তব মানুষে" "পর্যবসিত করে" (গুরুত্বচিহ্ন মার্কসের) (৬১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১)।

উপরোক্ত পর্যালোচনা হতে মার্কস এই প্রত্যয়ে উপনীত হলেন যে কেবল-

মাত্র প্রকৃতির সাথে মানুষের বাস্তব সম্পর্কের আলোকেই মানব সমাজের ইতিহাসকে বোঝা সম্ভব। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সম্পর্ক বাস্তবায়িত হয়। ইতিহাসের গতিধারার পর্যালোচনা হতে মানুষের সাথে বাকী প্রকৃতির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক সম্পর্কের পর্যালোচনাকে—অর্থাৎ, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ও উৎপাদনের পর্যালোচনাকে—বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে জানার প্রথম ধাপেও পৌঁছানো যায় না (৬১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৫০)।

প্রকৃতির অস্তিত্বই মানুষের সাথে বাকী প্রকৃতির ঐতিহাসিক সম্পর্কের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। মানুষ নিজেই একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। সত্তা, অন্যদিকে মানুষের এই অস্তিত্ব বা সত্তা কেবলমাত্র বাস্তব বিষয়পূর্ণ জগতের বা প্রকৃতির পুনঃনির্মাণের পথেই বাস্তবায়িত হয়। এই বস্তুবাদী অবস্থান হতে অগ্রসর হয়ে মার্কস লিখলেন: "...মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন স্থির ও স্বতঃ-বিদ্যমান প্রকৃতির বিমূর্ত ধারণাটির মানুষের জন্য অর্থহীন" (গুরুত্বচিহ্ন মার্কসের) (৬১. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫)।

মানুষের সাথে বাকী প্রকৃতির সম্পর্কের একদিকে রয়েছে প্রকৃতির বিষয়-গত বাস্তবতা, আর অন্যদিকে মানবসমাজে প্রকৃতির সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়া। এই সাঙ্গীকরণ ঘটে বিভিন্ন সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে—খাদ্যবস্তুর এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও পদার্থের বা শক্তির আকারে। মানুষের সাথে বাকী প্রকৃতির সম্পর্ক হল একধারে প্রকৃতির মানবীকরণের এবং মানুষকে প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক করে তোলার এক প্রক্রিয়া। মার্কসের ভাষায়: সমাজের "ইতিহাস নিজেই প্রকৃতির ইতিহাসের এক বাস্তব অংশ—এ হল প্রকৃতির মানুষে বিকশিত হয়ে ওঠার ইতিহাস" (গুরুত্ব চিহ্ন মার্কসের) (৬১, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩০৪)। মার্কসের এই বক্তব্যের পদ্ধতিগত তাৎপর্য দূরপ্রসারী—এখানে ঘোষিত হচ্ছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান / সমাজ-বিজ্ঞান দ্বৈততার অবসানের আবশ্যকীয়তা।

এই অবস্থানে উপনীত হয়ে, মূর্ত সামাজিক সম্পর্কসমূহের পটভূমিতে এবং সমাজের ইতিহাসের পৃথক পৃথক কালপর্বে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের ও প্রকৌশলের বিকাশের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়াটা মার্কসের পক্ষে জরুরী হয়ে পড়ল। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানে মার্কসের উৎসাহের ইঙ্গিত মেলে

"১৮৮৮ সালের অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ক পাণ্ডুলিপিগুলি"-তে, "পবিত্র পরিবার"-এ এবং "জার্মান মতাদর্শ"-এ। এইসব রচনায় উল্লিখিত হয়েছে বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান, এবং নিউটন, ডালটন, প্রিস্টলি প্রমুখ প্রকৃতিবিদগণের নাম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁর প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে মার্কস এই বিমূর্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, প্রকৃতির তত্ত্বগত ও দার্শনিক পর্যালোচনা সম্ভব। বর্তমান পর্বে ঐ বিমূর্ত প্রত্যয় একটি মূর্ত প্রশ্নে রূপান্তরিত হল: প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহ কিভাবে তত্ত্বগত ও দার্শনিক বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে? মার্কস এর উত্তর খুঁজলেন পরস্পর সম্পর্কিত দুটি পথে; (ক) বস্তুগতভাবে বিদ্যমান প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিকতার—তার ইতিহাসের ও তাকে জানার নিয়মসমূহের—দৃষ্টিকোণ থেকে; এবং (খ) সামাজিক উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের প্রয়োগের—তাদের সামাজিক-ঐতিহাসিক উৎসের, এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের সামাজিক ভূমিকার—দৃষ্টিকোণ থেকে। এই অন্বেষণের ফসল মার্কসের পরবর্তীকালের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার সাথে সম্পর্কিত অপ্রকাশিত খাতাগুলিতে সঞ্চিত হয়ে আছে। সেখানে আলোচিত হয়েছে: কৃষি ও কৃষি রসায়ন, জীববিদ্যা, শারীরবৃত্ত, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও প্রকৌশলের ইতিহাসের কিছু প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ, এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্বগত সমস্যাবলী।

৪. সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীমূলক অবস্থান হতে বিশেষ বিজ্ঞানসমূহের পর্যালোচনায় উত্তরণ

১৮৫০ এর দশকে মার্কস তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রে প্রাসঙ্গিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহ ও প্রকৌশলের ইতিহাস অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৮৫১ সালের রাজনৈতিক অর্থনীতি সংক্রান্ত খাতাগুলিতে রিকার্ডো, ম্যালথাস, হিউম, ওয়েলস প্রভৃতি অর্থনীতিবিদের রচনা হতে নেওয়া নোটের পাশাপাশি সেই যুগের রসায়নবিদগণের কৃষি-রসায়ন সংক্রান্ত রচনা হতে আহৃত উদ্ধৃতি দেখা মেলে। ঐ বছর জুলাই মাসে তিনি প্রখ্যাত রসায়নবিদ লিবিগ রচিত কৃষিতে ও শারীরবৃত্তের অধ্যয়নে রসায়নের প্রয়োগ বিষয়ক একটি বই (৫৩)

পড়তে শুরু করেন। আগস্ট মাসে ঐ বইটি থেকে নোট নেওয়া শেষ হলে তিনি ধরেন কৃষিবিৎ লণ্ডন রচিত কৃষির বিশ্বকোষ (৫৬), এবং তারপর জনস্টনের কৃষি-রসায়ণ ও ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত একটি বই (৪২)। প্রধানত জমির খাজনা সংক্রান্ত গবেষণার তাগিদ থেকে মার্কস কৃষিব্যবস্থা ও তার সাথে সম্পর্কিত প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ৫ই মে ১৮৫১ তারিখে এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের একটি চিঠিতে (৬১, ২৭-তম খণ্ড, পৃ. ২২৩) এবং ২৫শে মে ১৮৫১ তারিখে ড্যানিয়েলসকে লেখা মার্কসের চিঠিতে (৪, পৃ. ৫৩ ৫৪) আলোচিত হয়েছে: ১৯৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল ও ৩রা মে তারিখে লণ্ডনের "দি ইকনমিস্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত "দারুণ আবিষ্কার—বিদ্যুত ও কৃষি" শীর্ষক একটি নিবন্ধ। শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহারের ব্যাপারটি আগেই মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (৭, পৃ. ৬৭-৬৮)। এখন কৃষিতে তার প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা মার্কস ও তাঁর বন্ধুদের পক্ষে জরুরী হয়ে উঠল।

লিবিখ রচিত উপরে উল্লিখিত বইটিতে সংকীর্ণ অর্থে কৃষির সমস্যাই শুধু আলোচিত হয় নি। সেখানে প্রকৃতিতে বস্তুপুঞ্জের রূপান্তরের এবং উদ্ভিদের ও শস্যের পুষ্টির সমস্যা সাধারণভাবে উত্থাপিত হয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে লিবিখ তৎকালে প্রচলিত হিউমাস তত্ত্বের বদলে (এই তত্ত্ব অনুসারে বৃক্ষ-জগতের পুষ্টির প্রধান যোগানদার হল মৃত্তিকায় পরিণত গলিত জীবদেহ), খনিজ লবণসমূহের ভূমিকার প্রাধান্য প্রতিপাদনকারী নিজ তত্ত্ব প্রচারে সচেষ্ট হন। লিবিখের তত্ত্ব অনুসারে, গাছপালার পুষ্টিতে নাইট্রোজেন ছাড়াও কার্বন, অক্সিজেন প্রমুখ "জৈব পদার্থ উৎপাদনকারী" মৌলের এবং ফসফরাস, পটাসিয়াম ইত্যাদির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লিবিখ আরও লেখেন: বায়ু, জল এবং তাপের হ্রাস বৃদ্ধির মতোই গাছপালা ও প্রকৃতির খনিজ পদার্থের ভাণ্ডারকে প্রভাবিত করে। গাছের জীবদ্দশায় তার শিকড় থেকে নিঃসৃত অ্যাসিড আর তার জীবনকালের সমাপ্তির পর তার পচনের প্রক্রিয়া হতে উদ্ভূত কার্বন-ডাই অক্সাইড এবং কার্বলিক অ্যাসিড মাটির নীচের ও উপরিভাগের খনিজ পদার্থসমূহকে রূপান্তরিত করে।

সমার্স কৃষিবিৎ লণ্ডন প্রণীত কৃষির বিশ্বকোষ হতে মার্কস প্রধানত কৃষির ইতিহাস সম্বন্ধে নোট নেন। আর জনস্টনের বইটি থেকে নোট নেন জমির

ওপাত্ত সম্বন্ধে। তারপর পড়েন ঐ একই বিষয় সম্পর্কে জনস্টনেরই লেখা অন্য একটি বই (৪১), এবং তাঁরই লেখা উত্তর আমেরিকার কৃষিব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি বই (৪৩)। "নাগরিক সমাজে" কৃষি ও শিল্প যে কিভাবে প্রকৃতির সম্পদকে নিঃশেষ করছে, এবং তার রক্ষণাবেক্ষণে যে কি নিদারুণভাবে অবহেলা করা হচ্ছে—তৎসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য মার্কস খুঁজে পেলেন উপরোক্ত বই দুটিতে। এই বছরেই মার্কস পড়ে ফেললেন গণিতের, ফলিত পদার্থ-বিদ্যার এবং প্রকৌশলের ইতিহাস সম্পর্কে পোপ্পে রচিত এক সারি গ্রন্থ (৭০, ৭১, ৭২, ৭৩)। এর কয়েক মাস আগেই মার্কসকে লেখা দুটি চিঠিতে তাঁর বন্ধু রোলাণ্ড ড্যানিয়েলস বিজ্ঞানসমূহের এক বিশ্বকোষ রচনার পরিকল্পনা আলোচনা করেছিলেন (৪, পৃ. ৪০, পৃ. ৪৭ ৪৮)। আর তারও আগে ১৮৫০ সালের জুলাই মাসে কার্ল লিবক্লেখটের সাথে মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বিজ্ঞান ও বলবিদ্যার অগ্রগতির আলোকে। এই আলোচনা সম্পর্কে লিবক্লেখট পরে লেখেন: "অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রকৃতি-বিজ্ঞানগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলুম। বিপ্লবকে একেবারে গলা টিপে মারতে সমর্থ হয়েছে ইউরোপের তৎকাল বিজয়ী প্রতিক্রিয়ার এই দিবাস্বপ্নকে ব্যঙ্গ করে মার্কস বললেন, তাদের ধারণা নেই যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান আবার নতুন বিপ্লব ঘনিয়ে তুলছে। যে মহামহিম বাষ্প গত শতকে পৃথিবীকে উল্টে-পাল্টে দিয়েছিল তার রাজত্বকালের বারোটা বাজল; তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে অপরিমেয় রকমের অধিকতর বিপ্লবী শক্তি—বিদ্যুৎ" (গুরুত্ব চিহ্ন নিবন্ধকারের) (৭, পৃ. ৬৭)।

পোপ্পের বইগুলি পড়ে ফেলার পর মার্কস পড়লেন উরে রচিত প্রকৌশলের অভিধান (১৩), এবং বেকমানের লেখা উদ্ভাবনের ইতিহাস (১৪)।

পোপ্পে রচিত গণিতের ইতিহাস হতে মার্কসের নেওয়া নোটগুলি মার্কসের "গণিত বিষয়ক পাণ্ডুলিপি" সমূহের একটি সংস্করণে স্থান পেয়েছে (১, পৃ. ২৪২-২৫০)। এই নোটে প্রধানত রয়েছে প্রাচীন যুগের গণিতের ইতিহাসের বিবরণ। সেখানে মার্কসের কোনো নিজস্ব মন্তব্য নেই। নিউটন লাইবনিৎসের যুগ হতে লাগ্রাঞ্জের পর অন্তরকলনের ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসের নিজস্ব রচনার দেখা মেলে ১৮৮৩

দশকে (১, পৃ. ১৩৭-১৮৯) (মার্কসের গণিত চর্চার সাথে প্রাথমিক পরিচিতির জন্য দ্রষ্টব্য : ৫, ৬)।

এই ১৮৫১ সালেই বন্ধু ও সহযোদ্ধা রোলাণ্ড ড্যানিয়েলস রচিত শারীর-বৃত্তীয় নৃতত্ত্ব সংক্রান্ত একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে ড্যানিয়েলসেরই সাথে আলোচনার সূত্রে (৪, পৃ. ১৭-৮৪) জীবন-বিজ্ঞানসমূহের সমস্যাবলীর প্রতি মার্কসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ড্যানিয়েলসের এই রচনাটি প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের সমস্যার বস্তুমূলক ও বস্তুবাদী পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত জানা প্রথম প্রয়াস। ড্যানিয়েলস এই পাণ্ডুলিপি রচনা করেন ১৮৫০ সালে, কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়েছে মাত্র গত বছর—১৯৮৭ সালে (১৭) (এ প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য : ২৫ এবং ৪, পৃ. ১-১২)।

৫০-এর দশকের শেষের দিকে মার্কস আবার কৃষি ব্যবস্থার অধ্যয়নে ফিরে আসেন। এবার তিনি শুরু করেন জেমস অ্যাণ্ডারসনের বই দিয়ে (১২)। এই অ্যাণ্ডারসন স্বাধীনভাবে খাজনার আধুনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু ঋনু প্রতারক ম্যালথাস্ নিজে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন বলে ভান করতেন।

১৮৬০ সালে জমির খাজনার তত্ত্বের পর্যালোচনার সূত্র ধরেই মার্কস পড়তে শুরু করেন কৃষির তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে লিবিগের লেখা একটি নতুন বই (৩৫)।

১৮৬১ সালে মার্কস পড়েন মানুষের উদ্ভবের ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ সম্বন্ধে চার্লস লীলের লেখা একটি বই (৩৭) এই বইয়ের ১৯তম অধ্যায়ের বহু পাতায় বহু জায়গায় তিনি দাগ দিয়ে পড়েছিলেন (৮, নথি নং ৬২৮৬)। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় : উৎপাদনে হাতিয়ারের / সাধিত্রের প্রয়োগ। ১৮৬৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতেও রয়েছে প্রকৌশল প্রসঙ্গে (৬১, ৪১তম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯-৪৫১)। পুঁজিবাদের প্রথম পর্বের বিকাশে বারুদ, ধিকনির্ণায়ক যন্ত্র ও ছাপাখানার যেমন যুগান্তকারী ভূমিকা ছিল, মার্কসের মতে পরবর্তী পর্বে—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবে—তেমনই ভূমিকা পালন করে প্রাচীন কালেই উদ্ভাবিত দুটি যন্ত্র—ঘড়ি এবং জলচালিত শস্য পেষাই কল। "ঘড়ি হল প্রথম স্বয়ংক্রিয় ও ব্যবহারিক উপযোগিতা-সম্পন্ন যন্ত্র, এবং সেখান থেকেই সুষম গতির উৎপাদনের

পুরো তত্ত্বটার উদ্ভব ঘটে" (গুরুত্ব চিহ্ন মার্কসের) (তদেব, পৃ. ৪৫০)। আর জলচালিত কলের পর্যালোচনার উপর "ভিত্তি করেই গড়ে উঠছে ঘর্ষণের তত্ত্ব, তথা গীয়ারের চাকার ও তার চারপাশের খাঁজকাটা অংশ প্রভৃতির গাণিতিক রূপের পর্যালোচনা ; অনুরূপভাবে, চালকশক্তির পরিমাপের প্রথম তত্ত্ব, তাকে প্রয়োগ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ের সন্ধান, ইত্যাদি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বলবিদ্যার তত্ত্ব ও প্রয়োগে উৎসাহ প্রায় সব বড়ো গণিতবিদই তাঁদের প্রস্থানবিন্দু হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন জলচালিত সরল আটা কলটিকে" (গুরুত্ব চিহ্ন মার্কসের) (তদেব, পৃ. ৪৫১)। উপরোক্ত চিঠিটি থেকেই জানা যায় যে সে সময়ের প্রকৌশলের ব্যাপারটি হাতে-কলমে শেখার জন্য মার্কস শ্রমিকদের যন্ত্র-কৌশল শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন (এ প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য : ৮৩)।

১৮৬৩ সালে "পুঁজি" র প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে গিয়ে মার্কস পড়লেন কৃষিতত্ত্ব ও শারীরবৃত্তের অধ্যয়নে রসায়নের প্রয়োগ সম্পর্কে লিবিগের পূর্বে পঠিত বইটির (৫৩) ১৮৬২ সালের নতুন সংস্করণ। তারপর পড়লেন লিবিগেরই লেখা কৃষি রসায়ন সংক্রান্ত অন্য একটি বই (৫৪)। এই দশকে পঠিত অন্য বইগুলির বিষয় : ইংলণ্ডের কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ (৩৬), উত্তর আমেরিকার কৃষি (৪৫), জমির খাজনা (৬৮), ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের গ্রামীণ অর্থনীতি (৫০), কৃষি ও গ্রামীণ জনসংখ্যার আন্তঃসম্পর্ক (৫১), জমির উর্বরতা (৬৬, ৬৭), কৃষির ইতিহাস (৬৭) এবং নিবিড় চাষের জাপানী পদ্ধতি (৫৮)।

১৮৭০-এর দশকে কৃষি-রসায়নের অধ্যয়ন অব্যাহত থাকে (১, ৪৪), তার সাথে যোগ হয় রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থার সমস্যা (২)। এইবার পাশাপাশি একটা বড়ো জায়গা দখল করে নেয় ভূতত্ত্ব (৪৪)। কৃষির সাথে ভূতত্ত্বের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কার্ল ক্রামের জলবায়ুর ও উদ্ভিদ জগতের বিবর্তন সংক্রান্ত (৩০), এবং কৃষির প্রকৃতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত (৩১, ৩২) বইগুলির উচ্চ মূল্যায়ন করেন মার্কস (৮, নথি নং ২২১১)। ক্রামের উদার দৃষ্টিকোণ, গভীর পাণ্ডিত্য এবং "অদচেতন সমাজতন্ত্রী প্রবণতাসমূহ" মার্কসকে আকৃষ্ট করে। কৃষির ও জলবায়ুর পর্যালোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ ক্রামের রচনার এক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

১৮৭৬ সালে মার্কস প্রাণিবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বই

পড়েন। এই পর্যায়ের নোটের উৎস : প্রাণিদেহের ও উদ্ভিদের কোষের গঠন ও বৃদ্ধি সম্পর্কে শোয়ানের (৮৭) (৮, নথি নং ৬২৯২), উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে স্লাইডেনের (৮৪), এবং মানুষের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে রাঙ্কের (৭৭) গ্রন্থ।

১৮৭৮ সালে মার্কস পড়েন মানুষের প্রাগ ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁরই বন্ধু ডফিন্সের লেখা একটি বই (১১)। ডফিন্সের লেখা অন্য একটি বই— "বৃটেনের প্রাচীন মানুষ" (২০), এবং গেইকির "প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপ" (৩৪) মার্কস পড়েন ১৮৮০-৮১ সালে, মরগানের "প্রাচীন সমাজ" (৬৫) পড়ার সময়ে।

১৮৭৮ সালেই মার্কস পড়লেন জুক্স্ রচিত ভূতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক (৪৬) (৮, নথি নং ৩৮১৪)। পূর্বে উল্লিখিত ফ্রাসের এবং জুক্সের বইগুলি থেকে নেওয়া মার্কসের নোটের বিষয়বস্তু : পৃথিবীর উদ্ভবের ইতিহাস, পর্বতের স্তরসমষ্টি, পৃথিবীর উপরিভাগের/ত্বকের রূপান্তরে বায়ুমণ্ডলের, তাপের, যান্ত্রিকগতির এবং রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহের প্রভাব, জীবাশ্ম-বিজ্ঞান ও খনিকবিদ্যা (মিনেরলজি)। এখানে মার্কসের ঔৎসুক্যের বিষয় : খনিকীভবনের, কেলাসনের (ক্রিস্টালাইজেশনের) এবং প্রসঙ্গিক রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহের নিয়মাবলী; পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের ভূতত্ত্বীয় ও প্রাণিবিদ্যাগত পর্যালোচনা; এবং শেষত – পৃথিবীর ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তরে মানুষের ভূমিকা। এই একই সময়ে তিনি পড়েন : প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে প্রেষারের রচনা (৭৪), এবং ভূতত্ত্ব ও ইতিহাসের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে আলেন গ্রান্টের গ্রন্থ (৩৫)।

খনিবিদ্যায় ভূতত্ত্ব হতে লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়টিও মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত খাতাগুলির মধ্যে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বই উল্লিখিতও হয়েছে (৩৩, ৫০, ৭৬, ৯০)। ১৮৭০-এর দশকেরই শেষদিকে মার্কস আরও পড়লেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের তত্ত্বগত সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিষয় রচিত একটি দুই খণ্ডের বিশ্বকোষ (৮৫) (৮, নথি নং ৬৪৬৬ এবং ৬৪৬৭)।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষে বা আশির দশকের গোড়ায় মার্কস পড়েন মানুষের শ্রম ও শক্তি সংরক্ষণ সম্বন্ধে পোপিলস্কি রচিত একটি গ্রন্থ (৬৯)। ১৮৮২ সালের শেষের দিকে তিনি পড়লেন বিদ্যুতের ব্যবহার

সংক্রান্ত একটি বই (৩৯)। মার্কসের মৃত্যুকালে অসমাপিত থেকে যায় গণিতের এলাকায় তার শেষ রচনা—"টাইলরের উপপাদ্য" (৯. পৃ. ৪১৮-৫৬২) (৮, নথি নং ৪৫০২)।

মার্কসের ১৮৪৮-১৮৮৩ কালপর্বের প্রকৃতি-বিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশল সংক্রান্ত খাতাগুলিতে দেখা যায় যে, তাঁর প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা প্রাথমিকভাবে সমাজের অর্থনীতিতেও ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারটি বোঝার তাগিদ থেকে উৎসারিত হলেও, সর্বদাই তাঁর উৎসুক্যের পরিধি বিজ্ঞানসমূহের ও প্রকৌশলের ইতিহাস হতে মূর্ত বিজ্ঞানসমূহের বিভিন্ন ধারণার ও প্রশ্নের তত্ত্বগত দার্শনিক পর্যালোচনা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল (১৩, ১৬, ২৯, ৮১, ৮২, ৯২)। তিনি পড়েন পদার্থবিদ্যা ও গণিত সম্বন্ধে দেকার্তের একটি মূল রচনা (২১), নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার দার্শনিক তাৎপর্য সংক্রান্ত বিতর্কের সাথে জড়িত বিখ্যাত লাইবনিৎস-ক্লার্ক পত্রাবলী (৫২), এবং লাইবনিৎসের বিজ্ঞান-ভাবনা সম্পর্কে দুহোহারেমতের একটি রচনা (২৪)।

"নাগরিক সমাজে" উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভূমিকার পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ও প্রকৃতিতে বিশিষ্টতা অর্জন করার (স্পেশালাইজেশনের) মধ্যে তুলনা করেন ডারউইনের রচনার (১৮) আলোকে। কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ সম্বন্ধে লিবিগের (৫৩) ও হুজ্‌সের (৩৮) রচনা পড়তে পড়তে চলে যান জৈব রসায়নের ইতিহাসের পর্যালোচনায়—পড়েন শর্লেম্মেরের প্রাসঙ্গিক রচনা (৮৬)। প্রকৌশলের সাথে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সম্বন্ধের পর্যালোচনা হতে তিনি উপনীত হন "নাগরিক সমাজে" শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্যের উপর আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান-নির্ভর প্রকৌশলের প্রভাবের পর্যালোচনায়—পড়েন "নাগরিক সমাজের ইতিহাস" সম্বন্ধে ফার্গুসনের গ্রন্থ (২৭)। তারপর প্রবেশ করেন সামাজিক নৃতত্ত্বের জগতে—পড়েন মাউরার (৬২), রামাৎসিনি (৭৫) ও হেইখের (৭৮) গ্রন্থ।

আদিম জনগোষ্ঠী হতে "নাগরিক সমাজে" উত্তরণের প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে। প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজগুলির সেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠন সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্যসমূহের ভিত্তি [illegible] করেছে মার্কসের নৃতত্ত্ববিষয়ক খাতাগুলি। মার্কসের এই নোটগুলি পৃথক-

ভাবে প্রকাশিত ও পর্যালোচিত হয়েছে (৩৭, ৪৮, ৪৯)। মার্কসের শেষ জীবনের এই নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন তাঁর রাজনৈতিক সংক্রান্ত গবেষণাকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। "১৮৪৪ সালের অর্থনীতি ও দর্শনবিষয়ক পাণ্ডুলিপিগুলি"-তে মানবসমাজ, ব্যক্তিমানুষ ও বাকী প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কের যে বিমূর্ত পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল এক ধরণের দার্শনিক-নৃতত্ত্বের চৌহদ্দির মধ্যে, মার্কসের জীবনের শেষ বছরগুলিতে তা পূর্ণতা পেল, বিভিন্ন দেশের (যথা—আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াও, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া, ভারত—বিশেষত বঙ্গদেশ সিংহল ও অস্ট্রেলিয়ার) মূর্ত মানবসমাজগুলির—তাদের অর্থনীতি, আইনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির—অধ্যয়নে। সেখানে তিনি রেখে গেলেন আগামী-দিনের প্রাসঙ্গিক গবেষণার সম্ভাব্য পথের ইঙ্গিত।

উপরোক্ত বিবরণ হতে দেখা যাচ্ছে যে এঙ্গেলসের মতো মার্কসও প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চায় প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন। তাঁরা একত্রে প্রায় সকল তৎকালীন বিজ্ঞান চর্চা করেন—একযোগে, এবং প্রায় একই সময়ে (তাঁদের চিঠিপত্র এর সাক্ষ্য বহন করে)। এঙ্গেলসকে গণিত ও ভূতত্ত্ব চর্চা করতে উৎসাহিত করেন মার্কস (৮, নথি নং ১৯২২)। তাঁরা কোষতত্ত্ব, বিবর্তনবাদ ও জৈবরসায়ন চর্চা করেন একযোগে (দ্রষ্টব্য : ৮০)। মার্কসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশল তত্ত্ব চর্চার সবকটি খাতা প্রকাশিত হলে, এঙ্গেলসের প্রাসঙ্গিক রচনাসমূহের সাথে যুক্ত হয়ে, সেই প্রকাশনা মার্কস-এঙ্গেলসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার চিত্রটিকে পূর্ণতা প্রদান করবে। প্রশ্ন ওঠে : বর্তমান পর্যায়ে কি মার্কসের বিজ্ঞান-চিন্তা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায়? মার্কসের বিজ্ঞান চর্চার সামাজিক ও ভাবাদর্শগত পটভূমির পরিবর্তনের রূপরেখাটি, তার ক্রমবিকশিত বিজ্ঞান ভাবনার মর্মবস্তু অনুধাবনে আমাদের সাহায্য করে। তাঁর প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসটিও বিচ্ছিন্নতা এবং ধারাবাহিকতার এক ঐক্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মার্কসের বাল্যকালে ত্রিয়েরে যাঁরা প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা করতেন তাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের উপর প্রগতিশীল ফরাসী ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল খুবই শক্তিশালী। তাঁদের প্রভাবে জার্মানীর ঐ অংশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিস্তারে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটে। গির্জা এই পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল বুর্জোয়া দর্শনের বিরুদ্ধে বিতর্কের পথে যেতে বাধ্য হয়

(৪৭, পৃ. ১৪২)। এই বিতর্কের বিষয়বস্তু : ধর্ম শিক্ষাব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্ক। অপেক্ষাকৃতভাবে উদারনৈতিক পারিবারিক আবহাওয়ায় এবং জিমনাসিয়ামের প্রগতিপন্থী শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে লালিত মার্কসের পক্ষে উপরোক্ত বিতর্কে বিজ্ঞানের পক্ষ অবলম্বন করাটা সহজ ছিল। তিনি তাই করেন।

মার্কস যখন বালক তখন ত্রিয়েরের কৃষি ও কুটিরশিল্প ধ্বংসোন্মুখ। স্থানীয় উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের বিকাশে সাহায্য করে সেই অর্থনৈতিক অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছিল (৭৯, পৃ. ২৫ এবং ৩০ ৩৮)। ত্রিয়েরের বা সাধারণভাবে "রাইনিশে ৎসাইটুঙ" পত্রিকার সম্পাদক মার্কসের নিবন্ধসমূহে আলোচিত হয়। সামাজিক ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির এই পরিবেশ তরুণ মার্কসকে করে তোলে বস্তুনিষ্ঠ, সমাজ সচেতন এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। তিনি একজন সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী হিসাবে গড়ে ওঠার পথে অগ্রসর হন।

সমাজ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অনুভূতি হতে অগ্রসর হয়ে সমাজের বিকাশের নিয়মসমূহের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন মার্কস। তাঁর এই গবেষণা যতই বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠল ততই মানুষের সাথে বাকী প্রকৃতির সম্পর্কের পর্যালোচনায় প্রবেশ করাটা তাঁর পক্ষে জরুরী হয়ে পড়ল।

এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রেরণা তিনি পেলেন হেগেলের ও ফয়ারবাখের দর্শন অধ্যয়ন করে। হেগেলের প্রভাবে মার্কসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল মানুষ ও বাকী প্রকৃতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বমূলক বিরোধ ও ঐক্যের ব্যাপারটি। আর ফয়ারবাখের দার্শনিক কর্মসূচী হতে তিনি আহরণ করলেন অন্য এক প্রত্যয় : "দর্শনকে অবশ্যই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে—দর্শনের সাথে" (২৮, পৃ. ৮৮)।

প্রশ্ন উঠতে পারে : প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে এই উৎসাহ মার্কসকে হেগেলপন্থী বা ফয়ারবাখপন্থী প্রকৃতি-দর্শনের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখতে পারল না কেন? তার কারণ : "রাইনিশে ৎসাইটুঙ" পত্রিকার কার্যভার গ্রহণ করা মাত্র মার্কস সমকালীন সামাজিক শ্রেণী সমূহের বাস্তব সংঘর্ষের মুখোমুখি হলেন, এবং সাম্যবাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হল। সাম্যবাদের

সাথে মার্কসের এই সম্পর্ক প্রথম থেকেই ছিল সমালোচনা মূলক। ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসে এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন : "রাইনিশে জেইটুঙ পত্রিকা একথা মনে করে না যে, সাম্যবাদী ধারণসমূহ, তাদের বর্তমান রূপে, এমনকি তত্ত্বগতভাবেও বাস্তব, আর তাই তাদের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন কামনা করা, বা সম্ভব বলে বিবেচনা করা, তার পক্ষে আরই সম্ভব নয়। আমাদের পত্রিকা উক্ত ধারণাসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করবে" (৬১, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০)।

সাম্যবাদী কর্মসূচীর সমালোচনার পূর্বশর্ত হল তার বস্তুগত ও ভাবাদর্শগত ভিত্তির বিশ্লেষণ। ক্রমশ মার্কস বুঝলেন : সেই বস্তুগত ভিত্তিটি খুঁজতে হবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের মধ্যে, আর ভাবাদর্শগত ভিত্তিটি—প্রলেতারিয়েতের দর্শনের বিকাশের ধারায়। এই বোধ হতে উচ্চারিত হল হেগেলের আইনের দর্শনের সমালোচনার ভূমিকায় স্বাক্ষ প্রতায় : "প্রলেতারিয়েতের বিলুপ্তি ব্যতিরেকে দর্শনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, আবার দর্শনকে বাস্তবায়িত না করে প্রলেতারিয়েতকে বিলুপ্ত করাও যাবেনা" (৬১, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭)। অর্থাৎ, প্রলেতারীয় বিপ্লবের পথে মানুষের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আত্ম-বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা দূর করতে হবে, এবং বিপরীতক্রমে মানুষ যখন বিজ্ঞান-চর্চা করে তখন তা ঘটে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যে। তাই মানুষের বিজ্ঞানের অধীতব্য প্রকৃতি কোনো স্বতঃবিদ্যমান প্রকৃতি নয়—তা হল মানুষের সমাজে সাঙ্গীকৃত, এবং সেই অর্থে "রূপান্তরিত" প্রকৃতি শুধু তাই নয়, গতির যে দ্বন্দ্ব-মূলক নিয়মাবলী সমাজের ইতিহাসের আপাত আকস্মিক ঘটনাসমূহকে পরিচালিত করে, মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমকালের বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও দর্শনের অগ্রগতির আলোকে দেখলেন যে, প্রকৃতির অগণিত পরিবর্তনসমূহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে ও বিকাশের সেই সাধারণ নিয়মগুলিই নিজেদের পথ করে নেয় (২৬, পৃ. ১৬)। অন্যদিকে "নাগরিক সমাজের" সকল বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে মানবসমাজের পথে যাত্রা হল মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক করে তোলার এক প্রক্রিয়া। বাকী প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ককে সুসমঞ্জস করে তোলার এই প্রয়াসটি মার্কসের জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বিদ্যমান বিজ্ঞান হতে মার্কস আহরণ করেন বস্তুনিষ্ঠ যথাযথতার

পাঠ। একটি বিশেষ বিজ্ঞান-হিসাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রথমরূপটির রূপকার উইলিয়াম পেটির কৃতিত্বের মার্কসপ্রদত্ত স্বীকৃতির মধ্যে (৬০, পৃ. ৫২-৫৩, পাদটীকা), এবং ডারউইনের কৃতির সাথে মার্কসের অবদানের এঙ্গেলসকৃত তুলনার মধ্যে (৭, পৃ. ৫) আমরা প্রত্যক্ষ করি বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মার্কসের স্থান। অনুরূপভাবে গণিতের ক্ষেত্রে দা'লঁবের ও লাগ্রাঞ্জের প্রতি, রসায়নে—লিবিখের ও শরলেম্মেরের প্রতি, ভূতত্ত্বে লায়েলের প্রতি এবং শারীরবৃত্তে ড্যানিয়েলসনের প্রতি তাঁর অনুরাগ, পাণ্ডুলিপি-সমূহে ও চিঠিপত্রে ব্যক্ত হয়েছে একাধিকবার। বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে তিনি দেকার্তের উত্তরসূরী। তাঁর প্রিয় আপ্তবাক্য : "সবকিছু সম্পর্কে সংশয়ী হও" (৭, পৃ. ২৫৭)। কিন্তু কার্তেসীয় বুদ্ধিবাদের সীমাবদ্ধ তিনি অতিক্রম করেছেন "স্বতোবিদ্যমান" কোনো পরমা প্রকৃতির অস্তিত্বে কার্তেসীয়, নিউটনীয় বা লাইবনিৎসীয় বিশ্বাস। বিজ্ঞানসমূহের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা আপন প্রয়াসে দূর করতে সচেষ্ট মার্কস, প্রকৃতির সাথে ঐক্যবদ্ধ বিজ্ঞান-সমূহের স্বপ্ন চোখে নিয়ে, আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখে, বিদায় নিয়েছেন। মানবীয় সবকিছুই সেই বিজ্ঞানসমূহের প্রণালীর বিষয়বস্তু হতে পারে। তাঁর প্রিয় সূক্ত : "মানবিক কোনো কিছুই আমার পর নয়" (তদেব)। অন্য ভাষায় বলা যায় : মানুষ এবং বাকী প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক-সমূহের মূর্ত ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনাই মার্কসের বিজ্ঞান-চর্চা হতে উৎসারিত কর্মসূচীর মূলকথা (১৭)।

স্থানাভাবে টীকা ও সূত্র-নির্দেশ এই সংখ্যায় ছাপা সম্ভব হল না। পরবর্তী সংখ্যায় তা ছাপা হবে। সম্পাদক

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্যাসিবাদ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সাময়িক মতাদর্শের কিছু ভ্রান্ত আরোপ এবং অপরিণত প্রয়োগের বিচ্ছিন্ন কালপর্ব বাদ দিলে 'রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা'—শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের জগতে কথাটি বহু ব্যবহারে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ এবং খানিকটা যেন জীর্ণও বটে। আধুনিক ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্বাভাবিক। যে মানুষটি তাঁর কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক নানা বিষয়মুখী প্রবন্ধ ও ছবির বিচিত্র সম্ভারে অর্ধ-শতাব্দীরও বেশী সময় আমাদের চিন্তাভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন, নিত্যনতুন সৃষ্টির আলোয় নিয়ত চক্ষুষ্মান করেছেন আমাদের, শিল্প-কর্ম এবং মানব-সভ্যতার প্রতি দায়বদ্ধ সকলকেই এখন ফিরে ফিরে স্মরণ করতে হবে তাঁকে—চলমান জীবন ঐতিহ্য সেই মানুষকে—যাঁকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ নিজেদেরই পাথেয় সংগ্রহ করা। ২৫শে বৈশাখ, প্রতি বছরেই ফিরে ফিরে আসে আর পরিবর্তমান সমাজ ও জীবনের অভিজ্ঞতার পটে বারবার যাচাই হন তিনি, প্রমাণিত হয় তাঁর জীবন-যাপন আর রচনাবলীর প্রাসঙ্গিকতা।

এই প্রবন্ধের বিষয় ও বিস্তার অবশ্য তত ব্যাপক নয়, ১৯৩০-এ তাঁর মস্কো যাত্রা থেকে ১৯৪১-এ তাঁর দেহান্ত পর্যন্ত। দশ-এগার বছরের সময় সীমায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত কিছু রচনা, চিঠিপত্র ও মন্তব্যের ভিতর থেকে এই শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী কবি মণীষীর ভাবনাসূত্র অনুধাবনের চেষ্টা।

১৯২৬-এ, কবি ইতালি গিয়েছিলেন মুসোলিনীর আমন্ত্রণে। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রনায়কের নগ্ন, বিকৃত-বর্বর মুখের উপর প্রাচ্যের সৌন্দর্যসাধক কবির আড়াল বড় বেশি দরকার ছিল তখন।। সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী, ঐ যাত্রা বর্জনে কবিকে অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ব পরিক্রমায় সদা উদ্‌গ্রীব ও কৌতূহলী কবি ইতালি

যাত্রা স্থগিত রাখলেন না। সেখানকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'রাজোচিত সম্বর্ধনা' এবং অধ্যাপক ফামিকীর বোতো মুগ্ধ কবি এমন কথাও বললেন "মুসোলিনী এ্যাঞ্জেলোর সৃষ্টিকুশলতায় গঠিত শরীর ও মনের অধীশ্বর। ইতালির অতীত যত উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ তত ভাস্বর দেখছি আমি"। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই দেখা সম্পূর্ণভাবেই ইতিহাসের বাস্তব-বিরোধী, অনচ্ছ এবং একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক।

অবশ্য, ভুল স্বর্গ থেকে কবির পতন-ঘটেছে অচিরেই। সুইজারল্যাণ্ড পৌঁছে সমকালীন ইউরোপীয় রাজনীতির ধূলিঝড়ের আঁধির মধ্যে দেখা পেলেন ভাগ্রতবিবেক রঁলার। অধ্যাপক বোভের, অধ্যাপক ফোরেল, নৃতত্ত্ববিৎ ফ্রেজার প্রমুখ মুক্তবুদ্ধি ও বিবেক-ধরুক দানে অনিচ্ছুক বিতাড়িত ইতালীয় বুদ্ধিজীবীরা কবিকে মুসোলিনী সম্বন্ধে নতুন করে ভাবালেন। রঁলা বললেন —আপনার পবিত্র নাম নিয়ে শয়তানরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত ক'রে তুলবে, এ আমি চাই নি।" তখন ছিন্ন-মোহ কবি তীব্র ও কঠিন আত্মসমালোচনায় অগ্নিশুদ্ধ সত্যে পৌঁছে মুসোলিনীর কার্যকলাপের প্রতিবাদে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন "যে মুহূর্তে আমি জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্ধ আসক্তিই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্যস্থল সেই মুহূর্তেই তার প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।" ফ্যাসিস্ট সমর-নায়কের সভ্যতার মুখোশও খসে পড়েছে তখন। ব্যাদিত মুখের 'নস্তরুচি কৌমুদী' (!) আর 'চোখের জলের' ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নরখাদকের আসল চেহারা— "ফুল নক্ষত্র এবং পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর কবি টেগোর, টিউনিকের বোতাম খুলে ভাঙা ইংরেজীতে অনেকগুলি পল্লীসভায় বক্তৃতা করেছেন।...ইতালি টেগোরকে দেখে হাসে...।" গোটা ইতালি সেদিন নিশ্চয়ই হাসেনি, বরং আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া কিছু সং মানুষের মুখের হাসি একেবারেই মুছে দিয়েছিল। তবে মুসোলিনীর মতো ভ'াড়ের হাসি ঘরে-বাইরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের হৃত-মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বরং সাহায্যই করেছিল।

কবির মস্কো যাত্রার সময় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ইতিহাসের বিচারে জটিল, দ্রুত পরিবর্তমান এবং কিছুটা পরস্পর-বিরোধীও বটে। একদিকে স্বৈরতন্ত্রী মুসোলিনী গোটা ইতালিকে তা দিয়ে চলেছেন কোন্ কৌশলে গোটা ইউরোপের প্রভু হয়ে বসবেন সেই মতলবে, ক্রুর ক্রান্তোর থাবার নীচে ছটফট করছে

স্পেনের গণতন্ত্র আর ভার্সাই সন্ধি চুক্তির ভস্ম অপমান শয্যা ছেড়ে বিশুদ্ধ আর্যরক্তের জাতিদম্ভ ও মদগর্বী হিংস্রতা মূর্তিমান মৃত্যুর মতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে জার্মানির হিটলার। অন্যদিকে সাম্রাজ্যশক্তির ঝাঁপা আস্ফালনে চেম্বারলেন, দালাদিয়েরদের বাজারদর তখন যাত্রাদলের দুর্যোধন-দুঃশাসনদের চেয়ে বেশি নয়।

আবার ভারতবর্ষ তখন ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে। '২৮-এ কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সামনে হাজির হয়ে কয়েক সহস্র শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত দাবীপত্র পেশ করলেন পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব গ্রহণের দাবী নিয়ে। পরের বছর লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত হল সে প্রস্তাব। আইন অমান্য আন্দোলন, লবন সত্যাগ্রহ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, প্রজাতন্ত্র দিবস তথা স্বাধীন ভারতের ঘোষণা, স্যাণ্ডার্স হত্যা, বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসি, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্টদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা—সব মিলিয়ে সশস্ত্র ও অহিংস গণ-আন্দোলনের তরঙ্গ-শীর্ষে তখন দেশের জনসাধারণ।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মতো স্পর্শকাতর জীবনমুখী কবি ঐ সমস্ত ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের বাস্তবকে অঙ্গীকার করে নিতে চেয়েছেন নিজের বুকে। অতএব, সঙ্গত কারণেই আশা করা যায় যে প্যারিস, লণ্ডন, ভিয়েনা, জিনেভা পরিক্রমার পরে কবি যখন ১৯৩০-এর ১১ই সেপ্টেম্বর মস্কোয় পৌঁছেছেন, তখন দেশে-বিদেশে প্রবলভাবে বহমান জীবনস্রোতের টান তাঁর সারা অঙ্গে। ১০ই সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ থেকে লেখা একটি চিঠিতে তারই রোমাঞ্চকর পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে—"মস্কৌয়ের পথে চলেছি। আমার মনে হয় মানুষের ভাবী ইতিহাসেরও রথ চলেছে ঐ পথে।··· অথচ ১১ই থেকে ২৫শে মাত্র পনের দিনের এই সফর। কতটা দেখতে পারলেন তিনি পনের দিনে ঐ বিশাল দেশের? নভেম্বর-বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তখন সবেমাত্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবরোধের চ্যালেঞ্জের বোঝাপড়া করে নবোদ্যমে নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ কর্মযজ্ঞ মেতেছে। প্যারিস-লণ্ডন-ভেনিসের ঐশ্বর্যবিলাস ও ভোগসুখ সেখানে একেবারেই দুর্লভ। ইতিপূর্বে '২৬-এ এবং '২৮-এ, যে-সব অজুহাতে ইংরেজ ও জাপানি ডাক্তারেরা, কবিকে মস্কো যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন সে-সব

'অসুবিধা' দূর হয়ে না গেলেও একটা টান টান ঔৎসুক্য এবং নির্দ্বিধ জ্ঞানস্পৃহা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ মস্কো পৌঁছোলেন। এমনকি, মাত্র কিছুদিন আগে 'সম্রাটের মতো' জার্মানি ভ্রমণ ক'রেও তেমন যেন তৃপ্ত নন তিনি। জার্মানির যে 'অন্তঃ-প্রকৃতির সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাতে দেখেছেন "এদের মধ্যে যে যথেষ্ট বিশ্ব জাতীয়তা আছে তা নয়। য়ুরোপের অন্যসব জাতের হাতে ঠেলা খেয়ে এরা ভেতরে ভেতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশানালিস্ট হ'য়ে উঠেছে···।" (পথে ও পথের প্রান্তে—১০ই আগস্টের ৪১ নং পত্র)। অবশ্য তে-রাত্তির না পোহাতেই 'কঠোর ন্যাশানালিজম্' যে বিশ্বত্রাস ফ্যাসিজমে পরিণত হবে কবি হয়তো অতটাই আশঙ্কা করেন নি তবে গোড়ায় গলদটা তাঁর ঠিকই চোখে পড়েছিল। তাই সময় সীমার হিসাবে নয়, সৃজ্যমান নব-ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের কঠিন ও অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মেলনের পাদপীঠ হিসাবেই মস্কো সফরকে বিচার করতে হবে। কবির যাত্রা শুরু বস্তুমুখী দৃষ্টিপাতে—"মনে রেখো এখানে যে-বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তের বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে-বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম।"—রাশিয়ার চিঠি—৪। বলাবাহুল্য, উদারতন্ত্রী মানববাদী কবি নির্মোহ ইতিহাসের পটে তখনো পর্যন্ত কিছুটা এলোমেলো, উৎসাহী কিশোর, ভবিষ্যতের দৃঢ়মূল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বলিষ্ঠ সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখতে পেরেছিলেন বলেই তার 'একাকী মহৎ সংগ্রামের' সত্য ছবি তাঁর চোখে পড়েছিল। অথচ, আরো পরে ১৯৩৬-এ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী 'দায়বদ্ধ' ফরাসী ঔপন্যাসিক আঁদ্রেজিদ্ রুশ ভ্রমণের পর মোহভঙ্গে ভুগেছেন। আসলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে পুঁথিগত তাত্ত্বিক ধারণার উচ্চমীনারে আসীন জিদ, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তখনি রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের যে ছবি দেখতে চেয়েছিলেন, নানান কঠোর ও কঠিন বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সেই সমাজ তখনো তৈরী হয়েই চলেছে—তথাকথিত কল্পলোকের কবি রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন কিন্তু 'বস্তুবাদী জিদ'-এর কাছ থেকে সেই কাণ্ডজ্ঞান পাওয়া গেল না। 'রাশিয়ার চিঠি' এমনকি যথেচ্ছ উদ্ধৃতি ও দেখিয়ে দেবে যে মাঝে মাঝে সন্দেহ—দ্বিধা থা (না থাকাটাই হতো অ-বাস্তব) জীবন-যাপন ও শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষের

আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলায় অক্লান্ত-কর্মী রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে-সব প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করেছিলেন সোভিয়েত-ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবেই সেগুলির আরো ব্যাপক, সুষ্ঠু ও গভীর ব্যবহার দেখে তিনি প্রীতি এবং উৎসাহিত হয়েছেন। প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন "আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। রথীন্দ্রনাথকে জানালেন 'এটা খুব করে বুঝেছি আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ শ্রীনিকেতনে।"

তবে রাষ্ট্রচিন্তার নিরিখে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি রয়েছে বইটিতে, যেজন্য তথাবিকৃত করে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনকে হতমান করার মিথ্যা অজুহাতে 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহারের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের পরেই (৪ঠা জুন— মডার্ন রিভিউ) 'সদাশয় ব্রিটিশ সরকার' 'রাশিয়ার চিঠি'র বাকী অংশের ইংরেজী-প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। কেননা চিঠিগুলি দেখিয়ে দিয়েছে যে সাধারণ ভাল-মন্দ বিচারে কেবলই দু'চারটি কাজের প্রশংসামাত্র নয়, নতুন সমাজেরগোটা ব্যবস্থাটারই ইতিবাচক মূল্যায়ন করতে চাইছেন কবি, তাঁর চিন্তা ও চেতনায় নাড়া দিয়েছে এ তাবৎ-লালিত পুরোনো ধ্যান-ধারণার বদলে অভিনব সত্য। নিজেকে নতুন করে সৃষ্টির আনন্দে প্রবল উৎসাহে প্রায় বিনা-দ্বিধায় বরণ ক'রে নিচ্ছেন তাকে। মনে রাখতে হবে, বিষয়টা কবির বিশেষ চেনা জগতের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি নয়— রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের অভিনব বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। তিনি লিখছেন "অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধীক্কার আসে।···রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চলছে।" ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব যাঁরা ঘটিয়েছেন তাঁদের দেওয়া সম্বর্ধনার উত্তরে বলেছেন "আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্য-সভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির (ভারতবর্ষের) সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণ-মানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" সোভিয়েতে ছাঁচে ঢালা মনুষত্ব 'কলের পুতুল' বা 'সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব' না মেলার সংশয়ের বেড়া ডিঙিয়ে 'এ জন্মের তীর্থ

দর্শনের নতুন নতুন উপাদান এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকত্ব বৃদ্ধ বয়সেও কবির চিন্তাধারায় গুরুতর পরিবর্তন আনলো।' ৩৫-এ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠির আংশিক উদ্ধৃতিই সে-কথা বলে দিচ্ছে—"সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচবো নইলে চোখ রাঙানির ভান করে অথবা দয়ার দোঁহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না।...আর আজ য়ুরোপের সে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা ঐশ্বর্য-ভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জমে উঠেছে।...কিন্তু সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ-কথা মনে আপনি আসে যে নবা-রাশিয়া মানব-সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ।" অন্যত্র বলেছেন "সোভিয়েত রাশিয়া একটি অখণ্ড সজীব কলেবর। তার ভিন্ন অংশে বেদনার ও প্রয়োজনের তারতম্য নেই ...এই শান্তিময় সভ্যতা আনতে সেখানে দুই শতাব্দী লাগে নি, অল্প কয় বৎসর শাসনে এই আশ্চর্য ফল। ধনস্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থনীতিই শাশ্বত এবং শ্রেয় আর ধনসাম্যমূলক অর্থনীতি এতই অশ্রদ্ধেয় যে তার সম্বন্ধে চিন্তা, আলোচনা বা গ্রন্থপাঠের স্বাধীনতা পুলিশের দণ্ডাভিঘাতে দমনীয়, শাসনকর্তাদের এই মনোভাব ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক থাক্।"

'ধনস্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থনীতির' সঙ্গে 'ধনসাম্যমূলক অর্থনীতি'র তুলনার তর্কটা সেদিন রবীন্দ্রনাথ হয়তো মুলতুবী রাখতে চেয়েছিলেন নিতান্তই রুচিতে বেধেছিল বলে, কিংবা চরম বিরক্তিতে অথবা রীতিমতো রাজনীতি জগতের মানুষ ছিলেন না বলেও তেমন তাগিদ অনুভব করেন নি। কিন্তু তর্কটা থেকেই গেছে। আর চিঠিটির প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে কবির মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার যে যন্ত্রণা-কাতর ছবি ফুটে উঠেছে, একেবারে অধুনাতন সোভিয়েত রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনার মধ্যে সেই একই দায়বদ্ধতার উত্তরাধিকার দেখে আমরা খুশি হই, দ্বন্দ্বময় কালের রথযাত্রায় প্রাচ্যের কবির পরিণত চিন্তার সজীবতা আমাদের আশ্বস্ত করে।

রবীন্দ্র-মানসের এই বিবর্তন ও উত্তরণ লক্ষ্য করে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সঙ্গত মন্তব্যই করেছেন—"একজন শান্তিকামী ভাববাদী অধ্যাত্মবাদী মোটামুটিভাবে ঈশ্বরভক্ত মানুষের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর লিবারাল

হিউম্যানিজমে দীক্ষিত একজন বৃদ্ধের পক্ষে তাঁর অভ্যস্ত চিন্তার সীমানাকে পার হয়ে যাওয়া কত কঠিন। রবীন্দ্রনাথ নিজের দীর্ঘকাল-পোষিত বিশ্বাসকে একেবারে পার হয়ে চলে গিয়েছেন এমন বললে অতিসরলীকরণ ঘটবে। তেমন যদি করতেন তাহলে তাঁর সেই উত্তরণে আমাদের সংশয় থাকতো। তা তিনি করেন নি। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন দুই প্রান্তে দুই পা রেখে এক প্রান্তে লিবারালিজিস, শান্তিবাদ অধ্যাত্মবাদ এবং শুচিশুভ্র প্রেম আর অন্যপ্রান্তে গণমুক্তি, সাম্য, শিক্ষা, সাচ্ছল্য, স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন এবং বিপ্লব। এই যে দোটানা, এটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভয়ঙ্কর সত্য। এ-কথা বলবো না যে রাশিয়া-ভ্রমণে এই দোটানা তাঁর সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে। কিন্তু শান্তির ললিতবাণী যে অনেক সময়েই ব্যর্থ পরিহাস, দেখতে পাচ্ছি এই বোধটা তাঁর তখন থেকেই মনে পাকা হয়ে বসতে শুরু করেছে।

'রাশিয়ার চিঠি'তে দেখতে পাই ললিত এবং ব্যথিত লিবারালিজমের করুণ রঙিন পথ থেকে সরে এসে বিপরীত দিকে একটা পদক্ষেপ।" (তীর্থ দর্শনের পঞ্চাশ বছর—পৃঃ ২০)।

একেবারে শান্তিপারাবারে তরণী ভাসাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ সমাজ-রাষ্ট্র-জীবন-সমুদ্রের ঐ টান প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে।' ৩৩-'৩৪ থেকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রনায়কগণ যখন হিংস্র শ্বাপদের মতো নখদন্ত বিস্তার করে নতুন করে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে তাল ঠুকতে শুরু করেছে, বিষবাষ্পে ঘুলিয়ে তুলছে পৃথিবীর আকাশ-মাটি-বাতাস তখন নতুন দীপ্তিতে আর এক রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনে নেই—লেখনী যাঁর হাতে মৃত্যুভয়হীন তলোয়ার।

রম'া রল'ার আহ্বানে ১৯৩৬-এর ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রুসেলসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেমচাঁদ, শরৎচন্দ্র, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ। বিশিস্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর-সম্বলিত যে চিঠি পাঠানো হয় সেই ঐতিহাসিক দলিলে বলা ছিল "মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরি খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র জোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্যগঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদী রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই, যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই।"

এই সময়ে কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে যে "লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার"-এর সর্বভারতীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ হন তার সভাপতি। আর 'স্পেন' পুস্তিকায় কবি ফ্যাসিস্ট প্রতিরোধ সংগ্রামে স্পেনের রক্তাক্ত জনগণের পাশে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে লিখলেন "স্পেনের গণফ্রন্টের পাশে দাঁড়ান, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন 'প্রতিক্রিয়া দূর হও'।"

ইতিমধ্যে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে দেখলো ফ্যাসিস্ট জাপান কর্তৃক চীনকে খুবলে খুবলে খাওয়া, নির্বিকারচিত্তে সইলো আবিসিনিয়ার ইতালির হাঁ-করা মুখ-গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া আর জার্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোস্লোভাকিয়াকে। 'মানিক প্যাক্ট'-এ নতশিরে হিটলারের একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে ফাঁপা বিজয়ীর আনন্দে মেতে উঠলেন তাঁরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে প্রস্তুতিপর্বেই যখন হিটলার-দালাদিয়ের-চেম্বারলেনের ভোজসভায় চেকোস্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়েই নির্ধারিত হয়ে গেল তার বিধিলিপি—বিকিয়ে দেয়া হল তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব—'অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ তার' বিচার হইয়া গেল', তখন মানব-ধর্মের বিবেক-ঋদ্ধ কবি যুগপৎ ব্যথা ও ঘৃণায় ধিক্কার জানালেন পাশবশক্তির দুই বাহককেই। তবে তার মধ্যেও মানব-সভ্যতার চরমতম শত্রুর চেহারাটা তাঁর কাছে অপ্রকটিত থাকলো না—"আমাদের কণ্ঠস্বর সম্ভবত জার্মানির ক্ষমতাসীন চক্রের কানে পৌঁছোবে না, কেননা এই কণ্ঠস্বর উচ্চ বিস্ফোরক গোলার ডানায় বাহিত নয়।"

আর কবি যখন অশিতিপর বৃদ্ধ, অথচ দুর্মর আশাবাদে 'ঈর্ষণীয় ভারবাহী তরুণ' তখন শেষ জন্মদিনের অভিভাষণ 'সভ্যতার সংকট'-এ শোনা গেল কাপুরুষ ব্রিটিশরাজ, চরিত্রভ্রষ্ট সাম্রাজ্যশাহীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন—"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর, আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" অকপটে জানালেন আর এক দেশের সম্মান তিনি পেয়েছেন যার উপর বিশ্বাস অর্পণ করেছেন পাটে উপবিষ্ট সূর্য—"[illegible] মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের, আরোগ্য বিস্তারের কী অসামান্য, অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের

মূর্খতা, দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানব-সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করছে।" মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে (৪ঠা জুন '৪১) গুরুতর অসুস্থতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিস্ রথবোনের কারারুদ্ধ জওহরলালকে লেখা পরাধীন ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে অযাচিত উপদেশ ও বিদ্রূপাত্মক চিঠির যে ঐতিহাসিক জবাব দিয়েছিলেন তাতে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক অথচ অন্তঃসার শূন্য শিক্ষানীতির মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছেন তেমনি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন নতুন রাশিয়ার শিক্ষার রীতি-পদ্ধতিকে "…**even after a couple of centuries of British administration, only about one present of the population was found to be literate in English—whole in the U. S. S. R. in 1932 after only fifteen years of Soviet administration, 98 percent of the children were educated. (These figures are taken from the Statesman year book, an English publication, not likely to err on the Russian Side)**"

স্বভাবতঃই বিস্মিত আনন্দে এ কথা ভাবতেই হয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নিয়মিত চর্চা না করেও 'বিশুদ্ধ মানব-সম্বন্ধে'র উপর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত-সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিশেষ উৎসগুলি প্রাচ্যের কবির দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায় নি। আর এমন ঐতিহাসিক সময়ে কবির এই 'টেস্টামেন্ট' রচিত হয়েছে যখন রুশ-বিদ্বেষ ও মিথ্যা প্রচারে ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানি-ইতালি সহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শিবির তোলপাড়, ফ্রাঙ্কো-তোজো-মুসোলিনী-হিটলারদের উগ্র জাতিপ্রেমের থাবার আঘাতে কুঁকড়ে যাচ্ছে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে মানুষ আর সভ্যতা। বড় বিস্ময় লাগে ঐ নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেও বারবার বিদ্যুৎ শিখার মতো ঝলসে উঠেছেন কবি কেবল মানুষেরই জন্যে। কখনো বলেছেন "বলে যাবে দ্যুৎচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়

গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়,"

কিংবা—'ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত

পূর্ণ করিয়া শেষে

নূতন জীবন নূতন আলোকে

জাগিবে নূতন দেশে।"

তিনি শুনেছেন কালের চরণধ্বনি।—

'দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এল
ঝ'ড়ো যুগের মাঝে।"

আর তার 'সেই সৃষ্টিরআহ্বান ঘোষিছে কামান।

কমিউনিস্ট না হয়েও, ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কালান্তরের মুখে দাঁড়িয়ে তিনিই তো বলতে পেরেছেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', লৌহপিঞ্জর ভেদী 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর মতো মানবধর্ম শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই এবং ভয়ঙ্কর রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ বিশ্বে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে নির্যাতিত জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার সৌষ্ঠব।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই কমিউনিস্ট নন অথচ যে বিশ্বাসের দৃঢ়তায় এবং মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করার দায়বদ্ধ পৌরুষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মানুষ '৪১-এর ২২শে জুন থেকে '৪৫ এর ৪ঠা মে পর্যন্ত তো বটেই, এমনকি তারপরেও বহুদিন ভয়ঙ্কর রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে তিল তিল করে ফ্যাসিবাদের পরাজয় নিশ্চিত করতে পেরেছিল কবির কণ্ঠেও এসে গিয়েছিল সেই বিশ্বাসের সুর। ঐতিহ্যের নামে পালিশ করা জীর্ণকে তিনি ছুঁড়ে ফেলার সাহস দেখিয়েছিলেন। মৃত্যু যন্ত্রণাময় শেষ রোগ শয্যা থেকেও দানবের সঙ্গে সংগ্রামরত সোভিয়েত-ভূমির বিজয়বার্তার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের সাক্ষ্যে জানা যায় "যে দিন অপারেশন করা হয় সে দিন সকাল বেলা অপারেশনের আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা—রাশিয়ার খবর বলো। বললুম একটু ভাল মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে ওরাই পারবে।" কবির মুখের এই জ্যোতিষ্মান বাক্যগুলিতে শুধু সমকালের সঙ্কট মুক্তির আকূতিই ধ্বনিত হল না আজকের দুনিয়ার পীড়িত মানুষও বিশ্ব-ধ্বংসকারী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় বারবার স্মরণ করবেন কবির কথাগুলি, সাহস সঞ্চয় করবেন সেগুলির মধ্যে থেকে।

এখানে ইতিহাসের দিক থেকে দুটি ঘটনা বোধহয় এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না—যেহেতু দুটিই ঘটেছে ১৯৩০ থেকে '৪১ এর মধ্যে। মস্কো থেকে আসার কিছু পরেই (৩১-এর ৩১শে জুলাই—চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৫)

জার্মানীতে পাঠরত দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের একটি উত্তরে লিখেছেন—"য়ুরোপে দুর্ভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়ছে ততই ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এবং বলশেভিজ্‌ম্‌ জোর পেয়ে উঠছে। দুটোই অশ্রাব্যের লক্ষণ। মানুষের স্বাধীন বুদ্ধিকে জোর করে মেরে তার উপকার করা যায় এ-সব কথা সুস্থচিত্ত লোক মনে ভাবতেই পারে না।···আর যাই করিস এইসব মানুষ-খেকো দলের সঙ্গে খবরদার মিশিস নে।"

কি কারণে হঠাৎ কবির ইতিহাস-চেতনা এমনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো যে বলতে পারলেন 'ফ্যাসিজম এবং বলশেভিজম্‌' একই রকম ভয়ঙ্কর কিংবা 'মানুষ খেগোর দল' বলে তীব্র ঘৃণা বর্ষিত হল বলশেভিকদের প্রতিও? শুধুই কি দৌহিত্রের প্রতি দুর্বলতাজনিত অন্ধ সংকীর্ণতার ফলে কলম থেকে বেরিয়ে পড়লো এমন 'অ-রবীন্দ্রনাথোচিত' কথা অথবা এ-সময়ে কবির জীবনে এমন কিছু কি ঘটেছিল যার ফলে স্পর্শকাতর কবির মানসিক ভারসাম্য ও প্রসন্নতায় এত বড়ো অসঙ্গতি? নিশ্চিত কেন সিদ্ধান্তে পৌছানোর মতো প্রমাণ অন্ততঃ বর্তমান লেখকের চোখে এখনো কিছু পড়ে নি।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি অবশ্য এতটা পূর্বাপর বর্জিত নয়। বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন-ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ এবং ফিনল্যাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার ('৩৯এর নভেম্বর-ডিসেম্বর) তীব্র ক্ষোভে কবি লিখলেন 'রাশিয়ার এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্বে জিতলেও তার লজ্জা ঘুচবে না।' অমলাদেবীর গল্প গ্রন্থের সমালোচনার সূত্র ধরে প্রায় খানিকটা অযাচিতভাবেই বললেন 'ফিনল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েটের বোমা নিক্ষেপের বিবরণ হৃদয়ভেদী কিন্তু হৃদ্য নয়। প্রতিদিন তীব্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে খবরের কাগজ দেখি দানবিকতার শল্য মানব ইতিহাসের কতদূর পর্যন্ত প্রবেশ করল।' 'অপঘাত' কবিতার একদা বহুল-প্রচারিত ছত্র দুটি (অবশ্যই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে) তো মনেই করা যেতে পারে—

"টেলিগ্রাম এলো সেই ক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল, সোভিয়েট বোমার বর্ষণে"।

একথা ঠিক যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কবির এই অপ্রসন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, 'সভ্যতার সংকট'-এর মন্তব্য, মিস্‌ রথবোনকে লেখা চিঠি বা শেষবারের মতো অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে কথোপকথনই তার প্রমাণ। তবে ঐ বিদ্রূপ

মনে হয়, যুদ্ধের গোলমালে এবং যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ সংবাদ প্রচার সংস্থার

'কল্যাণে' কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্য কবির গোচরে আসে নি। প্রথমতঃ, ফিনল্যাণ্ডের 'ম্যানারহাইম লাইন' নামে দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীর সঙ্গে জার্মানির রণকৌশলগত গোপন সম্পর্ক এবং জার্মান সমর কর্তাদের তত্ত্বাবধানে ফিনিশ সৈন্যদের নিয়মিত ট্রেনিং-এর খবর কি কবির জানা ছিল? দ্বিতীয়তঃ, ফিনল্যাণ্ড ছাড়া বাকী তিনটি বাল্টিক রাজ্য এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া ও লিথুয়ানিয়া যখন অবশ্যম্ভাবী হিটলার আক্রমণের বিপদাশঙ্কায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং অনাগ্রাসী জার্মান-প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হল তখন ফিনল্যাণ্ডের ভূমিকা ছিল একেবারেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির মোসাহেবের। তৃতীয়তঃ, পশ্চিমী শক্তিবর্গ তখন যেভাবে জার্মানিকে পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে ক্রমাগত উস্কানি দিচ্ছিল তাতে ফিনল্যাণ্ড তার হুঙ্কো বন্দর জার্মানির জন্য উন্মুক্ত করে দিলে প্রথমে লেনিনগ্রাদ এবং ক্রমে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের দরজা উন্মুক্ত হয়ে থাকতো শত্রুর সামনে। চতুর্থতঃ, ইতিহাস বলে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ফিনল্যাণ্ডকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে আপাততঃ যে পরিমাণ জমি তাকে ছাড়তে হবে বিনিময়ে অনেক বেশী জমি তাকে দেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ফিনল্যাণ্ড কোন প্রস্তাবেই রাজী হল না।

অতএব, ঐ সময়ে গোটা বিষয়টা নিছক 'সরল মানবতা'র বিচারের স্তরে আর ছিল না। ফ্যাসিস্ট জার্মানির ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগ্রাসের ক্ষুধা এবং তাকে ঠেকানোর মধ্যে যে মৌলিক নীতিগত বিরোধ—বিচারের নিরিখ এসে গেল সেখানে।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সুকঠিন সংগ্রামে অসীম ধৈর্য, সংযম, আত্মত্যাগের পথ বেয়ে যে শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেঁচে থাকতে পারলো, রক্ষা করতে পারলো বিশ্বসভ্যতাকে সেটি মোটেই কোন সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সম্ভব ছিল না। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল ও ঘোলাটে পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে দিশাহারা কবির সোভিয়েতের যে ভূমিকাকে 'দানবিকতার শল্য' বলে মনে হয়েছিল সেদিন, এখন কাল উন্মোচিত করে দিয়েছে এই রূঢ় সত্য যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সেদিনের বিশ্বগ্রাসের পরিকল্পনায় ফিনল্যাণ্ড ছিল দাবার একটি বিশেষ ঘুঁটি মাত্র।

তাই সব মিলিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কবির মুক্তমনের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা পাঠক হিসাবে আমাদের চিন্তা ও চেতনায় স্থায়ী আসন পায়। আর পেত্রভ, চেলিনোভ, রোয়েরিখ্ নোভিকোভা বা ইদানিংকালের দানিয়েল চুকের মতো অধ্যাপক কোগানও একদিন যে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—"Our revolution does not reject the hope of 'golden age' of a future brotherhood of humanity, the idea which during many thousand years animated all religious and also the best representatives of humanity. The Communist revolution has traced on its banner the practical realisation of these ideals. The revolution is not a destroyer and enemy of noble thinker. On the Contrary, the proletariat looks upon itself as the lawful heir who is called to translate these ideals into life. That is why the songs of Tagore are resounding in our heart as a beautiful call for liberation". (The Golden Book of Tagore—1931). এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ কবি যখন শিল্পের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য ও আনন্দের দাবী মেটান তখনি সভ্যতা-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য গতিপ্রবাহে তাঁর অনিবার্য ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ঘটে আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেছিল বলেই একদিকে যেমন গোটা দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়নের নানামুখী অগ্রগতি ও অভিনবত্ব তাঁর দৃষ্টিপথের বাইরে যায়নি অন্যদিকে তেমনি সমাজমুখী মহৎ শিল্পীর সচেতনতা থেকেই ফ্যাসিবাদের চরম বিপজ্জনক কদর্যতা বিষয়ে মানুষকে হুঁশিয়ার করতে পেরেছেন এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাই আধুনিক কালের বিস্ময় তো বটেই।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ বিকাশমান সংহতি ও কয়েকটি প্রশ্ন

সত্যব্রত দত্ত

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৮৭ সালে বসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস। বিগত তিন বৎসরে ইটালি, ভিয়েতনাম, গ্রীস, কাম্পুচিয়া, আর্জেন্টিনা, ফিলিপাইন, স্পেন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কংগ্রেসও অনুষ্ঠিত হয়েছে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি মস্কোতে ১৭৮টি দেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ মিলিত হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক আঙ্গিকের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে চলছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে মত বিনিময় ইদানীংকালে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক বিষয়েই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কোন কোন বিষয়ে মত-বিরোধ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে এবং প্রকাশ্যে তা নিয়ে বিতর্কও চলছে। তবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংহত ও শক্তিশালী করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ইদানীংকালে আরো বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। অনেক সেকেলে ধ্যানধারণার কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদদের নতুন করে মূল্যায়ন করার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা অনবরত প্রচার করে চলছেন যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা বলে এখন আর কিছু নেই। সর্বহারার ভ্রাতৃত্ববোধ আজ নিছক এক স্লোগান মাত্র। কমিউনিস্টদের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য বিলুপ্ত-প্রায়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ বহুধা বিভক্ত। এই ধরনের প্রচারের ফলে খানিকটা বিভ্রান্তি যে এসেছে তাও অস্বীকার করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা-

বাদের তত্ত্ব এক সুদীর্ঘ ও জটিল বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন সময় সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন চিন্তাভাবনা এসেছে, মার্কসবাদের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় অনেক নতুন সংযোজনও ঘটেছে কিন্তু কোন সময়ই প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতা তত্ত্ব তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। ১৮৬৪ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক (International Working Men's Association), দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্থায়িত্ব কাল ১৮৮৯ থেকে ১৯১৪। তবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিতে ১৯১৯ সালে গঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভূমিকাই সর্বাধিক। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস (১৯৩৫) থেকে গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির মৈত্রী ও ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় মোর্চা গঠনের যে কর্মসূচী নেওয়া হয় তার তাৎপর্য ঐ সময়ে ছিল অপরিসীম। এই কংগ্রেসই ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্রের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় এবং ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমস্ত প্রয়াস ও আন্দোলন কেন্দ্রীভূত করার আহ্বান জানানো হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনে কমিনটার্নের অনবদ্য ভূমিকা আজও কমিউনিস্টদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে যথাযথ রাজনৈতিক পথনির্দেশ করতেও কমিনটার্ন সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করার ব্যাপারেও কমিনটার্নের অবদান অপরিসীম। তবে কমিনটার্নের অনেক নেতিবাচক দিক ছিল এবং আজ তারও মূল্যায়ন হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের ৭০তম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে মিখাইল গোরবাচভ যা বলেছেন তা উল্লেখ করা যায়। গোরবাচভের মতে কমিনটার্নের কাজকর্মে ভুল ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিশ্চয়ই ঘটেছিল, এর ইতিহাসের কিছু কিছু অধ্যায় স্মরণ করলে তিক্ততাও জেগে উঠতে পারে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তৃতীয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান অতীতের এক অংশ বলেই পরিগণিত। কমিনটার্ন শুধু আন্তর্জাতিকতাবাদকে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে ও বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতি সমাজপ্রগতির জন্য সংগ্রামে এক কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে বলে গোরবাচভ মন্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ল্ড

মার্কসিস্ট রিভিয়ু (WMR) পত্রিকায় দুই প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা শাস্তিয়াগো আলভারেজ (স্পেন) ও ফিউপো কামপোস (পারাগুয়ে) আন্তর্জাতিকের যে মূল্যায়ন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। (শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রিকার এপ্রিল '৮৮ সংখ্যায় এর বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়েছে)

১৯৪৩ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তি ঘটে এবং ১৯৪৭ সালে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির সম্মতি নিয়ে কমিনকর্ম নামে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কাজ সংগঠিত করা এবং প্রয়োজনানুসারে তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করাই ছিল কমিনকর্মের কাজ। স্মরণ করা যেতে পারে কমিনকর্ম কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপলস্ ডেমোক্রাসি' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ এক সময় ১৯৫০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে চরম বিচ্যুতি থেকে সরে আসার পথনির্দেশ করেছিল। এই সংস্থার কার্যকলাপও ১৯৫৬ সালে বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিনটার্ন ও কমিনকর্মের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে প্রাসঙ্গিকতা নেই বলেই এগুলির বিলুপ্তি ঘটানো হয়।

বস্তুতঃ ১৯৫৭ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের পর থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ফাটল ধরে। মননশীল অনুসন্ধান, তত্ত্বগত সংযোজন, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় থেকে বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের সরিয়ে রাখে। মতান্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করে। চীন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কমিউনিস্ট সংহতিতে এক প্রচণ্ড সঙ্কট নিয়ে আসে। অনেক পার্টিই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। ষাটের দশক থেকেই চীনের নীতি ও সত্তরের দশকে ইউরো-কমিউনিস্ট মডেল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনকে নানা দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত করে, আদর্শগত চিন্তা-ভাবনায় সঙ্কট নিয়ে আসে। এখনই দুই মডেলের কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

চীন বিপ্লবের আগে এবং বিপ্লবোত্তর চীনের আদর্শগত ও আন্তর্জাতিক অবস্থান মূলতঃ মাও-জে-দং এর চিন্তাধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই স্থির হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিশ্ব রাজনীতি যে দুই [illegible] ব্যবস্থার বিরোধ ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল মাও যথাযথভাবে

তা অনুধাবন করেন এবং ঘোষণা করেন সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে চীন পুরোপুরিভাবে সমাজতান্ত্রিক জোটের অঙ্গীভূত হয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশ নেবে। চীনের তরফ থেকেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংহতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমনকি ১৯৫৭ সালের মস্কো সম্মেলনে মাও প্রস্তাব করেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে তাত্ত্বিক পথ-নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র পুনঃস্থাপিত হউক এবং সোভিয়েত পার্টিই হউক সেই কেন্দ্র। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য চিরস্থায়ী হবে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে মাও বলেন, বিশ্বের কোন শক্তিই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। অথচ ষাটের দশকের প্রথম থেকেই শুরু হয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন ও সোভিয়েত সম্বন্ধে চীনের বিকল্প মূল্যায়ন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে চীন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সময়ই মাও কতকগুলি আজগুবি তত্ত্বের অবতারণা করেন। তার মধ্যে, (১) পুবের হাওয়ার তেজ, (২) কাগুজে বাঘ, (৩) যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা এবং পরবর্তীকালে (৪) তৃতীয় বিশ্বের তত্ত্ব প্রধান। মাও প্রচার করেন, চীন বিপ্লব ও বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের তেজ পশ্চিম দুনিয়ার মানুষকে যথেষ্ট প্রভাবিত করছে, সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। মাও বলেন, সাম্রাজ্যবাদ ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দেখে মনে হয় তারা খুব শক্তিশালী, প্রকৃত বাঘ কিন্তু আসলে তারা কাগুজে বাঘ। সমাজতান্ত্রিক শিবিরও যথেষ্ট শক্তিশালী ; সুতরাং যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া অযৌক্তিক নয়। তাছাড়া যুদ্ধ এড়ানো যাবে না, সাম্রাজ্যবাদীরাই যুদ্ধ শুরু করবে এবং যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জয় সুনিশ্চিত বলেও ঘোষণা করা হয়। মাও আরো প্রচার করেন, 'তিরিশ কোটি চীনা ও পৃথিবীর অর্ধেক লোক হয়তো এই যুদ্ধে নিশ্চিত হবে কিন্তু সাম্রাজবাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে গড়ে উঠবে এক নতুন হাজার গুণ উন্নত সভ্যতা।' ১৯৬৩ সালে চীন সমস্ত মৈত্রী চুক্তি অস্বীকার করে সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বিভেদের ইন্ধন যোগায়। প্রায় ১৩ বৎসর পর ১৯৬৯ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ই 'সর্বহারার একনায়কত্বে ক্রমাগত সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শুরু হয়। এর পর মাও অবতারণা করেন 'তিন বিশ্বের' তত্ত্ব। মাওএর মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত

ইউনিয়ন প্রথম বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। জাপান, সমগ্র ইউরোপ ও কানাডার অবস্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বে। জাপান ছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। এই তিন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মাওসোভিয়েত ইউনিয়নকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করেন এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যাঘাত করার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান।

চীনের বর্তমান নেতৃত্ব মাও-এর অনেক মূল্যায়নই সঠিক বলে মনে করেন না। দ্বাদশ কংগ্রেস (১৯৮২) ও ত্রয়োদশ কংগ্রেসে (১৯৮৭) মাও অনুসৃত অনেক নীতিরই সমালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান নেতৃত্বের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি ইত্যাদি বিষয়ে ইতিবাচক দিক তেমন স্পষ্ট না হলেও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি চীনের দায়বদ্ধতার কথা বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে শক্তিশালী করার কথাও চীনের নেতারা বলছেন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আদর্শগত পার্থক্য ক্রমশ দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংহত করার ব্যাপারে চীন যথাযোগ্য ভূমিকা নেবে—এ প্রত্যাশার যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি আছে।

ইওরো-কমিউনিজমের তত্ত্ব সত্তরের দশকের শেষ দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক বিরাট বিভ্রান্তি নিয়ে আসে। স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সান্টিয়াগো ক্যারিলোর 'ইওরো-কমিউনিজম অ্যাণ্ড দি স্টেট' গ্রন্থের প্রকাশ (১৯৭৭) এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের পর (১৯৭৯) এই তত্ত্ব নিয়ে না বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ইওরো-কমিউনিস্টদের বক্তব্যে "ন্যাটোভুক্ত, মার্কিন ইউরোপ, ঐতিহাসিক সমঝোতা" ইত্যাদি কথা প্রাধান্য পায়। সর্বহারা-আন্তর্জাতিকতাবাদের এরা বিরোধিতা করেন এবং সর্বহারার একনায়কত্বের পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর মোর্চার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তর ইত্যাদির উপর ইওরো-কমিউনিস্টরা গুরুত্ব দেন। কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ভূমিকার কথাও ক্যারিলো প্রমুখরা অস্বীকার করেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে এরা যুক্তি

প্রদর্শন করেন। ইউরো-কমিউনিজমের তত্ত্ব ও কর্মসূচীর ব্যর্থতা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। কারিলো প্রমুখ অনেকেই আজ স্পেনের পার্টি থেকে অবহিষ্কৃত, ইতালীর পার্টিরও আর এই মতের প্রতি তেমন গোঁড়া আনুগত্য নেই। সম্প্রতি (১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কংগ্রেসে বলা হয়েছে, পূর্বেকার নীতি স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভূত ক্ষতিসাধন করে (সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ৭০ হাজার নেমে যায়) এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত হয়। প্রতিবেশী পর্তুগালের পার্টির সঙ্গে পর্যন্ত স্পেনের পার্টির সম্পর্ক কার্যতঃ ছিন্ন হয়। ক্যাটালোনিয়ার পার্টি যা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী তা প্রায় ভেঙে যায়। দ্বাদশ কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্ট ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে আবার বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চেকোস্লাভ পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, চীনের পার্টির সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এ উপলব্ধি দ্বাদশ কংগ্রেস থেকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে নতুন ধরনের যোগসূত্র বা সংযুক্ত কমিটির মত কিছু থাকা উচিত বলে স্পেনের পার্টি মনে করে। ইস্রায়েলের কমিউনিস্ট পার্টিও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

কমিউনিস্ট আন্দোলন বর্তমানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাবাদর্শগত রাজনৈতিক আন্দোলন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বলিষ্ঠতম অংশ। বহু নতুন বাস্তবতা ও জটিল সমস্যা অতিক্রম করে কমিউনিস্ট আন্দোলন গুণগতভাবে এক নতুন পর্যায়ের দিকে এগিয়ে চলছে। শ্রমিকশ্রেণীর গঠন বিন্যাসে নানা পরিবর্তন এসেছে, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে কাজও চলছে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্ত বিপ্লব নানা সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, সমস্যারও সৃষ্টি করছে কমিউনিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্য ও মতানৈক্য থাকায় বর্তমান অবস্থায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় কিন্তু প্রলেতারিয়

আন্তর্জাতিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা কমিউনিস্টদের প্রাথমিক কর্তব্য। অতীতে যে বিভেদের সুর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে দেখা দিচ্ছিল। আজ তা অনেকাংশে অপসৃত হওয়ার পথে চলেছে কিন্তু বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মূল্যায়নে নানা প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে বিশ্ব ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট বিভিন্ন পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলিতে এ নিয়ে নানা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। এর মধ্যে অগ্রাধিকারের দ্বান্দ্বিক সমস্যা অর্থাৎ নিউক্লিয়র অস্ত্রমুক্ত পৃথিবীর জন্য শান্তি, গণতন্ত্র ও সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের আন্দোলন অগ্রাধিকার পাবে, না সামাজিক সমস্যা-সমাধান তথা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের আন্দোলনকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে, এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। শ্রেণীনিরপেক্ষ বিশ্ব সমস্যা সমাধান কি সম্ভব, সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতির মধ্যে কি কোন পরিবর্তন এসেছে, মার্কসবাদীরা কি কোন সর্বজনীন মতাদর্শের কথা কি বলতে পারেন এইসব প্রশ্ন উঠছে। শ্রেণী-সংগ্রাম নির্ভেজাল মানবিক স্তরে উন্নীত হয়েছে কিনা এবং শান্তির সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ, কিনা? পুঁজিবাদ কি নয়া ঔপনিবেশিকতা-বাদের বিলোপ ঘটাতে সক্ষম হবে কিনা, এই প্রশ্নগুলিতে প্রাধান্য পাবে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থা কি তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির উপর সাম্রাজ্য-বাদী শোষণের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে এই ধরনের আরো নানা প্রশ্ন আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এসেছে। কমিউনিস্টদের দায়িত্ব এই প্রশ্নগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করা।

With Best Compliments of :

M/s. Elco Enterprise

2/34 Dum Dum Road,
Calcutta-700 002

Electrical & Mechanical Engineers.

With Best Compliments of :

National Industries

Manufacturers of Electrical & Electronic Accessories,
Specialist in Sheet Metal Fabrication.
33/1H, Raja Nabakrishna Street.
Calcutta-700 005

With best compliments from :

Paul Bakery

Kankarbagh Road,
Patna-2
(Bihar)

With best compliments :

S. N. SHOME

6/1 M. M. Feeder Road
Calcutta-57

নিয়মাবলী

গ্রাহক সংক্রান্ত

নববর্ষ সংখ্যা পাঁচ টাকা

শারদীয় সংখ্যা বারো টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা

বছরের যে-কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়

ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সী সংক্রান্ত

কমপক্ষে ৫ কপি নিতে হবে।

কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।

পত্রিকা ভি পি-তে পাঠানো হয়।

ডাক খরচ আমাদের।

যোগাযোগ করুন :

কর্মাধ্যক্ষ

মূল্যায়ন কার্যালয়

১০, বঙেল রোড

কলিকাতা-১৯

House of Soviet Science & Culture

GORKY SADAN

3, GORKY TERRACE,

CALCUTTA-17

Cordially invites you

To

* **Lectures, Seminars, Discussions on various aspects of Soviet Life and Soviet-Indian affairs by eminent Soviet and Indian artists.**
* **Cultural programmes by Soviet and Indian artists.**
* **Regular Film shows**
* **Film shows for children**
* **Library and Reading Hall**

The library has books on Soviet Art & Culture, Indo-Soviet friendship, as well as Russian and Soviet Literature and popular words on Science, Agriculture and Technology in English and in various Indian languages. Library and Reading room open in all week days except Sundays.

Timing : 10 a.m.—7 P.m. (Regular); 3 p.m.—7 p.m. (Saturday) Last Friday of the month—Sanitary day.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Agarwal Hardware Works Private Ltd.

2, ISWAR CHATTERJEE ROAD.
SODEPUR.
24 PARGANAS, W. BENGAL

PHONE { 58-2919
58-2938

OCT 1988